ঢাকা পুরাণ

মীজানুর রহমান

প্রকাশক : জ্যোতিরিন্দ্রনাথ চৌধুরী
রবীন্দ্র স্মৃতি গ্রন্থাগারের পক্ষে
মানবেন্দ্র ভট্টাচার্য
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদেব পক্ষে

শিলং ১৯৯৯ ইং

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ও অলংকরণ—
আশীষ দেব
শীতল পাটির আলোকচিত্র
আসাম স্টুডিও, শিলং

মুদ্রক :

দেবব্রত চৌধুরী
জিৎরাজ অফসেট-এর পক্ষে
১০৩/১বি, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০ ০০৬।

ভূমিকা

ঢাকা পুরাণ বইটি মীজানুর রহমানের স্মৃতিচারণা। ভারত বিভাগের পরপরই কলকাতা ছেড়ে আসার পর ঢাকাকে যেভাবে দেখেছেন, ঢাকা কীভাবে আস্তে আস্তে তাঁর চোখের সামনে বদলে যাচ্ছে তার বিবরণ চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন। কলকাতায় তাঁর লেখাপড়া মিত্র ইনস্টিটিউশনে এবং সেখানে তাঁর বেড়ে ওঠার কাহিনি নিয়ে লিখেছিলেন *কলকাতা কমলালয়*। স্মৃতিকাতর মীজানুর রহমান ছেড়ে আসা কলকাতার জন্য তাঁর ভালোবাসার কথা কী গভীর মমতার সঙ্গে বর্ণনা করেছেন, তা তাঁর *কমলালয়া কলকাতা* গ্রন্থের প্রতিটি লাইনে পরিস্ফুট। তেমনি ঢাকার জন্য, বিশেষ করে পুরান ঢাকার জন্য তাঁর ভালোবাসা *ঢাকা পুরাণ*-এ সততার সঙ্গে বর্ণনা করেছেন।

মীজানুর রহমান আমার আর্ট স্কুলের সহপাঠী ছিলেন। আমাকে ভীষণভাবে আকৃষ্ট করেছিল তাঁর বইয়ের প্রতি ভালোবাসা, সিনেমার প্রতি ভালোবাসা, ছবির প্রতি ভালোবাসা। আমার ভালো লাগা, ভালোবাসা প্রায়ই তাঁর সঙ্গে মিলে যেত, যার জন্য ছাত্রজীবনে একটা বিরাট সময় তাঁর সঙ্গে কেটেছে। একসঙ্গে সিনেমা দেখা, বইয়ের আদান-প্রদান আমাদের দুজনকে ঘনিষ্ঠ করে তুলেছিল। তাঁর দেখা ঢাকার বর্ণনা প্রসঙ্গে মীজান যে অঞ্চলের কথাই বলেছেন, সেখানেই ওই অঞ্চলের ঐতিহাসিক এবং তার অতীত প্রসঙ্গ তুলে ধরেছেন। কোথা থেকে কী হয়েছে, কীভাবে অঞ্চলের নামকরণ হয়েছে, অতীতে তার কী নাম ছিল, বর্তমানে

অপভ্রংশে কী নামে পরিচিত, তাও তুলে এনেছেন। কখনো ইতিহাস, কখনো শোনা কথার ওপর ভিত্তি করে সেসবের চিত্তাকর্ষক বর্ণনা আমাদের চমৎকৃত করে। যেমন—'আমাদের বানভাসি ডেরা তখন নারিন্দা এলাকায় ১১৩ নম্বর শরৎগুপ্ত রোড, যার পুরোনো নাম ও নম্বর ১৪৫ দয়াগঞ্জ রোড। নারিন্দা শব্দটি নারায়ণ দিয়া শব্দের অপভ্রংশ। ১৯৫০ সালের কথা। তখনো ঢাকায় ঘোড়ার গাড়ি ও রিকশারই দাপট। আর লোকসংখ্যা রাজধানীর গুণে বেড়ে লাখ পাঁচ-ছয় হবে। কাজেই নারিন্দার মতো ঘিঞ্জি এলাকাতেও তেমন লোকজনের ভিড় ছিল না। সারা দিন রিকশার টুংটাং এবং মেয়েদের স্কুলের সময় ঘোড়ার গাড়ির ছড়ছড়-টগবগ শব্দ ছাড়া একরকম সুনসানই ছিল পরিবেশ।' বর্তমান ও অতীতের মধ্যে এ রকমভাবে সংযোগ স্থাপন করে ঢাকার পরিবর্তন আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন। পানি নিঃসরণ, পণ্য পরিবহন, যোগাযোগের অন্যতম জলপথ ধোলাই খালের বর্ণনা চিত্তাকর্ষক: 'আবর্জনা নিঃসরণের সেই খাল বর্ষাকালে জলটলমল তার আদল পাল্টে যেত। দূর-দূরান্ত থেকে এক মাল্লাই-দোমাল্লাই নৌকা এসে ভিড়ত নারিন্দার পুলের আশপাশে।' আমি ঢাকায় এসেছিলাম আটচল্লিশে। ধোলাইখালে নৌকার বিচরণ আমিও দেখেছি। ধোলাইখালের সুবাদে তখন ঢাকার কোনো অংশে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হতো না। ধোলাইখালবিহীন ঢাকা এখন বর্ষাকালে ডুবে যায়। অপরিকল্পিত নগরায়ণের কুফল মীজানুর রহমানও দেখে গেছেন।

ঢাকার স্মৃতি মীজানকে উসকে দিয়েছে 'মজারু' কবিতা। এই 'মজারু' কবিতার রচয়িতা ছিলেন তিনজন—অজিত দত্ত, বুদ্ধদেব বসু ও অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। ঢাকাকে ঘিরে লেখা এই কবিতার নাম দেওয়া হয়েছিল 'ঢাকা ঢিক্কি'। এই কবিতার রেশ ধরেই মীজানুর রহমানের স্মৃতি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এই কবিতার বিভিন্ন চরণ উদ্ধৃত করে ঢাকার বিখ্যাত সব এলাকার যে বিবরণ তার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটসহ মীজান তুলে ধরেছেন, তা দারুণ রসগ্রাহী হয়ে উঠেছে। সেই সঙ্গে ঢাকার বাসিন্দা চিত্রকর পরিতোষ সেন রচিত *জিন্দাবাহার* তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছে নিঃসন্দেহে। *জিন্দাবাহার*-এ আরও একজন বাসিন্দার কথা উল্লেখ করেছেন মীজান। তিনি কলকাতা মোহামেডান স্পোর্টিংয়ের ক্যাপ্টেন শাহজাহান। ব্যক্তিগতভাবে আমিও তাঁকে চিনতাম। ভিক্টোরিয়া পার্কের কোনায় তাঁর বইয়ের দোকান ছিল—প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরি। আরও একটি বইয়ের কথা মীজানুর রহমান বারবার উল্লেখ করেছেন। সেই বইটি হচ্ছে নাজির হোসেনের লেখা *কিংবদন্তির ঢাকা*। এই দুই বইয়ের সুবাদে মীজানুর রহমান রসের ভিয়েন চড়িয়েছেন তাঁর এই স্বাদু স্মৃতিকথায়।

নাজির হোসেনের দৃষ্টিতে, '...এখানে সেকালের পুরনো বাড়ি এখনো আছে। গভীর রাতে কান পাতলে এখানকার অনেক কুঠুরি থেকেই শোনা যাবে নূপুরের রিনিঝিনি ঝংকার, আনন্দ আর বিরহের গানের রেশ।...এখনো অনেক বয়স্ক ঢাকাবাসী এ গলিপথের দিকে চেয়ে তাঁদের যৌবনকালের অনেক স্মৃতি মন্থন করেন আর মুচকি

হাসেন নিজের মনেই। আরো মন্থন করেন সেই দৃশ্যটির কথা, যখন এপাড়ার বারবনিতারা প্রতিদিন সকালে বুড়িগঙ্গা থেকে স্নান করে ভেজা কাপড়ে ফিরত। ভেজা কাপড় লেপ্টে থাকার ফলে মনে হতো শরীরের প্রত্তিটি অঙ্গ যেন একটি ফুলের বিভিন্ন পাপড়ির মতো আলাদা সত্তা নিয়ে সরল বৃন্তটির ওপর দাঁড়িয়ে আছে।' নাজির হোসেনের রচনা থেকে উল্লিখিত উদ্ধৃতি দিয়ে নিজের মন্তব্য জুড়েছেন মীজান এই বলে, নাজির হোসেন যেখানে লেখার মাধ্যমে নারীর রূপ বর্ণনা করেছেন, সেখানে শিল্পী হেমেন্দ্রকুমার মজুমদার তার বর্ণনা দিয়েছেন রঙেরেখায় তাঁর সিক্তবসনা ছবিগুলোতে।

আর্ট স্কুলে আমরা ১৯৪৯ সালে দ্বিতীয় ব্যাচের ছাত্র হিসেবে ভর্তি হয়েছিলাম। আমি, রশীদ চৌধুরী, মুর্তজা বশীর, আবদুর রাজ্জাক, আলতাফ মাহমুদ, খালেদ চৌধুরী, একরাম, জুনাবুল ইসলাম এবং লেখক মীজানুর রহমান। ভুলক্রমে মীজান একজনের নাম উল্লেখ করেননি। তিনি হচ্ছেন ইমদাদ হোসেন। ভাষাসৈনিক হিসেবে পরবর্তী সময়ে যিনি অভিহিত হয়েছেন। কামরুল ভাইয়ের সুপারিশে মীজান জগন্নাথ কলেজের নাম কাটিয়ে আর্ট স্কুলে ভর্তি হলেন। মীজানের জবানিতে—'এই তালিকার আমরা তিনজন তিন কারণে আঁকাবুঁকিতে ইস্তফা দিয়ে তিনদিকে ছিটকে পড়ি। প্রথমে বোধ করি আলতাফ—"আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি"র অমর সুরকার। যত দিন স্কুলে ছিল ওর মধ্যে আমরা ভাবী সুরকারের কোনো আঁচ পাইনি। হুট করেই বিদায় নিল একদিন—হয়তো ওর সুন্দরী ভবনে খেলে যাওয়া সুরের আকর্ষণে। খালেদ, এই এখনকার ছেলেমেয়েরা যাকে 'গুরু' বলে মানে। একাধারে বাউণ্ডুলে, খ্যাপাটে আবার দর্শনের দুর্ভেদ্য জগতের অধিবাসী।' এখানে মীজান একটু তথ্য বিভ্রান্তির কবলে পড়েছেন। এখনকার ছেলেমেয়েরা তাঁকে 'গুরু' বলে সম্বোধন করে না। বহুদিন থেকেই তিনি 'প্রভু' নামে পরিচিত। অনেক সময় খালেদ মডেল হিসেবেও আমাদের সিটিং দিয়েছে। হঠাৎ একদিন খালেদ কলেজ ছেড়ে উধাও। মীজান স্কুল ছাড়লেন চোখের সমস্যা নিয়ে। ঠিকমতো রং দেখতে পেতেন না। মনে আছে কাঠের পিরামিড দিয়ে পার্সপেক্টিভের ক্লাসে কম্পোজিশন করছি জলরঙে, সিপিয়াতে। মীজান সিপিয়ার পরিবর্তে নীল রং লাগিয়েছে। সফিউদ্দিন আহমেদ ক্লাস নিচ্ছিলেন। তিনি দেখে বললেন, 'বাঃ, বেশ হয়েছে—এবার দুটো খেজুরগাছ লাগিয়ে দাও—একদম আরব দেশে চলে যাবে।' মীজান এই সমস্যাকে সমস্যা হিসেবে দেখেননি আধুনিক শিল্পীদের কাজ দেখে। মিজানের ভাষায়, 'পরে, অনেক পরে ভ্যানগঘের ছবিতে নির্বিচার হলুদ রঙের প্রাধান্য এবং রবার্ট ক্লাইনের নীল প্রাধান্য আমাকে ভাবিয়ে তুলেছিল। তবে কি এঁরা শুধু বর্ণান্ধ নন। একটি রংকেই চোখে বড় করে দেখতেন?' মীজান তাঁর পক্ষে যুক্তি দাঁড় করিয়েছেন ফরাসি কবি বোদলেয়ারের ভাষ্য দিয়ে, 'নিসর্গ জগতের নিজের কল্পনাবোধ নেই, একঘেয়ে সবুজ তার

চারণভূমি ও গাছপালা। যিনি আধুনিক তিনি চাইবেন চারণভূমির রং হোক লাল, গাছের রং হোক ঝকঝকে নীল।... নিসর্গের একমাত্র কাজ হলো প্ররোচিত করা, শিল্পী-সাহিত্যিকদের প্রচ্ছন্ন অন্তর জগৎকে উদ্দীপ্ত করা।... আমি তাহলে আকাশকে সবুজ, নদীর জলকে লাল আর গাছ নীল ভেবে অশুদ্ধ কিছু করিনি!' মীজানের আরেকটি খেদোক্তি, যে খেদোক্তি আমাদেরও ছিল, তাঁরই জবানিতে— 'কিন্তু প্রায় আড়াই বছর এই যে চারুকলায় ছিলুম, রবীন্দ্রনাথের উক্তিকে একটু ঘুরিয়ে বলতে হয়—আমরা ছিলুম স্ত্রীলোকহীন জগতে। কোনো সহপাঠিনী ছিল না, মডেল ছিল না, ছিল না কোনো শিক্ষয়িত্রী। এ কেমন স্কুল! ভাবা যায়!' আমাদের এমনি একটি দিনের কথা শুনুন, সে ছিল হেমেন মজুমদারের ছবি সিক্তবসনার বাস্তব দৃশ্য। 'সর্বজয়া অপেরা পার্টির কুশীলবদের স্নানপর্ব। বেশ কদিন হলো এই যাত্রা পার্টিটি আমাদের আর্ট স্কুলের নীচেয় এসে তাঁবু গেড়েছে। অভিনয়-নৃত্যগীতাদিতে নিশিযাপন শেষে দিবানিদ্রান্তে দ্বিপ্রাহরিক প্রলম্বিত স্নান চলে এদের। সহজেই বোধগম্য শিল্পী হেমেন্দ্রকুমার মজুমদারের প্রণয়িনীরাই আমাদের লক্ষ্য ছিলেন। আমাদের বৈপরীত্যের স্বাভাবিক এষণা এবং মডেলের তৃষ্ণা এভাবেই নিবারিত হয়েছিল সেদিন। কিন্তু কথায় বলে, চোরের সাত দিন, সাধুর এক দিন। ধরা পড়ে গেলুম সিক্তবসনাদের কাছে। অপেরার অধিকারী মশাই অধ্যক্ষ মহোদয় জয়নুল আবেদিনের কাছে নালিশ ঠুকে দিলেন। আমাদের ক্লাসসুদ্ধ সমন হলো। অধোবদনে দাঁড়ালুম বলির পাঁঠার মতো স্যারের সামনে।...'

এমনি নানা রসোত্তীর্ণ, নাটকীয় ঘটনার বিবরণে ঠাসা *ঢাকা পুরাণ*। আমারও যেহেতু সেসব অনেক ঘটনা চাক্ষুষ করার সৌভাগ্য হয়েছে, আমি উপলব্ধি করি কী নিদারুণ স্মৃতিকাতরতায় বর্ণিত *ঢাকা পুরাণ*। কিছু কিছু বর্ণনায় মীজান যদি আরও গভীরে যেতেন ঘটনাবলি আরও হৃদয়গ্রাহী হতো।

মীজান জানিয়েছেন ঢাকার সর্দারকুল শিরোমণি কাদের সর্দার—মির্জা আবদুল কাদেরের কথা। নবাববাড়ির উল্টো দিকেই ছিল ওর বাড়ি ও বিখ্যাত প্রেক্ষাগৃহ 'লায়ন সিনেমা'। দর্শকদের মনোরঞ্জনের জন্য বায়োস্কোপের সঙ্গে অতিরিক্ত বোনাস হিসেবে ছিল ক্ষীণ কটিযুক্তা বিপুলজঙ্ঘা লাস্যময়ীদের নৃত্য কৌশল। এ প্রেক্ষাগৃহের দর্শকেরা এতে এতই অভ্যস্ত ছিলেন যে তার একটা বাস্তব অভিজ্ঞতা আমারও হয়েছে। উপমহাদেশের বিখ্যাত তারকা দিলীপ কুমার অভিনীত *আজাদ* ছবিটি তখন লায়ন সিনেমায় মুক্তি পেয়েছে। ছবিতে দুটি উদ্ভিন্নযৌবনা নর্তকীর নৃত্যদৃশ্য আছে, সঙ্গে 'আপলাম চাপলাম' গান। ছবিটির ওই নৃত্য দৃশ্যের সমারোহ যখন তুঙ্গে, তখন প্রেক্ষাগৃহ থেকে পর্দার ওপর সমানে পয়সা ছুড়ে ছুড়ে সিটি বাজানো হচ্ছে। ঢাকার বিনোদনের এ পর্যায়ে মীজানের স্মৃতিচারণা আমাকেও স্মৃতিকাতর করে তোলে। তাঁর মতো আমিও ছিলাম সিনেমা-পাগল। ঢাকার একমাত্র ইংরেজি ছায়াছবির প্রেক্ষাগৃহ ছিল ব্রিটানিয়া। টিনের শেড দেওয়া গুদামের

মতো দেখতে ব্রিটানিয়া। ওই হলের সম্মুখভাগে ছিল দুটো আকর্ষণীয় বড় দেয়াল, যাতে চারশিটের পোস্টার লাগানো থাকত ছবির। একটি দেয়ালে Now showing ব্যানারে যে ছবি চলছে তার পোস্টার। অন্য দেয়ালটিতে Coming ব্যানারে আগামী ছবির বিজ্ঞাপন। চারশিটের বিরাট পোস্টার এসথার উইলিয়ামস অভিনীত *বেদিং বিউটি*-র। বিকিনি পরা এসথারকে হাঁ-করে তাকিয়ে দেখার মতো। এ ছবিতেই প্রথম বাস্তব চরিত্রের সঙ্গে অ্যানিমেশনের যোগ অবাক হয়ে দেখি।

রমনার কথা বলেছেন মীজান। সেই সূত্রে রমনার পরিকল্পনাবিদ প্রাউডলকের কথা এসেছে। এখনো ঢাকা মহানগরের সবচেয়ে সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন এলাকা এই রমনা। ঘোড়দৌড়ের মাঠ এবং ঘোড়দৌড় আর্ট স্কুলের বারান্দায় বসে দেখেছি। পুরান ঢাকার বাসিন্দাদের কাছে এটা একটা উৎসব হিসেবে পরিগণিত হতো। তেমনি ময়দানে চলত ঘুড়ি ওড়ানোর উৎসব। এটিও পুরান ঢাকার অধিবাসীদের একটি প্রিয় উৎসব। কত রঙের কত বাহারের ঘুড়ি যে ওড়ানো হতো তার ইয়ত্তা নেই। পুরান ঢাকার বাড়ির ছাদেও ঘুড়ি ওড়ানো হতো। দুর্ঘটনাও ঘটত কখনো কখনো। চকবাজারের ইফতারি, বাকরখানি, লায়ন সিনেমার গলিতে বিখ্যাত 'গেলাসি' কী যে মজাদার, জিভ এখনো রসসিক্ত হয়। আমি একটু অবাক হয়েছি মীজান কি করে ঢাকার ঘোড়াগাড়ির গাড়োয়ানদের রসিকতার কথা উল্লেখ করতে বেমালুম ভুলে গেলেন। আমরা ছাত্রজীবনে এসব রসিকতা শুনে প্রচুর হাসাহাসি করতাম। শুধু এসবই নয়, সমাজ ও রাজনীতিও উঠে এসেছে তাঁর লেখায়। ভাষা আন্দোলন এবং মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাবলি মীজান তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে লিপিবদ্ধ করেছেন।

মীজানুর রহমানের পরিবারটিতে একটি সুস্থ সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল ছিল। শৈশব, কৈশোর কেটেছে কলকাতায়। যৌবন এবং প্রৌঢ় বয়সে ঢাকায়। স্কুলজীবন থেকেই পত্রপত্রিকার নিয়মিত পাঠক। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম কিশোর মাসিক *ঝংকার*-এর সম্পাদক। পত্রিকা প্রকাশের জন্য অর্থের প্রয়োজনে যাঁদের কাছেই মীজান গেছেন, কেউই নিরাশ করেননি তাঁকে। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, সাধনা ঔষধালয়ের অধ্যক্ষ যোগেশচন্দ্র ঘোষ উৎসাহ দিয়েছেন। *ঝংকার* বন্ধ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই *রূপছায়া* নামে সিনেমা মাসিক বের করেছেন। সেই সূত্রে কলকাতার নটনটীদের সঙ্গে সখ্য। অভিনেতা ধীরাজ ভট্টাচার্যের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। কো-অপারেটিভ বিল্ডিংয়ের নিচতলায় সোবহানের বুকস্টল থেকে আমরা উভয়েই পত্রপত্রিকা কিনতাম। তেমনি খান মজলিসের নলেজহোম থেকেও। মীজানের লেখায় ফুলবাড়িয়া রেলস্টেশনের বর্ণনা আমাকে দূর অতীতে নিয়ে যায়। আমরা আর্ট স্কুলের ছুটির পর রেলস্টেশনে আসতাম সদরঘাট থেকে হেঁটে হেঁটে। প্লাটফর্মে বসে বসে স্কেচ করতাম অপেক্ষমাণ যাত্রীদের। হুইলারের বুকস্টলটি ছিল আমাদের স্বপ্নের জায়গা। ইংরেজি মাসের ১ তারিখে সারা ভারতের পত্রপত্রিকা পেতাম সেখানে—দিল্লির বাবুরাও প্যাটেল সম্পাদিত *ফিল্ম ইন্ডিয়া*, বোম্বের

ক্রসরোড, কমর সালেহ সম্পাদিত *মোশন পিকচার* ম্যাগাজিন, মাদ্রাজের *সাউন্ড*, লাহোরের *সিভিল অ্যান্ড মিলিটারি গেজেট*, কলকাতার *নতুন সাহিত্য*, কালীশ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত *রূপমঞ্চ*। এসব-কিছুই এখন স্বপ্নের মতো!

ইতোমধ্যে বাজারে ভিডিও ক্যাসেট এসে গেছে। আমি ভিডিও দোকানে নিয়মিত হানা দিতাম পুরানো ছবির খোঁজে। হঠাৎ হঠাৎ পেয়েও যেতাম। সায়গল-খুরশিদ অভিনীত *তানসেন*, অশোককুমার-মমতাজ-শান্তির *কিসমত*, বম্বে টকিজের *অচ্ছুৎ কন্যা*, যে ছবিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মীয় দেবীকা রাণী অভিনয় করেছিলেন এবং লীলাচিটনিস-অশোক কুমারের *বন্ধন* ও *ঝুলা*—এসব সংগ্রহ করে মীজানকে জানালেই কী যে আনন্দিত হতো! একসঙ্গে দু'জনে ছবি দেখতাম আর রোমন্থন করতাম পুরোনো সেইসব দিনের কথা।

পরবর্তী পর্যায়ে মীজান যখন ত্রৈমাসিক পত্রিকা বের করেন, সেই পত্রিকার লোগো তৈরি করার জন্য আমার কাছে এসেছিলেন। আমি খুবই উৎসাহ নিয়ে সে কাজটি করেছিলাম। মীজান নানা প্রসঙ্গে নানা জনের কাছে সেই গল্প করতেন। *মীজানুর রহমানের ত্রৈমাসিক পত্রিকা*র সঙ্গে এখনকার পাঠকও পরিচিত। কী সমৃদ্ধ কী অসাধারণ এক পত্রিকা! এই পত্রিকার পক্ষী সংখ্যা, যার কভার আমার করা ছিল; নদী সংখ্যা, গণিত সংখ্যা, বৃক্ষ ও পরিবেশ সংখ্যা, শামসুর রাহমান সংখ্যাসহ এরকম আরো কিছু সংখ্যার তুলনা খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। বন্ধু শিল্পী রশিদ চৌধুরী প্রয়াত হওয়ার পর তাঁর ওপরেও একটি সংখ্যা প্রকাশ করেছিলেন। একটি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানও গড়ে তুলেছিলেন মীজান। যার প্রথম বইটি ছিল অগ্রজ মঈদ-উর-রহমানের *ময়ূরের পা*। বলা বাহুল্য সে বইয়ের প্রচ্ছদও আমি অঙ্কন করেছিলাম। সৈয়দ শামসুল হকের একটি উপন্যাসও তিনি ছেপেছিলেন। বইটির নাম ছিল *এক মহিলার ছবি*। সে বইয়ের প্রচ্ছদও ছিল আমার করা। শেষ দিকে তাঁর সঙ্গে আমার যোগাযোগ অনেকটা ক্ষীণ হয়ে এসেছিল। তবুও বই হলেই আমাকে দিয়ে প্রচ্ছদ আঁকানোর জন্য আকুলতা প্রকাশ করতেন।

মীজানুর রহমান আমার অতীতকেও উসকে দিয়েছেন। স্বাদু বাংলায় তাঁর বর্ণনার জাদুকরী প্রভাব এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলতে উৎসাহ জোগাবে। *ঢাকা পুরাণ*-এর ফাঁকে ফাঁকে অনিবার্যভাবে কলকাতা উঁকি দিয়েছে প্রায়ই। মীজান দুটি শহরকেই ভালোবেসেছেন, দুটি শহরই তাঁকে একজন সৃষ্টিশীল মানুষ হয়ে ওঠার প্রেরণা জুগিয়েছে।

কাইয়ুম চৌধুরী

সূচিপত্র

আমাদের ১১৩ নম্বর শরৎগুপ্ত রোড

আমাদের বানভাসি ডেরা তখন নারিন্দা এলাকায় ১১৩ নম্বর শরৎগুপ্ত রোড, যার পুরোনো নাম ও নম্বর ১৪৫ দয়াগঞ্জ রোড। নারিন্দা শব্দটি নারায়ণদিয়া শব্দের অপভ্রংশ।

১৯৫০ সালের কথা। তখনো ঢাকায় ঘোড়ার গাড়ি ও রিকশারই দাপট। আর লোকসংখ্যা রাজধানীর গুণে বেড়ে লাখ পাঁচ-ছয় হবে। কাজেই নারিন্দার মতো ঘিঞ্জি এলাকাতেও তেমন লোকজনের ভিড় ছিল না। সারা দিন রিকশার টুং টাং এবং মেয়েদের স্কুলের সময় ঘোড়ার গাড়ির ছড়ছড়-টগবগ শব্দ ছাড়া একরকম সুনসানই ছিল পরিবেশ। সন্ধে রাত পার হতে না-হতেই গ্রামের মতোই ঝিমিয়ে পড়ত পাড়াটা। আমাদের বাড়ির পুব পাশ ঘেঁষে বয়ে যেত ধোলাই খাল। শুকনো মৌসুমে পানি নেমে যেত একেবারে নিচেয়। তখন ঢাকার যত আবর্জনা মুখ ব্যাদান করে অট্টহাসি করে উঠত আর তখন চেহারাটাও দাঁড়াত কদর্য। কিন্তু বর্ষাকালে জলটলমল ধোলাই খালের আদলই যেত পাল্টে। দূরদূরান্ত থেকে এক মাল্লাই-দোমাল্লাই নৌকো এসে ভিড়ত নারিন্দার পুলের আশপাশে। এসব নৌকোয় বেনেরা নিয়ে আসত মাটির হাঁড়ি,

কলসি ও অন্যান্য তৈজসপত্র থেকে শুরু করে ফুটি তথা বাঙ্গি। কাঁঠাল ও লাকড়িবোঝাই নৌকোও ভিড়ত। এ রকম আরও ঘাটে ঘাটে—ধোলাই খাল যত দূর বয়ে গেছে। মালবোঝাই নৌকো এসে ঢাকার দৈনন্দিন চাহিদার অনেকটাই মেটাত। পাইকারি ক্রেতাদের দরাদরি হাঁকাহাঁকি খুব চলত। এর মধ্যে কিছু খুচরো কারবারও ফাঁকফোকরে ঘটত। রাতের বেলা নৌকোর ছইয়ের ভেতর থেকে হারিকেনের আলোয় কর্মক্লান্ত মাঝি ও বেনেরা যখন খেতে বসত, তখন তাদের টুকরো কথা এবং খাওয়া শেষে অবসরের গান ভেসে আসত আমাদের বাড়িব দোলাইর পাড়ঘেঁষা কলাবাগানের ভেতর দিয়ে। আর মনে হতো খালের নিস্তরঙ্গ পানির ওপর হারিকেনের মৃদু আলোটা যেন লম্বা হয়ে ঘুমুচ্ছে।

কিন্তু গোবেচারা এই ধোলাই খাল কখনো কখনো ফুঁসে উঠত দুকূল ছাপিয়ে। একবার, ১৯৫৪ কি '৫৫ হবে, ভারী বন্যা হলো। প্রথমে তো চাঁদাড়ে পানি এল, কলাবাগান থই থই! তারপর ক্রমে বাড়ির আঙিনায়। আঙিনা ছেড়ে রাস্তায় উঠে এল পানি। মা একদিন খুব সকালে আমাদের বাংলোবাড়ির চার ফুট উঁচু বারান্দা থেকে চেঁচিয়ে ওঠেন : 'হায় আল্লাহ, অ্যাত্তো পানি! চান্দিকে পানি!'

তাইতে আমরা, বাড়ির ছোটোরা ঘুম থেকে চোখ মুছতে মুছতে উঠে বাড়িটাকে পানির ওপর ভাসতে দেখে প্রথমে তো চোখ ছানাবড়া! তারপরই নৃত্য আর কত না কলরব!

রাস্তার চেহারা রাতারাতি পাল্টে গেল—যেন এও আরেক খাল! ডিঙিতে ডিঙিতে শরৎগুপ্ত রোড, শাহ সাহেব লেন, নারিন্দা, দয়াগঞ্জ যেন বা মূর্তিময়ী ভেনিস, মায় অলিগলি। অর্থাৎ পুরো এলাকাটাই জলময়। বলা চলে, পুরান ঢাকার সব নিম্নাঞ্চলই।

আমাদের বাড়ির অদূরের বিনট বিবির মসজিদও নিস্তার পায়নি। বেশ কিছুদিন নামাজিদের যাতায়াত বন্ধ ছিল জলডোবা এই মসজিদে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, ছোটোখাটো এই মসজিদটি ঢাকার সবচেয়ে প্রাচীন মসজিদ। যখন ঢাকা শহরের পত্তনই হয়নি, তখুনি এর উদ্ভব।

গোড়ায় বলেছি, নারিন্দার প্রকৃত নাম নারায়ণদিয়া বা নারায়ণদি। দ্বীপের অপভ্রংশ হচ্ছে দিয়া বা দি। তাহলে মানে দাঁড়াচ্ছে, নারায়ণের দ্বীপ বা নারায়ণ অর্থাৎ ঈশ্বরপ্রদত্ত দ্বীপ। তাহলে কি ধরে নেব এই অঞ্চলটির চারধার তখন জলাশয়বেষ্টিত ছিল? নতুবা এ নামকরণের হেতু কী? আশা করি এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞরা আলোকপাত করবেন।

নারায়ণদিয়া নামটি মোগলদের আগমনের আগে থেকেই প্রচলিত ছিল। সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত নারিন্দা এলাকা বর্তমান বাহাদুর শাহ পার্ক তথা ভিক্টোরিয়া পার্ক পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ১৭৩৫ সালে যখন ইংরেজরা এখানে ফ্যাক্টরি বসাল, তখন বিকৃত হয়ে এর নাম গিয়ে দাঁড়ায় নারিন্দা।

শরৎগুপ্ত রোডের পুরোনো নাম যে দয়াগঞ্জ ছিল, একথা আগেই উল্লেখ করেছি। প্রায় আধমাইল দূরে অবস্থিত দয়াগঞ্জ অঞ্চল থেকে বেরিয়ে আসা এই রাস্তাটির নাম স্বাভাবিক কারণেই দয়াগঞ্জ ছিল। এই নামকরণের পেছনে যে ইতিহাস পাওয়া যায়, তা হলো এই যে সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে দেওয়ান মানিকচান্দ নামের এক ব্যক্তি এখানে বাস করতেন। তাঁর ছেলে দিয়াচান্দ বা দয়াচান্দের নামানুসারেই নাকি এই দয়াগঞ্জ নামকরণ। দয়াচান্দ নিশ্চয়ই একজন প্রভাবশালী লোক ছিলেন। নতুবা একটি এলাকা তাঁর নাম ধারণ করে কোন যুক্তিতে! স্থানীয় লোকদের সুবিধের জন্য তিনি একটি বাজার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যা আজও দয়াগঞ্জ বাজার নামে টিকে আছে। দয়াচান্দ তাঁর প্রতিষ্ঠিত বাজারটি বিখান ঠাকুর নামের এক ব্যক্তির কাছে বিক্রি করে দিলে বহুদিন এই বাজারটি বিখান বাজার নামে খ্যাত ছিল। কিন্তু তেমন জনপ্রিয় না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত দয়াগঞ্জ নামটিই সময়ের স্রোতে টিকে যায়। বাজারটি এবং এলাকাটি আজও দয়াগঞ্জ নামেই পরিচিত। দয়াগঞ্জ থেকে নারিন্দা রোডের মোড় পর্যন্ত বিস্তৃত রাস্তাটি ব্রিটিশ আমলের শেষ দিকে স্থানীয় প্রতাপশালী ব্যক্তি শরৎচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের নামেই পরিচিত হয়ে আসছে।

এই নারিন্দা-দয়াগঞ্জ এলাকাতেই রয়েছে সরু একটি গলি, কিন্তু বিখ্যাত শাহ সাহেব লেন নামে। এই শাহ সাহেবটি কে? নদীর ওপারে কেরানীগঞ্জ থানার মিসরিখোলার অধিবাসী ছিলেন তিনি। এই আধ্যাত্মিক গুরুর প্রকৃত নাম ছিল আহসান উল্লাহ। তিনি যে এলাকায় বাস করতেন, তা-ই পরবর্তীকালে শাহ সাহেব লেন নামে পরিচিত হয়ে পড়ে।

আমাদের নারিন্দার বাড়ি থেকে বন্ধুবর ঔপন্যাসিক মাহমুদুল হক, তথা বটুদের মিল ব্যারাকের বাড়ি যেতে হলে সূত্রাপুর ভেঙে লোহার পুল পেরোতেই হতো। এই পুলটা তৈরি হয়েছিল ধোলাই খালের ওপর। সেকালের ঢাকার কালেক্টর ওয়ালটার সাহেবের প্রত্যক্ষ উদ্যোগে এবং জনগণের সহযোগিতায় ১৮২৩ সালে গড়ে উঠেছিল সম্পূর্ণ পেটা লোহায় তৈরি এই পুল। এর আগে খাল পারাপারে জনগণের বড়ই অসুবিধা হতো। এই অঞ্চলে কোনো বাজার না থাকায় পুলের নিচে একটি বাজারও তৈরি করে দেন এই ওয়ালটার সাহেব। বিবি মরিয়মের কামানটি (মতান্তরে মীর জুমলার

কামান) তিনিই প্রথম চকবাজারে স্থাপন করেন, যা পরে সদরঘাট, ডিআইটি এভেন্যু হয়ে এখন জাতীয় জাদুঘরের আঙিনায় স্থান পেয়েছে। এই ওয়ালটার সাহেবকে আজ আমরা কেউ মনে করি নে, জানিই নে তাঁর সম্পর্কে কিছু। অথচ ঢাকা শহরের উন্নয়নের মূলে এই ইংরেজ ভদ্রলোকের অবদান বিশাল। ব্রিটিশ শাসনামলে তিনিই সর্বপ্রথম ঢাকা শহরের উন্নয়নের দিকে মনোনিবেশ করেন। এ জন্য তিনি ১৮২৩ সালে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ঢাকাবাসীদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করেন। পরবর্তীকালে অর্থাৎ ১৮৬৪ সালে এই কমিটিই ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটি নামে অভিহিত হয়। কিছুকাল আগেও ঢাকাবাসীরা ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটিকে শুধু কমিটি নামেই অভিহিত করত। তারা ওয়ালটার সাহেবের জনহিতকর কার্যাবল দেখে এতই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে তাঁর নামে একটি ছড়া সেকালের নগরবাসীর মুখে মুখে ফিরত :

> ওয়ালটার সাহেবনে পুল বানায়া—
> উন্‌কা নিচে গঞ্জ বসায়া—
> আওর চাক্তক ধারি কামান,
> গুড় গুড় চাল...।

...ওয়ালটার সাহেবনে পুল বানায়া...

প্রথম দুই পঙ্‌ক্তির মানে পরিষ্কার। কিন্তু পরবর্তী দুই চরণকে বরণ করতে ভারি ধন্দে পড়তে হয়। তবে কষ্টকল্পিত এই মানেটা হতে আপত্তি কোথায়—ওজনে ভারী কামানটাকে গড়িয়ে গড়িয়ে চকে নিয়ে বসিয়েছেন এই তিনিই। সে যাক, জনগণের শ্রদ্ধাই শুধু কুড়োননি, ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটি তাঁর নামানুসারে ওই অঞ্চলে ওয়ালটার রোড নামে একটি রাস্তার নামকরণও করেছেন, যা আজও বিদ্যমান।

আর ওই যে বললাম মিল ব্যারাকের কথা, তারও ইতিহাস রয়েছে বইকি। ১৭৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত ফ্লাসিস (ফ্রান্সিস?) ফ্লাওয়ার মিল নামে একটি ময়দার কল এবং ১৮৫৮ সালের দিকে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা সুগার কোম্পানির অধীনে একটি চিনির কল ছিল এখানে। বলা চলে, মিল পাড়াই হয়ে যায় পল্লিটি। ১৮৫৭ সালে সারা ভারতে যে সিপাহি বিপ্লব ঘটে, তার ঢেউ ঢাকাতেও এসে পড়ে। বিপ্লব দমনের জন্য ইংরেজ নৌসেনাদের ঘাঁটি হয়ে দাঁড়ায় এই মিল এলাকা, এবং এ কারণেই অঞ্চলটির নাম সময়ের হাত ধরে ক্রমে মিল ব্যারাক হিসেবে পরিচিত হয়ে পড়ে। ১৯০৫ সালে প্রথম বঙ্গভঙ্গ হওয়ার ফলে এখানেই পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের পুলিশ ট্রেনিং কলেজ স্থাপিত হয়েছিল। এই মিল ব্যারাকের কাছেই রয়েছে আলমগঞ্জ। বাদশাহ আওরঙ্গজেব তথা আলমগীরের নামানুসারেই এই অঞ্চলের নামকরণ। এখানে ছিল পাঠান দুর্গ বা পাঠান কোট। এখন আর এই দুর্গের চিহ্ন নেই। ঢাকার জমকালো বহু প্রাসাদের মতো বুড়িগঙ্গার গর্ভে নিঃশেষ হয়ে গেছে সেই কবেই।

মিল ব্যারাক লোহার পুলের কথা হলো, কিন্তু একে ঘিরে দুটি মজার ঘটনার কথা বলা হয়নি। এখন সেই কাহিনি।

ওই যে বলেছি বটুর কথা, ওর মিল ব্যারাকের কালী সোম স্ট্রিটের বাড়ি যেতে হতো এই লোহার পুল ভেঙেই। আমাদের কালে আড্ডার ঢং ছিল ভারি উড়নচণ্ডী। তার না ছিল সময়জ্ঞান, না ছিল বিষয় নির্বাচনের সীমা। এক কথায় সেই আড্ডায় গল্পের ভুশুড়ি ভাঙা হতো। হয়তো বটুর বাড়ি আড্ডা জমেছে, যখন ফেরার পালার সময় হলো এগিয়ে দিতে এল ও আমায়—লোহার পুল পর্যন্ত। আবার আমার বাড়ি আড্ডা হলে এগিয়ে দিতুম ওকে ওই লোহার পুল সীমান্তে। মাঝে মাঝে এমন হতো যে উভয়ের বাড়ি পর্যন্তই এগিয়ে দেওয়ার কাজটি সম্পন্ন হতো। কিন্তু আমাদের আড্ডার সঙ্গে সৌজন্যবোধের এমন বোঝাপড়া ছিল যে গতি হতো শেষ পর্যন্ত ওই মাঝদরিয়ায় লোহার পুল। 'আপ আগে' সৌজন্যবোধের ঘটা কোনো কোনো দিন যামিনীর তৃতীয় প্রহর পর্যন্ত গড়াত।

কোনো দিন আড্ডা আগেভাগেই ভাঙলে বাড়ি ফেরার পথে হৃষিকেশ দাশ রোডের তস্য গলিতে গোলাম রহমানের বাড়ি যাওয়া হতো। কলকাতার ছেলে—চুটিয়ে আড্ডা হতো। দেখা হলেই আমাদের সম্বোধন ছিল 'লে হালুয়া'। ছোটোদের জন্য লেখালেখি করত। বাংলা একাডেমী পুরস্কার পেয়েছিল (১৯৬৯)। ওর নিউমার্কেটের বইয়ের দোকানে কত না মধুর সন্ধ্যা

কেটেছে! অজাতশত্রু সদা হাস্যময় গোলাম রহমান ১৯৭১-এর বলি হন। ওঁর লাশের হদিস মেলে ওঁদেরই পাড়ার ড্রেনে!

প্রেমেন্দ্র মিত্রের বিখ্যাত গল্প *হয়তো*র সঙ্গে জড়িয়ে আছে এই লোহার পুল। সেটা গত শতকের বিশের যুগ। প্রেমেন্দ্র মিত্রের খ্যাপাটে সময় তখন কলকাতা-ঢাকা-কলকাতায় কাটছে। ঢাকাতে একটু-বা থিতু—জগন্নাথ কলেজের ছাত্র তখন তিনি। বুদ্ধদেব বসুর *প্রগতি*র সঙ্গেও যুক্ত হয়ে পড়েছেন। পড়াশোনা যত নয়, আড্ডা চলে তার ঢের বেশি। কলকাতায় লম্বা আবেগময় চিঠি যায় বন্ধু অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের কাছে। আর ফাঁকফোকরে লেখালেখি। একদিন আড্ডা মেরে বাড়ি ফিরছিলেন। এর পরে প্রেমেন্দ্র মিত্রের জবানিতে :

'এক ঘন দুর্যোগময়ী রাতে একা আমাকে এই লোহার পুল পেরোতে হয়েছিলো বিশেষ প্রয়োজনে। আকাশে মেঘের ঘনঘটা, ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে আর মেঘের গর্জন শোনা যাচ্ছে, যে কোনো মুহূর্তে মুষলধারা শুরু হতে পারে, বজ্রপাতের সম্ভাবনাও কম নয়। কোনো পথিক চোখে পড়ল না—এই ভীষণ দুর্যোগের রাতে কে পথে বেরোবে নিতান্ত দায়ে না ঠেকলে? পথের সরকারী আলো মিট্ মিট্ করে জ্বলছে, তাতে রাত্রির দুর্যোগময় অবস্থাটা যেন আরো রহস্যময় হয়ে উঠেছে।...হঠাৎ লক্ষ্য করলাম আমার উল্টো দিক থেকে একটি পুরুষ আর একটি নারী পুল অতিক্রম করছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা আমাকে অতিক্রম করে গেল। হয়তো তাদের মধ্যে কোনো রহস্যই ছিল না, দিনের আলোয় বা কোনো দুর্যোগহীন রাতে তাদের পুল অতিক্রম করতে দেখলে আমার মনে কোনো রকম কৌতূহলেরই সঞ্চার হতো না। কিন্তু এই দুর্যোগময়ী রাত্রি আর পথের জনহীনতা এমন এক রহস্যের পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল যে, নানারকম "হয়তো" আমার মনে এসে ভিড় করল। এই অভিজ্ঞতা আর অনুভূতি থেকে একটি গল্প লিখেছিলাম, বোধহয় আমার সেরা গল্পগুলির অন্যতম।' (প্রেমেন্দ্র মিত্র স্মরণে/অকৃব : *কথাসাহিত্য*, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯৫)।

পাঠক, যাঁরা পড়েননি এই লোহার পুল আশ্রয়ী *হয়তো* গল্পটি, তাঁদের অনুরোধ করব কলকাতার 'নাভানা' নামের প্রকাশনা সংস্থা থেকে প্রকাশিত *প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ গল্প* গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত এই অপূর্ব গল্পটি পড়তে।
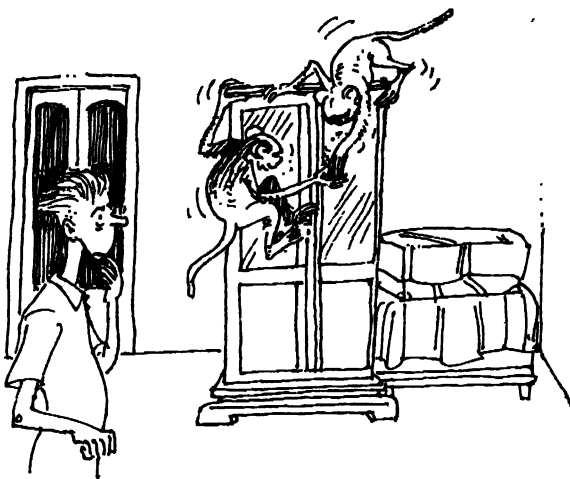
নরলোকে বানর

খোকন, বাবা দেখ তো, ঘরে হুটোপুটি করছে কারা?

আমি তখন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা কাঞ্চনজঙ্ঘা সিরিজের গা-শেতল-করা *মিসমিদের কবচ*-এর পাতায় ডুবে। প্রাচীনদের মনে না পড়েই পারে না—সেই যে বইয়ের গোড়ায় জানালা গলিয়ে আসা চকচকে ছোরা বাঁধা বাঁশের আঁকশি দুহাতে ধরা গল্পের বিস্মিত নায়কের ছবিখানার কথা। প্রতুল ব্যানার্জির অতুল আঁকা ছবিটা আজও হানা দেয় অতীত কাছে এসে দাঁড়ালে। আমি তখন সেই ভয়ংকর মুহূর্তে অদৃশ্য ছোরার সঙ্গে জুঝে চলেছি, এমন সময় রান্নাঘর থেকে মায়ের আদেশ। রাজ্যের বিরক্তি নিয়ে পাশের ঘরে গিয়ে দেখি আলমারির ওপরে যে বড় আয়না, তার সামনে বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি করে ছোটো দুটো বানর লম্ফঝম্ফ করছে কিচিরমিচির শব্দে। আয়নায় প্রতিফলিত প্রতিপক্ষদের দেখে খামচাখামচি করেও ঘায়েল করতে না পেরে ওদের রাগের মাত্রা বেড়েই চলছিল। প্রথমে আমার উপস্থিতি ওরা টের পায়নি। একটা কিছু করতে যাব, হঠাৎ মনে পড়ে গেল একেবারে শৈশবকালের কথা। তখন আমাদের আবাস কলকাতা। বৌবাজার-সেন্ট্রাল এভিনিউয়ের মোড়ে তেতলা

বাড়ির সবচেয়ে উঁচু তলায় থাকি। বৌবাজার মানে বাইজি-অলংকার-ফার্নিচার-ঘড়িওয়ালাদের পাড়া। তো আমাদের বাসাবাড়ির নিচেই ছিল এক ফার্নিচার তৈরির দোকান। দোকানির ছিল একটা বানর। সে বেচারা বাটালির ঘা দিয়ে কি র‍্যাদা চালিয়ে কাজ করত। তার পাশে শেকল বাঁধা বানরটি তা-ই দেখত আর থেকে থেকে কিচিরমিচির করত। আমরা দুভাই ওই বানরে মজে গেলুম। ওর লম্ফঝম্ফ, অবোধ কিচিরমিচির আমাদের আনন্দ জোগাত। একদিন গোমড়া মুখে বসে থাকতে দেখে অগ্রজ কাছে গিয়ে ওকে খেলাতে গিয়ে উচক্কা বানরের খামচা খেয়ে বসলেন। ছোট হাসপাতাল। চিকিৎসক বললেন, ১৪ দিন তক্কে তক্কে থাকতে হবে। বানরটা মরে কি মরে না! যদি বাঁচে তো ভাইও বাঁচবে। ভাগ্যিস, বানরটা মরেনি।

কাজেই আমি নিথর। কিছুক্ষণ পর আমার উপস্থিতি টের পাওয়া মাত্র কয়েক লাফে দরজা পেরিয়ে বানর যুগল পগার পার।

কাছে গিয়ে দেখি, তেলের শিশি উল্টে গড়াগড়ি খাচ্ছে। আলমারি মেঝে তেলে তেলে তেলময়। আর চিরুনি, বোনেদের চুলের কাঁটা-ফিতে কোথায় ছড়িয়ে নেই!

তো আমাদের ওই চল্লিশ-পঞ্চাশের যুগে ঢাকাতে এ ব্যাপারটা ছিল। ছিল বানরের এই উৎপাত।

এখন ঢাকার এই বানর-নাগরিকদের নিয়ে কিছু বলব।

নবাগতের দাপটে ঢাকার বহু তল্লাটকে আজ আর কেউ পুরোনো নামে ডাকে না। এই যেমন বকশী বাজারের কাছে চুহার বাজার নামে যে পল্লিটি ছিল, ভোল পাল্টে তা-ই আজ জয়নাগ রোড। কিন্তু চুহার বাজার কেন? বোধ করি চুহা অর্থাৎ ইঁদুরের উৎপাত বেশি ছিল। নাজির হোসেন তাঁর ছেলেবেলায় সাদা ইঁদুর অর্থাৎ গিনিপিগ বেচাকেনা করতে এবং অনেক বাড়িতে তা পুষতেও দেখেছেন। বোধ করি এ কারণেই জায়গার নামকরণ। সে যা-ই হোক, ১৯২১ সালে মাত্র তিনশত টাকার বিনিময়ে ঢাকা পৌরসভা স্থানীয় প্রতাপশালী নাগরিক জয়চান্দ নাগের সম্মানে এই রাস্তার নামকরণ করেন জয়চান্দ নাগ লেন, যা আজকের জয়নাগ রোড। এই জয়নাগের কাছেই ছিল একটা ছোট্ট এলাকা—বানরটুলি। আমাদের আবাসও ছিল এর ধারেকাছেই—কামিনীভূষণ রুদ্র রোডে। তো বানরটুলি নামটার উৎপত্তি জানা না থাকলেও ঢাকার রেয়াজ অনুযায়ী এ কথা ধরে নেওয়া যায়, নিশ্চয়ই এখানে একসময় বানরদের আস্তানা ছিল। তার মানে এই নয়, ঢাকার এখানেই শুধু বানরদের দেখা মিলত। আমাদের চাচা থাকতেন বংশাল রোডে,

'মানসী' সিনেমা হলের কাছে। সেখানেও ওদের কম দৌরাত্ম্য দেখিনি। এ ছাড়া বনগ্রাম, বানিয়া নগর—মোট কথা যেখানেই গাছপালার আধিক্য, সেখানেই আমি বানর দেখেছি। নাজির হোসেন তাঁর *কিংবদন্তীর ঢাকায়* বানরদের যে অপূর্ব বিবরণ দিয়েছেন, পাঠকদের কৌতূহল নিবারণের জন্য এখানে তা তুলে ধরছি: "...গাছগাছালি ও বাড়ির ছাদে অসংখ্য বানর চরাফেরা করতো। এমনকি ভোরবেলা শত শত বানর দলবদ্ধভাবে রাস্তার মাঝখানে বসে থাকতো আর মনের সুখে একে অপরের উকুন মারতো। রাস্তার ওপর বানরগুলো এমন বেপরোয়াভাবে বসে থাকতো যে পথচারীদের প্রতি তাদের কোনো ভ্রূক্ষেপই থাকতো না। দলবদ্ধভাবে বানরদের বসে থাকতে দেখে অনেকেই পথ চলতে ভয় পেতো। একা একা ভয়ে তাদের সামনে যেতে সাহস পেতো না। থমকে দাঁড়িয়ে পড়তো। চারপাঁচজন একত্রিত হলে তবে বুকে সাহস সঞ্চার করে ধীর পদক্ষেপে বানর দলকে অতিক্রম করে যেতো। এ সময় হয়তো বা বানররা সরে যেতো, কিন্তু পথচারীদের তাদের মাঝ দিয়ে পথ করে নিয়ে অগ্রসর হতে হতো। বানররা স্বভাবতই উচ্ছৃংখল প্রাণী। কিন্তু তাদের যেমন ছিল বুদ্ধি, তেমনি ছিল সাহস। তারা সুযোগ বুঝে মানুষের মতো ঘরের শিকল খুলে ঘরে ঢুকে খাবার-দাবারগুলো সাবাড় করে দিতো। রান্না করা ভাতের হাঁড়ি-পাতিল নিয়ে গিয়ে উঠতো ঘরের ছাদে, গাছের ডালে। খাবার না পেলে অনেক সময় কাপড়-চোপড় নিয়ে গিয়ে গাছে বা ছাদে উঠতো। গৃহিণীরা আদর করে খাবার-দাবার দিলে তবেই তারা সেগুলো ফেরত দিতো, নতুবা ছিঁড়েখুঁড়ে একাকার করে দিতো। ছেলেপুলের হাত থেকেও খাবার-দাবার ছিনিয়ে নিতো। তাদের ঘ্রাণশক্তি খুবই প্রখর। তাই বাজারের ঝাঁকা থেকে কেবলমাত্র খাবারের ঠোঙ্গাটি বেছে নিতে পারতো। এমনকি অনেক সময় এক হাতে খালইখানা ধরে অন্য হাত দিয়ে খাবার জিনিসটি ছিনিয়ে নিতো। এতে বাধা দেয়ার সাহস কারো হতো না। বাধা দেয়ার চেষ্টা করলেই বত্রিশখানা দাঁত খিঁচিয়ে তেড়ে আসতো। তখন ভয়ে আর কোনো কথাই বলতে সাহস পেতো না কেউ। বানরের উৎপাতে তখন গাছের লাউ-কুমড়ো থেকে আরম্ভ করে ফল-ফলারি কিছুই থাকতো না। এক কথায় বানরের উৎপাতে তখন এখানকার মানুষ সব সময়ই সন্ত্রস্ত থাকতো। মানুষ অনেক সময় গুলি করেও অনেক বানর মেরে ফেলতে কুণ্ঠাবোধ করতো না। এই বানর এখন আর ঢাকায় সেরকম দেখা যায় না। তবে কোনো কোনো মহল্লায় মাঝে মাঝে বানর দেখা যায়। তবে গাছপালা কমে আসায় বানরের সংখ্যাও কমে আসছে। কালে হয়তো এসব এলাকায়

আর বানরের অস্তিত্ব দেখা যাবে না। লোকালয় ছেড়ে তারা অন্যত্র চলে যাবে।" *(কিংবদন্তীর ঢাকা, নাজির হোসেন, পৃ. ২৭৭)।*

চলে যাবে না, চলে গেছে। যখন বানরের বাস ছিল এই ঢাকায়, তখন শহরের লোকসংখ্যা দু-তিন লাখের বেশি ছিল না। গাড়ি-ঘোড়ার উৎপাতও। গাছগাছালিপূর্ণ নিঝুম শহরে বানরদের নিরুপদ্রব অবস্থান ছিল অনুকূল। নতুন শতাব্দীর প্রথম পাদে এক কোটি অধ্যুষিত এই নরসমুদ্রে বানরকুল কোথায় ভেসে গেছে, কে বলতে পারে!

যেখানেই যাক, এখানে আমার বাবার বানর-ভাগ্যের কথা না বললেই নয়।

এ শতাব্দীর গোড়ার কথা। দাদুর কর্মস্থল সুদূর রাঁচী থেকে বাবা গ্রীষ্মের ছুটিতে বাড়ি ফিরেছেন—ঢাকার অদূরে বিক্রমপুরের এক নিভৃত গাঁ টোল বাসাইলে (আদি নাম ধনমানিক)। সেকালে গাঁ-গেরাম মানেই বনবনানী ঘেরা, পানাপুকুর আর নানা পশু-পাখিতে ভরা এক মায়াবী জগৎ। এমনি এক অরণ্য পথে এক নিদাঘ দুপুরে অন্যমনস্ক বাবা এগোচ্ছিলেন বন্ধুর বাড়ি যাবেন বলে। হঠাৎ, হঠাৎই তো, সুমুখে ঝুপ করে এসে পথ আটকে দাঁড়াল লম্বা লাঙ্গুলবিশিষ্ট এক লালমুখো হনুমান! বাবা ভড়কে গেলেন। হনুমানটা দাঁতমুখ খিঁচিয়ে হাসছে, না ধমকাচ্ছে, বোঝার উপায় নেই। বাবার কাঁপুনি বাড়ে। যত বাড়ে, হনুমানটা ততো লাফায়। লাঙ্গুল উঁচায় আর বুক থাবড়ায়। ভয়ে এতক্ষণ চোখটা ওর ওপরই নিবদ্ধ ছিল—সংবিৎ ফিরে পেয়ে পালানোর পথ খুঁজতে গিয়ে এপাশে ওপাশে তাকান—ওমা, চারদিকেই লালমুখোর দল! সবার দৃষ্টি তাঁর দিকে। বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পায় আর কি। কী খেয়াল হলো, ভাবলেন একটাই পথ—হাঁটু গেড়ে জোড়হাতে ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে বাবা সজল চোখে প্রাণভিক্ষা চাইতে থাকেন।

ওদের যে পথ আগলে দাঁড়িয়েছিল, প্রথমে সে, তারপর একে একে সবাই পথ ছেড়ে দিলে বাবা এক পা দু পা করে পথ ভাঙেন আর তাই দেখে ডালে ডালে হনুমানদের সেকি হাসি রাশি রাশি!

বানর পর্ব গেল, এবার ঢাকার কতিপয় খাজা মহল্লার কথা। প্রথমেই ঢাকার নবাবেরা আসেন। এঁদের বংশ উপাধি খাজা। তাই ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারের পুব পাশের রাস্তার নাম দাঁড়িয়েছে খাজা নাজিমউদ্দিন রোড। সেক্রেটারিয়েট ভবন ও রেল ভবনের মধ্যবর্তী রোডের নাম খাজা আবদুল গণি রোড। খাজা আহসানউল্লাহ রোডও আছে যেন কোথায়! কিন্তু প্রাচীনতার দিক থেকে ঐতিহ্যমণ্ডিত খাজা তো এঁরা নন। তেমন খোঁজে আমাদের মোগল আমলে যেতে হয় যে!

ওই যে জয়নাগ রোডের কথা ওপরে বলেছি, তার ধারেকাছেই রয়েছে মস্তো খাজে দেওয়ান মহল্লা। এই মহল্লার নামকরণের ইতিহাস এবার। স্বনামখ্যাত মোগল নওয়াব শায়েস্তা খাঁর আমলে দেওয়ান-ই-বুতাত অর্থাৎ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন মুরলীধর বাহাদুর। এই দক্ষ মন্ত্রী হিন্দু হলেও তাঁর কর্মকুশলতার জন্য শায়েস্তা খাঁ তাঁকে খাজা উপাধিতে ভূষিত করেন। রাজকর্মে কুশলী, জ্ঞানীগুণী ও বিশিষ্ট অভিজাত পরিবারের লোক হলেই হলো, জাতি-ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে খাজা উপাধি দেওয়া হতো। তবে মহল্লার নাম খাজা মুরলীধর দেওয়ান হলো না কেন, এ প্রশ্ন থেকে যায়, কিংবা ছিল হয়তো, কালের ছোবলে সংক্ষেপ হয়ে গেছে। এই মহল্লায় রয়েছে খাজে দেওয়ান ফার্স্ট
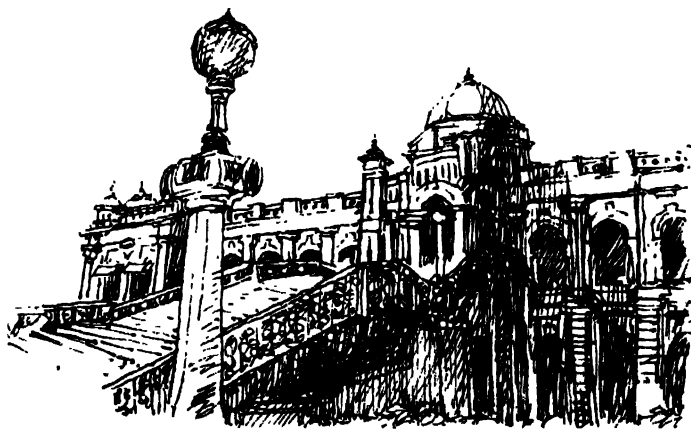
এই আহসান মঞ্জিলে দেশি-বিদেশি কত বিশিষ্ট অতিথি পা রেখেছেন!

লেন, সেকেন্ড লেন ও থার্ড লেন। পূর্ব দিকেও আছেন আরেক খাজা—খাজেদল সিং, বিশিষ্ট হিন্দু জমিদার। তাঁর নামেও একটি রাস্তা—খাজেদল সিং লেন। ঢাকার অসংখ্য বস্তির মাঝে খাজা বাগভাসা নামেও একটি বস্তি আছে। না, এ বাগডাসা কোনো অভিজাত জন্তুর নাম নয়—একজন গ্রিক ব্যবসায়ীর বিকৃত নাম। ওঁর প্রকৃত নাম পৌরসভার মহাফেজখানা ঢুঁড়লে পাওয়া যেতেও বা পারে।

খাজাদের কথা বলা হলো খাজাদের আহসান মঞ্জিল ছাড়াই। এই ভবনের কথা কয়েক সংখ্যা আগেই বলেছি, যা বলিনি, তা এর ঝলমলে নবরূপের কথা। তিন-চার বছর আগেও যা ছিল ঢাকার যত হাভাতেদের আড্ডাখানা,

তা-ই এখন রাজভবন—স্ববিভায় স্বরাট। যেমনটা ছিল নবাবদের গৌরবময় দিনগুলোতে। তখন এই আহসান মঞ্জিলে দেশি-বিদেশি কত বিশিষ্ট অতিথি পা রেখেছেন! থেকেছেনও। এমনই নাম করা যায় লর্ড লিটন, লেডি ডাফরিনসহ লর্ড ডাফরিনের। অসংখ্য মোমবাতি শোভিত এই প্রাসাদ চত্বরের অনুপম উদ্যানকে লেডি ডাফরিন 'গার্ডেন অব লাইট' নামে আখ্যায়িত করেছিলেন। ১৮৮৮ সালে প্রচণ্ড ঝড়ে এই আলোর বাগান ধ্বংস হয়ে যায়। ক্ষতিগ্রস্ত হয় ভবনটিও। এই ক্ষতি সামলাতে না-সামলাতে দেখা দেয় ভূমিকম্প। ১৮৯৭ সালে। কিন্তু আবার মাথা তুলে দাঁড়ায়। ব্রিটিশ রাজের শেষ দিকে নবাবদের প্রতিপত্তি নিঃশেষ হতে থাকলে আহসান মঞ্জিলের ভাগ্যে আবারও দুর্যোগ নেমে আসে। নবাব পরিবার দ্বারা পরিত্যক্ত হয় মঞ্জিল। পরিণত হয় আঁস্তাকুড়ে।

কিন্তু ভাঙাগড়ার মধ্যে যার ইতিহাস রচিত, সে কি ভাঙবার জিনিস! প্রবল নিষ্ঠা ও দীর্ঘদিনের অক্লান্ত পরিশ্রমে বাংলাদেশের স্থপতি, প্রকৌশলী, শিল্পী, কারিগর ও ইতিহাসবিদসহ সবার প্রচেষ্টায় আহসান মঞ্জিল আজ তার পূর্ব বিভায় জনগণের কাছে জাদুঘরের নতুন পরিচয়ে উন্মোচিত। তবে অতি সম্প্রতি এক তথ্যে জানা গেছে, নির্মাণকাজে নিযুক্ত কিছু অসাধু কর্মচারী ও ঠিকাদারের অবহেলার কারণে চৌদ্দ কোটি টাকা ব্যয়ে পুনর্নির্মিত এই ভবনের বেশ কিছু কক্ষের ঘুণে ধরা কড়িবর্গা পরিবর্তন না করায় আজ আহসান মঞ্জিল নিরাপদ নয়। মাত্র দু-তিন বছরের ব্যবধানে এমন দুঃসংবাদ মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। দর্শনার্থীদের জন্য জাদুঘরে পরিণত আহসান মঞ্জিল বন্ধ করে দেওয়া হবে বলে আমরা জানতে পেরেছি। অপয়া বলে একটা কথা আছে—এই মঞ্জিল সম্পর্কে শেষ কথা বলে কিছু নেই। সাম্প্রতিক বিপর্যয় এ কথাই প্রমাণ করে।
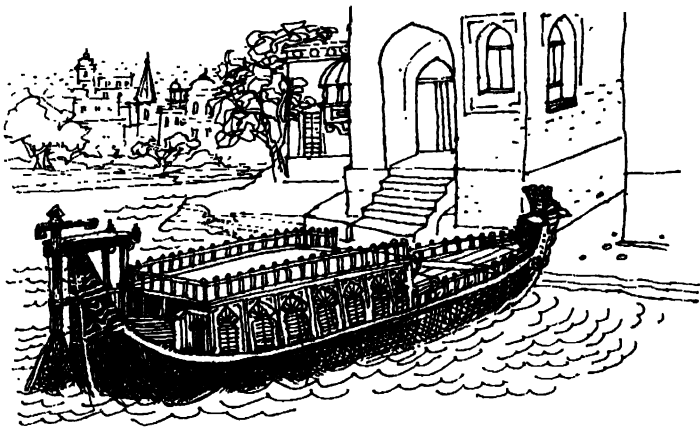
ঢাকার বুকে

আমরা উঠলুম ৩৬ নম্বর কাম্মিনীভূষণ রুদ্র রোডে, যার পোশাকি নাম চাঁদনী ঘাট। ১৯৪৮-এর ঢাকা। ব্রিটিশ আমলের পুরো গন্ধ তো ছিলই, মোগল আমলের ছিটেফোঁটা লালবাগ, আমলিটোলা, চকবাজার, মোগলটুলি, ইসলামপুর—এসব এলাকার অলিগলিতে যেন বা সেকালও উঁকি মারত। আমাদের এই হিসেবে প্রাউডলকের উদ্যান নগরী শ্যামলী রমনা হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো এক বিস্ময়। এ কথা বলা যাবে না নবাবি আমলের ঢাকা সম্পর্কে। বিদ্যুতের ব্যবহার তখনো সর্বগামী ছিল না। ফলে সন্ধে নামলেই সেকালের জেলা শহরগুলোর মতোই অন্ধকার নেমে আসত ঢাকার শিরা-উপশিরায়, বাড়ি বাড়ি জ্বলে উঠতো হারিকেন লণ্ঠনের আলো। মাঝে মাঝে খাপছাড়াভাবে কোনো কোনো ভাগ্যবানের বাড়ির জানালা গলিয়ে বিদ্যুতের ঝলমলে নরম আলো এসে পড়ত খোয়াভাঙা রাস্তার ওপর। হয়তো গুটিসুটি শুয়েছিল কোনো নষ্টচেতন কুকুর। ভয় পেয়ে নিরাপদ দূরত্বে গিয়ে পিটপিট করে তাকাত ওই আলোকচ্ছটার দিকে এবং আশু কোনো আশঙ্কা দেখতে না পেয়ে পৈথানে মুখটি আলতোভাবে রেখে চোখ বুজত আবার। রাত যত গভীর হতো, নাইট শোয়ের যাত্রীদের নামিয়ে ঘরে ফিরত ছ্যাকড়া গাড়িগুলো ছরছর-

টগবগ শব্দ তুলে। কোচোয়ানের মুখে হয়তো ফিরছে 'অচ্ছুৎকন্যা'র দেবীকা রানীর গান 'সঁ'বনকে চিড়িয়া বনবন বলুঁরে' কিংবা কাননের অমর গান 'আমি বন ফুল গো' অথবা 'বসন্ত' কি 'বন্ধন' ছবির চটুল কোনো চরণ। আবার কুমোরটুলি কি সাঁচীবন্দরের হট্টবিলাসিনীদের সঙ্গসুখ ফেরত টুপভুজঙ্গ কেউ টোয়াতে টোয়াতে একবার পড়ছে নর্দমায় তো আরেকবার 'আয় মেরি জান' বলে জড়িয়ে ধরছে ইয়ার-স্যাঙ্গাতকে কিংবা কোনো নিরীহ পথচারীকে। বওয়াটে পিলইয়ার ছোকরার তাড়ির পেটগোলানো গন্ধে বেচারির বিবমিষার যো—পালাতে পথ পায় না। রিকশাওয়ালা অকারণ ঘণ্টা বাজিয়ে গৃহস্থের শয়নভঞ্জন ঘটিয়ে এবং ওই অতো রাতে 'চিনাবাদাম' বলে শেষ হাঁকটি হেঁকে ঘরে ফিরছে পিচ্চি এক বাদামওয়ালা। পাড়ার যে ভাগ্যিমানের বাড়িতে বেতারযন্ত্র রয়েছে, ভেসে আসছে তারই সুবাদে সেকালের জনপ্রিয় রেডিও সিলোনের কৃপায় শীতের কুয়াশাচ্ছন্ন মায়াবী রাতে কোকিলকণ্ঠী খুরশিদের *তানসেন* ছায়াছবির বর্ষার আগমনী গান—'বরষো বরষো/জোর জোর ঘন ঘোর শোর কর বরষো...।' অদূরে ফাঁড়িতে পেটা ঘণ্টায় যামিনীর দ্বিতীয় প্রহর ঘোষিত হতেই পুরবাসীরা নতুন করে ঘুমানোর প্রস্তুতি নিত। জেগে উঠত আজকের মতো মাইকের অসুর ধ্বনিতে নয়, সাদামাটা মিঠে গলায় আজানের বোলে।

আগেই বলেছি, আমাদের তখন চকবাজারের কাছে উর্দু রোডসংলগ্ন চাঁদনীঘাট রোড তথা কামিনীভূষণ রুদ্র রোডে বাড়ি। চাঁদনীঘাট কেন কামিনীর রুদ্র রোষে পড়ে ঘাট মানল, এখন সেই কথা।

মোগল আমল সেটা। নবাব ইসলাম খাঁ চিশতি তখন সম্রাট জাহাঙ্গীর নিয়োজিত বাংলার প্রথম সুবেদার হিসেবে ঢাকাতে। বুড়িগঙ্গার তীরের এই চাঁদনীঘাটের তখন খুব নামডাক। বর্তমান ওয়াটার ওয়ার্কস রোড এবং বিলুপ্তপ্রায় বশিরুদ্দিন সরদার পার্কটিকে ঘিরে যে মস্ত এলাকা, তার পুরোটা জুড়ে ছিল চাঁদনীঘাট অঞ্চল। এই ঘাটের নামের সঙ্গে চাঁদনী যুক্ত হওয়ার পেছনে রয়েছে নবাব ইসলাম খাঁর এক বজরা।

এ ঘাটে থাকত নবাবের বজরার বহর। বহরে ছিল *চাঁদনী* নামের এক বিরাট শাহিবজরা। প্রমোদতরী হিসেবে ব্যবহৃত হতো। যদিও *ফতেহ্ দরিয়া* নামেও তার আরেকটি প্রমোদতরী ছিল, তথাপি জাঁকজমকের দিক দিয়ে বেশি আড়ম্বরপূর্ণ চাঁদনীর নামেই ঘাটের নাম ছড়িয়ে পড়ে। এই বজরা ও ঘাটের প্রতি নবাবের এতই দুর্বলতা ছিল যে তিনি এই ঘাটের কয়েক মাইলের মধ্যে কোনো নৌকো বা জলযানের প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন। মতান্তরে এই

চাঁদনী বজরাটি ছিল সুবেদার ইসলাম খাঁর পরিবারের আবাসস্থল। এটি যেখানে বাঁধা থাকত বা যেখানে তার প্রথম আগমন ঘটেছিল, সেই স্থানটিই চাঁদনীঘাট নামে পরিচিত হয়ে পড়ে। আজ সেই খাঁ সাহেবও নেই, তাঁর বোলবোলা ও চাঁদনীও নেই। কালের ছোবলে সবকিছুই নিশ্চিহ্ন।

তবে বজরার বহর না থাকলেও যেন বা ঘাটের মর্যাদা রক্ষার জন্য বর্ষাকালে যখন ক্ষীণতোয়া বুড়িগঙ্গা তীরের পাশ দিয়ে কুলকুল রবে বয়ে যেত, তখন এই ঘাটজুড়ে এই সেদিনও চোখে পড়ত বেদেদের নৌকোর বহর। আর দেখা মিলত দূরদূরান্তে যাত্রী ও মাল বহনকারী গহনা নৌকোগুলোকে নোঙর ফেলতে এই ঘাটে। "আহেন, আহেন, শ্রীনগর, ষোলোঘর, হাঁসাড়া, বহর, টঙ্গিবাড়ী, বহর...'—গহনার মাঝিদের এ রকমের হাঁকাহাঁকি ও ডাকাডাকিতে ঘাটটা মুখর হয়ে উঠত। শুধু কি গহনা, এই ঢাকার বুকে গ্রাম থেকে আসা পালকিও দেখেছি আমি। তোলবোলে গা খোট্টা বেহারারা যখন নির্দিষ্ট ছন্দে পা মিলিয়ে হুম্ হুম্ শব্দে শহরের বুকে পা দিত, সে ভারি দেখার জিনিস ছিল। পঞ্চাশের পর আর পালকি চোখে পড়েনি। তবে পালকি নিয়ে আরও দু-চার কথা বলা যায়।

আমাদের দেশে যেসব পালকি বাহকদের দেখা যেত, তাদের বেশির ভাগই বিহারের চাপরা ও মোজাফফরপুর থেকে আসত। বেহারা বলতে হাড়ি, দুলে, বাগদি—এসব হিন্দু ছোট জাতের লোকদের বোঝাত। আমাদের পূর্বপুরুষেরা ছিলেন পেশায় ধর্মজীবী। দূরদূরান্তে ধর্ম প্রচারের জন্য যাতায়াত ছিল তাঁদের। বাহন ছিল প্রধানত ঘোড়া। তারপরই পালকি। আমাদের গ্রামের বাড়িতে তাই বেহারাদের একটা আস্তানা ছিল। ওদের নিজেদের ঢঙে ঘরও তুলে নিয়েছিল। আসত ওরা বর্ষা শেষে শীতের শুকনো মৌসুমে। বর্ষার পানি যখন পথে-প্রান্তরে ডানা ছড়াত, বার-বাড়ির নির্দিষ্ট একটি এলাকায় পালকি তুলে রেখে দেশমুখো হতো ওরা। আমার বেশ মনে পড়ে, কলকাতা থেকে এসে সেকালের প্রথা অনুযায়ী আমার খতনা উপলক্ষে রামধনিদের পালকি চড়া হয়েছিল। সে ভারি মজার অভিজ্ঞতা। রামধনি, মুনশি—এসব নাম আজও মনে পড়ে। মনে পড়ে নিশুতি রাতটাকে ওদের কণ্ঠের গল্প কেমন উদাস করে তুলত।

আমাদের সেই কালে, যখন ঢাকা ছিল ছোট, যার গা থেকে জেলা শহরের গন্ধ পর্যন্ত যায়নি, আসত বেদেনিরা তাদের শাড়ির গাঁঠরি আর বেলোয়ারি চুড়ি, সস্তা পমেটম ও অন্যান্য বিনোদী পশরার ধামা নিয়ে। বিপুলজঙ্ঘা এসব গজেন্দ্রগমনা বেদেনিদের দিকে তাকিয়ে বখাটে পথচারী

কেন যে গান গেয়ে উঠত, বুঝতাম না। যাতায়াতব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি হওয়ায় এবং দৈনন্দিন দ্রব্য হাতের নাগালে এসে যাওয়ায় ঘাটে ঘাটে বেদেদের কেনাবেচা যেমন বন্ধ হওয়ার পথে, নৌকোর যাযাবর ভাসমান জীবনও লুপ্ত হওয়ার পথে। চাঁদনীঘাটে বেদে নৌকোর বহর তেমন আর দেখা না মিললে অবাক হওয়ার কিছু নেই। আজ থেকে আশি বছরাধিক আগে এই চাঁদনী অঞ্চলে থাকতেন প্রতিপত্তিশালী এক বিশিষ্ট নাগরিক—কামিনীভূষণ রুদ্র। তাঁর মৃত্যুর পর তৎকালীন পৌরসভা তাঁর সম্মানে কলমের এক খোঁচায় চাঁদনীঘাট রোডের ঐতিহাসিক নামটি মুছে ফেলে। তবে কাগজপত্রে নাম পরিবর্তিত হলেও লোকমুখে ওই এলাকার নাম কিন্তু চাঁদনীঘাটই ঘোরে। স্থানীয় বোলে যা *চান্নিঘাট*।
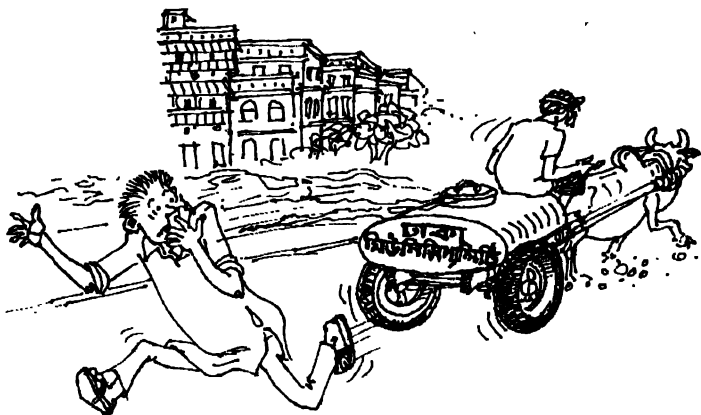
প্রভাতি ভ্রমণ নাস্তি

না, এ কোনো বটকেরা নয় বা বাক্প্রপঞ্চ। বিদ্যুৎ ছিল, পানি সরবরাহের ব্যবস্থা ছিল, ছিল না সুষ্ঠু পয়ঃপ্রণালী। যেসব বাড়িতে ব্যক্তিগত উদ্যোগে স্যানিটারি টয়লেটের ব্যবস্থা ছিল, তাদের কথা হচ্ছে না। সেকালে সব বাড়ির পায়খানা ছিল কাঁচা এবং মল ধারণের জন্য নিচে মাটির যে বড়সড় জালা থাকত, তার খোলা দিকটা রাস্তামুখো হওয়ায় পথচারীর দৃষ্টিপথে ও নাসারন্ধ্রে যুগপৎ হানা দিতে কার্পণ্য করত না।

ফলে সকালের শান্তশিষ্ট রাজপথে বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করতে বেরোনো মানে নাকে এসে জুটত ফুরফুরে হাওয়ার সঙ্গে পুরীষ সৌরভ! মিউনিসিপ্যালিটির বিধান অনুযায়ী এটা হওয়ার কথা নয়—খোলা দিকটা দরজার আড়ালেই থাকার কথা। কিন্তু বাঙালির বিধান ভাঙাই মস্ত বিধান। প্রশ্ন উঠতে পারে রাস্তামুখো কেন ওই মলভাণ্ডের অবস্থান! তাহলে খুলে কই।

নিয়ম ছিল মিউনিসিপ্যালিটির মেথর হপ্তায় দুই দিন ওই মলভাণ্ড পরিষ্কার করে নিয়ে যাবে তাদের গরুর গাড়ি করে। গাড়িতে থাকত বিশাল বপু পিপে। গাড়ি থামত প্রতিটি বাড়ির পায়খানার সুমুখে—জালাগুলো পুরীষ-শূন্য হয়ে পিপে পূর্ণ হতো। এই গাড়িগুলো যখন রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করত, পাদচতুর

পথচারীর পা প্রথমে হনহন, তারপর শনশন, সবশেষে জাটোপেকের দৌড়! আজও পুরান ঢাকার অন্দরমহলে উঁকি মারলে এই বিরল দৃশ্য দেখার সৌভাগ্য আপনার হয়েও যেতে পারে।

এ প্রসঙ্গে আমার মনে পড়ে যায় একটি কার্টুনের কথা। আমার পরিচালনায় ও অগ্রজ মঈদ-উর-রহমানের (*ময়ূরের পা* গল্পগ্রন্থ খ্যাত) সম্পাদনায় তখন *ঝংকার* নামে একটি কিশোর মাসিকপত্র বেরোত।

এটাই ছিল পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম কিশোরপত্র (ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৯- নভেম্বর ১৯৫০)। তাতে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে কটাক্ষ করে পর পর দুটি সংখ্যায় দুটি কার্টুন ছেপেছিলাম। একটা কার্টুনের বিষয়বস্তু ছিল মশার দৌরাত্ম্যে ঢাকাবাসীর করুণ অবস্থা (যে দৌরাত্ম্যের রিলে রেস আজও অম্লান) এবং আরেকটি ছিল ঢাকার বুকে মলভাণ্ডবাহিত পিপের গাড়ি ও সে কারণে পথচারীদের 'দৌড় প্রতিযোগিতা'! এ নিয়ে তৎকালীন স্বাস্থ্যমন্ত্রী হবীবুল্লাহ বাহার চৌধুরী ভারি অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। *ঝংকার* কাগজের মতো একটি তুচ্ছ কার্টুন যে স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে এতটা উতলা করবে, প্রথমে বুঝতে পারিনি।

আমাকে তিনি বিশেষ স্নেহ করতেন এবং ছাত্রাবস্থায় কাগজ বের করার বিপদ সম্পর্কে সবিশেষ উপদেশও তিনি দিয়েছিলেন। আমার জেদ দেখে 'কাগজ বের করবে করো; কিন্তু পড়াশোনার যাতে ক্ষতি না হয়, সেদিকে লক্ষ রেখো। তোমাদের মা-বাবা কিন্তু তোমাদের দিকেই তাকিয়ে আছেন', বলে *ঝংকার* তহবিলে চাঁদা দিয়েই ক্ষান্ত হননি, একটা বাণীও লিখে দিয়েছিলেন।

এসব কথা দশম শ্রেণীর পড়োর না বোঝার কোনো কারণ নেই। অনুতপ্ত হয়েছিলাম। আজ ভাবি, ওটা ছিল কিশোর বয়সের চাপল্য।

মজারু কবিতার ফাঁদে

'সেকালের ঢাকা' শিরোনামে যাত্রা শুরু করেছিলাম সাপ্তাহিক *চলতিপত্রের* পাতায় ১৯৯৯ সালে, যদিও শিরোনামের শিরোনাম দিয়েছিলেন পত্রিকা কর্তৃপক্ষ 'মীজানুর রহমানের কলাম'। মাফ করবেন, এটা কোনো কলাম নয়, স্মৃতির টুকনি হাতে টোয়ানো কলম মাত্র। বাউনি বাওয়ার আগেই বাঘাহামা কালে কেন শিরোনামে হাত পড়ল, তার একটা কৈফিয়ত পাঠকদের প্রাপ্য।

সেকাল মানে আমার কাল, অর্থাৎ বাহান্ন এখন তো ছাপ্পান্ন বছরের সেকেলে ঢাকার কথা। আর ঢাকার ওই কালটাকে বুঝতে হলে অচিন্ত্যকেলে হওয়া ছাড়া গতি নেই। অচিন্ত্য মানে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের *কল্লোল* যুগে। অর্থাৎ আরও কুড়ি বছর পিছিয়ে ওই যখন বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অজিত দত্ত ও অচিন্ত্য বাবুরা মিলে বুদ্ধদেব বাবুর দিদিমার পুরোনো পল্টনের বাসায় হল্লাহাসির দিন কাটাচ্ছেন, যখন ওঁদের মনে হতো 'বোহিমিয়ায় এসে বাসা নিয়েছি', সেই বিশের যুগের ঢাকাতেই যেতে হবে আমাদের, তাহলেই অন্য ঢাকাকে চেনা যাবে। ঢাকার প্রতিটি পল্লির রূপ-রস-গন্ধ অনুপ্রাসসমৃদ্ধ এই মজারু কবিতায় জাল-ছেঁড়া পোলো-ভাঙা মুখে কেমন উঠে এসেছে, দেখুন :

ফাগুনের গুণে 'সেগুনবাগানে' আগুন বেগুন পোড়ে,
ঠুনকো ঠাটের 'ঠাঠারিবাজারে' ঠাঠা ঠেকিয়াছে ঠিক;
ঢাকার ঢেঁকিতে ঢাকের ঢেঁকুর ঢিঢিক্কারেতে ঢোঁড়ে,
সং 'বংশালে' বংশের শালে বংশে সেঁধেছে শিক।

ভুয়া 'উয়ারির' কুয়ার ধুঁয়ায় চুঁয়ায় গুয়ার শুঁয়া,
বাছা 'এছাকের' কাছার কাছেতে কাছিমের কাছি আছে;
'চকের' চাক্কু-চাক্কায় চিকা চকচকি চাখে চুয়া
'সাঁচিবন্দরে' মন্দোদরীরা বন্দী বান্ধিয়াছে।

পাষণ্ড ঐ 'মৈসুণ্ডির' মুণ্ডে গণ্ডগোল,
'সুত্রাপুরের' সূত্রধরের পুত্রেরা কাৎরায়,
'লালবাগে' লাল ললনার লীলা ললিত-লতিকা-লোল
'জিন্দাবাহার' বৃন্দাবনেরে নিন্দিছে সন্ধ্যায়!

'বক্সীবাজারে' বাক্সে নক্সা মকশো একশোবার,
রমা রমণীরা 'রমনায়' রমে রম্যা রম্ভাসম;
'একরামপুরে' বিক্রি মাকড়ি লাকড়ি শুক্রবার,
গন্ধে অন্ধ 'নারিন্দ্যা' যেন বিন্দু ইন্দুপম।

চর্ম্মে ঘর্ম্ম 'আর্ম্মেনিটোলা' কর্ম্মে বর্ম্মাদেশ,
টাকে-টিকটিকি-টিকি 'টিকাটুলি' টিকার টিকিট কাটে,
'তাঁতিবাজারের' তোৎলা তোতার তিতা-তরে পিত্যেশ,
'গ্যাণ্ডারিয়ার' ভণ্ড গুণ্ডা চণ্ড চঞ্চু চাটে॥

বিখ্যাত সাহিত্যপত্র *শনিবারের চিঠিতে* কবিতার অনুপ্রাস নিয়ে সম্পাদক সজনীকান্ত দাস সম্পাদকীয় 'সংবাদ-সাহিত্যে' কটাক্ষ করে মন্তব্য করায় অজিত দত্ত, বুদ্ধদেব বসু ও অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত—এই তিন বন্ধু মিলে মুখে মুখে এই কবিতাটি রচনা করেন। ঢাকাকে ঘিরে এই কবিতার নাম দেওয়া হয়েছিল 'ঢাকা-ঢিক্কি' বা 'ঢাকা-ঢক্কা'।

তো, আমরা যখন ঢাকায় আসি, এই কবিতার সঙ্গে মিলিয়ে দেখলুম উনিশ শ পঁচিশের কালটা যেন থিতু হয়ে আছে উনিশ শ সাতচল্লিশেও। কাজেই শিরোনাম পাল্টাতে ঢাকা-ঢিক্কি নামটা ধার করতে দ্বিধা করিনি।

বছর দশেক, রাজধানী হওয়ার পরেও, ঢাকার আদলে তেমন একটা পরিবর্তন চোখে পড়েনি। ১৯৫৮-য় আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের গোড়া থেকেই হঠাৎ যেন ঢাকা তার ডালা খুলে নড়েচড়ে বসল। পুরোনো ঢাকার মধ্যে আবর্তিত নাগরিক জীবন নতুন ঢাকার সবুজ এলাকায় পা রাখা শুরু

করল। চতুর আইয়ুব পূর্ব পাকিস্তানবাসীর হৃদয়মন জয় করার জন্য অবাঙালিদের দিয়ে মিল-ফ্যাক্টরির সংখ্যা বাড়ানোর পাশাপাশি ঢাকা শহরের উন্নয়নের দিকে দৃষ্টি দিলেন। ঢাকাকে দিলেন দ্বিতীয় রাজধানীর 'মর্যাদা' এবং এ বাবদে সংসদ ভবনের কাজেও হাত দিলেন। এখন যে তালতলা পর্যন্ত বিস্তৃত সংসদ ভবনের এলাকা, সেটা তখন 'সেকেন্ড ক্যাপিট্যাল' হিসেবে খ্যাত ছিল এবং নির্মীয়মাণ সংসদ ভবন 'ন্যাশনাল অ্যাসেমব্লি হাউস' বা 'জাতীয় আইনসভা ভবন' নামে পরিচিতি ছিল। কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ তথা এয়ারপোর্ট রোডে অ্যালেনবেরি কম্পাউন্ডে অস্থায়ীভাবে যে আইনসভার সদনটি নির্মিত হয়েছিল, তা আজও 'অ্যাসেমব্লি হাউস' নামেই পরিচিত হয়ে আসছে। কিছুদিন আন্তর্জাতিক সভা-সেমিনার হতে দেখেছি। এখন তা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। কিন্তু এসব কথা যথাসময়ে বলা যাবে।

প্রসঙ্গটা যে কারণে টানলুম, তা হচ্ছে, ঢাকা নগরের প্রাচীন অধিবাসী যাঁরা, তাঁদের পক্ষে দীর্ঘ সময়ের বেড়া ভেঙে ঢাকা-টিক্কির মর্মোদ্ধার করা খুব একটা কঠিন কাজ কিছু হবে না, কিন্তু নতুন প্রজন্মের কাছে পুরো কবিতাটিই এক মস্ত ধন্দ ঠেকবে। তাহলে একবার কবিতার অন্দরমহলে যেতে হয়।

সব ছত্রের মানে খুঁজতে যাওয়া বোকামো হবে, অনুপ্রাসের খেলায় মত্ত কবিদের সেসব শব্দ-শব্দ খেলা। প্রথম ছত্রে সেগুন বাগানের কথা আছে। এককালে এই অঞ্চলে যথার্থই সেগুনের প্রাধান্য ছিল। ব্রিটিশ আমলে কতিপয় অসাধু ব্যবসায়ীর কুনজরে কাটা-ছেঁড়া হয়ে এই অঞ্চল সেগুন-শূন্য হয়ে পড়ে। ঢাকাবাসীর ভাগ্য ভালো, নতুন ঢাকার নিসর্গ-স্থপতি প্রাউডলক সেগুনবাগিচাসংলগ্ন রেসকোর্স ও রমনা গ্রিনের দুই পাশে বুনে দিয়েছিলেন সেগুনের চারা। এই সেদিনও, জিয়ার জঙ্গি শাসনের কোপানলে ধরাশায়ী হওয়ার আগ পর্যন্ত সেগুনবীথি হরষে পুলকে মাথা নেড়ে পথচারীদের মনোরঞ্জন করত। কে যেন চৈত্রে সেগুনের ঝরা পাতার মর্মরধ্বনিকে 'সাইলেন্ট মিউজিক' বলে আহ্লাদ জানিয়েছিলেন। তারপর যখন 'ফাগুন যৌবন দেয় ফিরে ফিরে ডালে' আর বর্ষায় ফোটে ঘেটু ফুলের মতো দেখতে থোলো থোলো অসংখ্য সাদা ফুল, তখন সুমন্দ মদালস গন্ধে পথিক কিছুক্ষণের জন্য হলেও অন্যমনস্ক হয়ে পড়ত। তিন কবির চোখে ধূসর পাতা সাদা ফুল কেন আগুনে ঠেকল, এ ব্যাখ্যা দেওয়া যাবে না। তবে আমার মনে হয়, সেগুন বাগানের কৃষ্ণচূড়া ও রেইনট্রির গাছেই ওরা আগুন দেখেছেন। কিন্তু ফাগুনে তো নয়, সে তো বৈশাখে আর আষাঢ়ের ভরা বর্ষায়। তবে কবিরা তো দেখেন

কবির চোখে, আমার চোখে তো নয়। যেমন রবীন্দ্রনাথ শরৎকালের বর্ণনায় যখন লেখেন—'আঁঠি-আঁঠি ধান চলে ভারে ভার'—কথাটা যে ঠিক নয় অর্থাৎ শরতে যে ধান কাটা হয় না এবং নবান্ন যে শরতের অনুষ্ঠান নয়, অনেক পরে পুব বাংলার এক ছাত্রের কাছে জেনে চৈতন্যোদয় হয়েছিল।

ঠাঠারিবাজার, যেটা জনৈক ইংরেজ ক্যাপ্টেনের অনুসারে ক্যাপ্টেন বাজার, তা কাপ্তানবাজার নামেও খ্যাত। এখানে একসময় কাঁসারিদের পল্লি ছিল। কাঁসারিদের অপর নাম ঠাঠারি। হয়তো যত ঠাটবাট তাদের, উৎকৃষ্ট বিচারে তারা তা ছিল না হয়তো, যে-কারণে ঠুনকো ঠাঠের অপবাদ জুটেছে ঠাঠারিদের। কোনো কোনো গবেষক বলেন, কাঁসারিদের ঠাঠারিবাজারটা আরও পুরোনো, কাঁচা বাজারের অভাবটা লক্ষ করেই অনামা কোনো সেনাধ্যক্ষ বাজারটার পত্তন করেছিলেন। আর কে না জানে ইংরেজদের বাজারপ্রীতির কথা। কলকাতায় হগ সাহেবের বাজার (যা পরে নিউমার্কেট), জন সাহেবের বাজার (বিকৃত হয়ে যা জান বাজার) ইত্যাদি তো তা-ই সাক্ষ্য দেয়।

নানা মুনির নানা মত ঢাকার নামকরণ নিয়ে। কেউ বলেন রাজধানী বিক্রমপুর ও সোনারগাঁয়ের নিরাপত্তার জন্য যে স্থানটি ঢেক্কা বা ঢাক্কা তথা ডাক চৌকি হিসেবে ব্যবহৃত হতো, সে স্থানই ঢাকা নাম ধারণ করেছে। আবার কারও মতে, বুড়িগঙ্গার তীরে অবস্থিত প্রাচীন একটি ঢাক বৃক্ষের কারণেই শহরটির নাম ঢাকা। তবে 'ঢাকের ঢেঁকুরে'-র কথা যদি ধরি, তাহলে বাদ্যযন্ত্র ঢাক থেকেই ঢাকার উৎপত্তি। ঢাকের শব্দটা তো ঢাকের ঢেঁকুরই! কথিত আছে, সুবে বাংলার প্রথম মোগল শাসনকর্তা ইসলাম খাঁ যখন নয়া রাজধানীর স্থান নির্বাচনের জন্য বর্তমান ইসলামপুর এলাকায় বজরা থেকে অবতরণ করেন, তখন তিনি দেখতে পান, সেখানে হিন্দুরা ঢাকঢোল বাজিয়ে পূজা-অর্চনা করছে। মজা পেয়ে তিনি বাদকদের খুব জোরে ঢাকঢোল বাজানোর নির্দেশ দিয়ে তিন দিকে তিনজনকে পাঠালেন। একদিকের সীমানা থাকল নদী। যে তিনজন তিন দিকে গেল, তাদের বলে দেওয়া হলো, যেখানে গিয়ে তারা আর ঢাকের শব্দ শুনতে পাবে না, সেসব স্থানে তিনটে সীমানা পতাকা স্থাপন করবে। এবং এ স্থানগুলোই পরে সীমান্তস্তম্ভ নির্মাণের মাধ্যমে চিহ্নিত হলো রাজধানীর সীমানা হিসেবে। ঢাকের শব্দে মন্দ্রিত এলাকা নিয়ে গঠিত বলেই রাজধানীর নাম হলো ঢাকা। আবার কেউ বলেন, সীমানাচিহ্নিত এলাকায় ঢাকা নামের সবচেয়ে বড় পল্লির নামেই ঢাকার নামকরণ। কেউ কেউ ঢাকেশ্বরী মন্দিরের নামও উল্লেখ করেন।

বংশাল নামের সঙ্গে ব্যাঙ্কশালের যোগ। পোতাশ্রয়ের যে জায়গায

মেরামতের জন্য নৌযান নোঙর করা হয়, তাকে ব্যাঙ্কশাল বলে। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন নদীর ধারের রাস্তাগুলোর নাম প্রায়শ ব্যাঙ্কশাল দেখা যায়। এই এলাকায় এই তো সেদিনও বুড়িগঙ্গার সঙ্গে সংযোগ রক্ষাকারী ধোলাই খাল ছিল। এই খালে নৌকোর আনাগোনাও ছিল। হয়তো বহু আগে মেরামতের জন্য এই খাল দিয়ে নৌযান আনা-নেওয়া হতো। হয়তো সে কারণেই ব্যাঙ্কশাল নাম, পরে লোকমুখে যা বংশালে রূপান্তরিত।

উয়ারী কেন ভুয়া তা তো বুঝলাম না—এ বোধ করি অনুপ্রাসের কারসাজি। পুরান ঢাকার এক প্রান্তে বলধা গার্ডেন। পাশে খ্রিষ্টান গোরস্থানের উল্টো দিকে ১৮৮৪ সালে একটা বনেদি অভিজাত আবাসিক এলাকা গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেয় তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার। তখন ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন মি. অয়্যার। সেকালে ম্যাজিস্ট্রেটদের সামাজিক মর্যাদা ছিল খুবই উঁচুতে। পুরসভা তাঁর সম্মানে এলাকাটির একটি রাস্তার নামকরণ করে অয়্যার স্ট্রিট। পরে তার নামানুসারে পুরো এলাকাটির নামই হয়ে দাঁড়ায় অয়্যার, যা বিকৃত হয়ে উয়ারী বা ওয়ারী দাঁড়ায়। পদস্থ সরকারি কর্মচারীদের মধ্যেই জমির বণ্টনব্যবস্থা সীমাবদ্ধ ছিল। শর্ত ছিল, বিঘাপ্রতি বছরে ছয় টাকা কর দিতে হবে এবং তিন বছরের মধ্যেই বাড়ি তৈরি করতে হবে। সেকালে পদস্থ কর্মচারী বলতে হিন্দুরাই ছিলেন প্রধান, তাই পাড়াটিও হিন্দুপ্রধান হয়ে ওঠে। আমার বেশ মনে পড়ে, বলধা গার্ডেনে প্রথম বেড়াতে গিয়ে উয়ারী এলাকায় পা রাখতেই চমকে উঠেছিলাম—এ যে সাহেবপাড়া গো! তকতকে ঝকঝকে সিধে রাস্তা, তাদের কী সব বাহারি ইংরেজি নাম—লারমিনি স্ট্রিট, র‍্যাংকিন স্ট্রিট, হেয়ার রোড, অয়্যার স্ট্রিট! রাস্তার দুই পাশে কী সুন্দর ফুটফুটে বাড়ি, ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে পড়া সব বাগান! সব দেখেশুনে মনে হলো, এ হিন্দুপাড়া না হয়েই যায় না! তখনো বাবুরা নেই-নেই করেও কিছু ঘর আছেন। অপশন নিয়ে সিংহভাগ চলে গেলেও বুড়োবুড়িরা আছেন, যাঁরা যাব-কি-যাব-না—এই ধন্ধে ভুগছেন, তাঁদের ছোট দলটি আছে, আর আছেন শ্রীনগরের ডা. মন্মথ নাথ নন্দী—গরিবের বান্ধব। বান্ধব *ঝংকার*-এরও। সব রোগীর জন্য তাঁর চিকিৎসা ফি ছিল পাঁচ টাকা এবং ওই একবারই! গরিব-গুরবোদের জন্য পুরো রেহাই। আমরা যখন গিয়ে ধরলাম *ঝংকার*-এর 'ডাক্তারের রক্ষে নেই' বিভাগটা তাঁকে পরিচালনা করতে হবে, তিনি সহাস্যে সে দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

'বাছা-"এছাকে"র কাছার কাছেতে কাছিমের কাছি আছে': বই ঢুঁড়ে, লোককে শুধিয়ে, কাছা দূরে থাক, বাছা এছাকের তত্ত্ব পেলুম না। পুরান ঢাকায় বারো বছর (১৯৪৭—১৯৫৯) কাটিয়ে এছাকের দেখা না পাওয়াটা

কোনো কাজের কথা হলো না। তবে কাছিমের কাছি কথা বলে কথা—ননসেন্স না হলে এ অদূরের ধোলাই খাল বা বুড়িগঙ্গার তীরের কোনো এলাকা না হয়েই যায় না!

'চকের' চাক্কু-চাক্কায় চিকা চকচকি চোখে চুয়া: চকের চাক্কু-র সঙ্গে সেকালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামার একটা কটু গন্ধ পাচ্ছি যেন! আর ওই যে চিকা ও চুয়ার কথা বলা হয়েছে—ওরা ইঁদুরের নামান্তর মাত্র। চকের অদূরে বকশী বাজারের কাছে চুয়া বা চুহার বাজার ছিল। ঢাকার কাঁচি উর্দুভাষীদের বোলে চুয়া 'চুহা' উচ্চারিত হতো। ঢাকা শহরের বিখ্যাত ইতিহাসকার নাজির হোসেনের *কিংবদন্তীর ঢাকা* থেকে জানতে পারি,

বকশী বাজারের কাছে চুয়ার বা চুহার বাজার ছিল...

সেকালে এখানে অনেক বাড়িতেই চলত সাদা ইঁদুরের (তার মানে গিনিপিগ) প্রতিপালন ও বেচাকেনাও। মনে হয়, এখানে ইঁদুরের বাজার বসত বলেই এলাকার নাম চুহার বাজার। এই গিনিপিগ পোষার ব্যাপারটা কলকাতায়ও বনেদি কিছু বাড়িতে দেখেছি। কেউ কেউ খরগোশও পুষতেন। তো চকচকে চুয়া কি চাখতো, এ বলাই বাহুল্য।

'সাঁচিবন্দরে' 'মন্দোদরীরা বন্দী বান্ধিয়াছে': সাঁচিবন্দরের মন্দোদরীরা এই সেদিনও ছিল। কয়েক বছর আগে কিছু ভূমিপিপাসু অন্তরালে থেকে 'সমাজসেবা'র নাম করে বারবিলাসিনীদের হটিয়ে দিয়ে নিজেরাই এখানে

কায়েম হয়ে বসে। গৃহহারা এই 'মন্দোদরী'দের কিছু গেল নবাবপুরের কান্দুপট্টিতে (গত বছর উচ্ছেদের চেষ্টা হয়েছিল—আংশিক সফল হয়েছে, এ কথা বলা যায়), কিছু গেল নারায়ণগঞ্জের টানবাজার (এদের সাম্প্রতিক দুর্ভাগ্যের কথা আমাদের সবার জানা), আর বাকিরা ছড়িয়ে পড়ল শহরের আবাসিক এলাকায়, পার্কে, গৃহবধূর ছদ্মবেশে গৃহস্থপল্লিতে, পরিত্যক্ত বাড়িতে। কিন্তু বারাঙ্গনা উচ্ছেদ হলেও নামটি সাঁচিবন্দরই রয়ে গেল, যা ঊনবিংশ শতাব্দীতে পরিচিত ছিল 'সাঁচি পান দারিবা' নামে। পান ভুবনে সাঁচি পান অভিজাত এবং এই এলাকাটি ছিল উন্নতমানের সাঁচি পান বিক্রির কেন্দ্র। সামান্য পানের জন্য একটা পুরো বন্দর—এ ভাবাই যায় না। কিন্তু সেকালে অতিথি আপ্যায়নের প্রধান উপাদানই ছিল পান। উপমহাদেশের প্রায় সর্বত্র বিয়ের প্রথম পর্ব তো আজও পান-চিনি দিয়েই শুরু হয়। আজও গ্রামে-গঞ্জে অতিথি আপ্যায়নে পানের ভূমিকা বড় কম নয়। কাজেই ঢাকা শহরবাসীর পান জোগাতে নদীর ধারে একটা আলাদা বেচাকেনার কেন্দ্র গড়ে উঠবে, তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। আর যেখানেই কেনাবেচা, সেখানেই দেহেরও কেনাবেচা। গড়ে ওঠে বারবনিতাদের পল্লি। ১৯১৯ সালের প্রবল ঝড়ের পর উন্নতমানের পান চাষ এ দেশে একেবারে কমে যায়। ফলে সাঁচিবন্দরে পানের বিক্রিবাট্টা কমতে কমতে একসময় বিলীন হয়ে যায়। বেশ পরে শ্যামবাজারে গড়ে ওঠে নতুন পানের বাজার, যা এখনো বহাল। কিন্তু সাঁচিবন্দর থেকে পানের কেনাবেচা বন্ধ হলেও দেহের ব্যবসা জিন্দাবাহার, কুমোরটুলি, কান্দুপট্টির মতোই রয়ে গেল। বরং আয়তনে ও দেহপসারিণীদের সংখ্যায় প্রধান স্থান দখল করে বসল। ১৯০১ সালের এক জরিপ থেকে দেখা যায়, ঢাকা শহরে বারবনিতার সংখ্যা ছিল দুই হাজার ১৬৪। বেসরকারি হিসেবে এদের সংখ্যা কয়েক গুণ বেশি ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। সে সময়ে ঢাকা শহরের লোকসংখ্যা ছিল ৯০ হাজার ৫৪২ জন। শহরের লোকসংখ্যার তুলনায় রূপোপজীবীর এ সংখ্যাধিক্য সত্যই উদ্বেগের কারণ ছিল। ১৮৬৪-১৮৬৫ সালের কোনো এক সংখ্যায় *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকায় মন্তব্য করা হয়েছিল, "ঢাকার রাজপথের উভয় পার্শ্বে যেসব সুরম্য অট্টালিকা ছিল তার অধিকাংশতেই বারবনিতাদের আড্ডা ছিল...। ঢাকা শহরে তৎকালে নাগরিকদের জন্য চিত্তবিনোদনের তেমন কোনো ব্যবস্থা ছিল না। তাই শহরবাসীদের অধিকাংশই বারবনিতাদের সঙ্গ লাভ করে বেশ আনন্দ ও ফুর্তি উপভোগ করত।...দেহপসারিণীদের ক্রূর ছোবলে শত শত কত না সোনার সংসার ভেঙে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে। এদের লালসার শিকার হয়ে বহু যুবক

সংসার বিরাগী হয়ে প্রিয়তম স্ত্রীকে ত্যাগ করে পঙ্কিলতার অতলে তলিয়ে যেত। সেকালে মানুষ বারবনিতাদের জন্য এতই পাগল ছিল যে বহু প্রৌঢ় ব্যক্তিও তাদের স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে ত্যাগ করতে মোটেই কুণ্ঠা বোধ করত না। তাদের খপ্পরে পড়ে কত ধনী নির্ধন হয়ে গেছে। কত সবল সুস্থ লোক হয়েছে কালব্যাধি যৌন রোগের শিকার—এসবের হিসেব কেই বা রাখত সেদিন।" ('কিংবদন্তির ঢাকা' থেকে উদ্ধৃত)।

কিন্তু মন্দোদরী কেন? তিনি তো রাবণের প্রধানা মহিষী, মাতা অপ্সরা হেমা ও পিতা ময়দানবের কন্যা, যাঁর পুত্র ইন্দ্রজিৎ এবং পঞ্চ প্রাতঃস্মরণীয়া কন্যার অন্যতমা। হয়তো ক্ষীণোদরী কিংবা সুন্দরী বিবেচনায় এনেছিলেন ত্রয়ী কবি।

'পাষণ্ড ঐ "মৈসুণ্ডি" মুণ্ড গণ্ডগোল'—অনুপ্রাসের ফাঁদে পড়ে মৈসুণ্ডি তথা মৈশণ্ডি পাষণ্ড বনে গেছে! মোগল আমলে নাম ছিল মভেশমন্ডি। কালের প্রভাবে ছোটো হতে হতে মৈশণ্ডি বা মৈসুণ্ডি। ওই কালে এখানে গরুর হাট কিংবা পায়ে হেঁটে এখানে গরু আনা হতো কসাই ও অন্যান্য ক্রেতার কাছে বিক্রির জন্য। এলাকাটা অধুনালুপ্ত দোলাই/ধোলাই খালের গতিপথের ধারে ছিল। গ্রামাঞ্চল থেকে গরু আনা-নেওয়ার জন্য এই খালটিই ব্যবহৃত হতো বলে মনে করা হয়। আমরা যখন নারিন্দা এলাকায় ছিলাম, তখন মৈশণ্ডি এলাকা থেকে ধোলাই খাল ঢিল ছোড়া দূরত্বেই ছিল। কেউ কেউ বলে থাকেন, এলাকাটির নাম মৈসুন্দি। এখানে নাকি একদা গোয়ালাদের বসবাস ছিল। নারিন্দা যেমন নারায়ণদির অপভ্রংশ, তাহলে মভেশমণ্ডির মৈসুন্দি হতেও বাধা কোথায়!

'"সুত্রাপুরের" সূত্রধরের পুত্রেরা কাৎরায়'—সূত্রাপুরে একদা যথার্থই সূত্রধরদের বাস ছিল। তারা কাঠের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করত। দেশ বিভাগের আগে এই অঞ্চলটির রাস্তার নাম পুরসভা রূপলাল দাস লেন করলেও সবার কাছে তা সূত্রাপুর নামেই খ্যাত। হয়তো অচিন্ত্য বাবুদের কালেই সূত্রধরদের কাল খুব একটা ভালো যাচ্ছিল না, যে-কারণে উত্তরাধিকারী 'পুত্রেরা কাৎরায়'। আমরা কিন্তু কাঠমিস্ত্রিদের কোনো আড্ডা সূত্রাপুরে দেখিনি।

'"লালবাগে" লাল ললনার লীলা ললিত-লতিকা লোল'—মোগল আমলে লালবাগের দুর্গ-প্রাসাদে 'লাল ললনার লীলা' নিশ্চয় চলত। কিন্তু এখন সেই রামও নেই, অযোধ্যাও নেই। শিথিল বসনা কোমলাঙ্গী সুন্দরীরা আজ ইতিহাস। কিন্তু পাঠক, যে লালবাগ দুর্গকে ঘিরে লালবাগ, সেই দুর্গের প্রকৃত নাম ছিল আওরঙ্গজেবের নামানুসারে 'কেল্লা আওরঙ্গবাদ'। তাই একবার

দুর্গের নাম পরিবর্তনের জন্য ১৯৩৯ সালে একটা চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু তাদের সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে এ কারণে যে, যুগ যুগ ধরে লোকমুখে দেশ-বিদেশে যা লালবাগ কেল্লা নামে পরিচিত হয়ে আসছে, তার নাম পরিবর্তনের কোনো আবশ্যকতা নেই। যথার্থ সিদ্ধান্ত ছিল সেদিনের পুরসভার।

'জিন্দাবাহার বৃন্দাবনেরে নিন্দিছে সন্ধ্যায়'—এ যে রাধাকৃষ্ণের লীলাভূমিকে নিয়ে ত্রয়ী কবির বটকেরা। শুধু কি তাই, এ যেমন কেদার রাজকন্যা বৃন্দার তপস্যার স্থান, তেমনি কৃষ্ণের সঙ্গে তার বিহারের স্থানও বটে। বৃন্দাবনে যদি কৃষ্ণের বিহার সম্ভব, জিন্দাবাহারে ঢাকার বাবু-সাহেবদের বিহার হতে বাধা কোথায়! সেখানে রাতভর চলে চোহেলের রই রই আর ক্ষণে ক্ষণে পাঁইজোড়ের ঝিনিক ঝিনি! হরিমতী বাইজির কণ্ঠে ঠুংরি ঠাটে আর ভৈরবী রাগে 'রসিয়া তোরি আঁখিয়ারে জিয়া লালচায়' গানের সুর জিন্দাবাহারের গলি ভেঙে ইসলামপুরের রাস্তায় এসে আছড়ে পড়ত আর ডেকো মাতাল কোনো পথচারী তাই শুনে 'হায় রসিয়া' বলে রাস্তায় গড়াগড়ি যেত!

এ পাড়াতেই থাকতেন বিখ্যাত শিল্পী পরিতোষ সেন। তার *জিন্দাবাহার* গ্রন্থে জিন্দাবাহারের সে যুগটা যেন জিন্দা হয়ে উঠেছে।

'"জিন্দাবাহার" বৃন্দাবনেরে নিন্দিছে সন্ধ্যায়'—ধুয়ো তুলে পাঠকদের মনে করিয়ে দিলাম ঢাকার নব বৃন্দাবন জিন্দাবাহারের কথা। কিন্তু আমাদের এই বৃন্দাবন বন-সুশোভন নয় মোটে। এখানে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে গাছগাছালির উপাংশুকথন নয়, পাখির কূজনও নয়, এখানে শ্রেণীবদ্ধ অসুন্দর অট্টালিকার শুধুই দীর্ঘশ্বাস আর ললনাদের গোপন ক্রন্দন। সারা ব্রিটিশ আমল জুড়ে যা ছিল, বুদ্ধদেব বসুদের *প্রগতি* ও *কল্লোল* যুগেও যার বহাল তবিয়তের কথা মানতে পারি আমরা, হঠাৎ পাকিস্তান আমলে জিন্দাপির ও তাঁর প্রিয় কুকুরের গায়েব হয়ে যাওয়ার মতোই কেমন অদ্ভুত মনে হয়। অন্তত আমার চোখে তো পড়েনি। সেকালের লোকের কাছ থেকে শুনি, প্রায় পুরো ইসলামপুর, জিন্দাবাহার ও সাঁচিবন্দর জুড়েই ছিল বারবনিতা পল্লি। দোকানপাট ও ফাঁকফোকরে 'গৃহস্থবাটী' অঙ্কিত বাড়ি ছাড়া বাদবাকি সর্বত্র 'আস গো পরান আমার ঘরে আস' প্রিয় সম্ভাষণ আর যত টানাটানি ঢলাঢলি! আমার নিজের একটা অভিজ্ঞতার কথা বলি। না, আপনারা যা ভাবছেন, তেমন রোমান্টিক কিছু নয়।

কার্টুন ছবি আঁকার বাতিক ছিল আমার। নানা পত্রপত্রিকায় ছোটদের বিভাগে তা ডাকে পাঠাতুম। কেউ ছাপত, আবার ছাপতও না। কে যেন বললে *Illustrated Weekly of Pakistan* (অধুনালুপ্ত করাচির সাপ্তাহিক)-এ আমার

কার্টুন ছেপেছে। কোনো স্টলেই (তখন তো শহরজুড়ে কুল্লে তিনটে স্টল ছিল—মেডিকেল কলেজের সামনে, এখন যে শহীদ মিনার, তার কাছে চার চাকা ঠেলাগাড়িতে একটা ক্রিসেন্ট বুক স্টল, দ্বিতীয়টি সদরঘাটের পাঁচ মাথার মোড়ে বাংলাবাজারের মুখে ব্যাপটিস্ট মিশনের পাঠ ভবনের সরদেয়াল ঘেঁষে আরেক চার চাকাওয়ালা স্টল, আর সব শেষেরটা ছিল চকবাজারে রাস্তাজুড়ে শান বাঁধানো এক গোল মঞ্চে। বলতে ভুলেছি, আর ছিল ফুলবাড়িয়া রেলস্টেশনের বিখ্যাত হুইলার বুক স্টল, যা এই উপমহাদেশের সব বড়-মাঝারি স্টেশনে দীর্ঘ রেল ভ্রমণের যাত্রীদের ক্লান্তিনাশের জন্য সেই ব্রিটিশ আমল থেকেই সেবা করে আসছিল। ১৯৪৯-এর দিকে মজলিশ বুক স্টল দেখা

...সাঁচি বন্দর জুড়েই ছিল বারবণিতা পল্লি...

দিল, কিন্তু সেসব কথা যথাস্থানে পরে হবে) সংখ্যাটি না পেয়ে পত্রিকার এজেন্টের খোঁজে ইসলামপুরের গলি-কানাগলি ঢুঁড়তে লেগেছি, আমপট্টির পাশের শ্রীহীন গলিতে দেখি ততোধিক শ্রীহীন ললনা হাজারে বিজার! ওদের বসনের আলোড়ন আর ভীষণ ভূষণ হাফপ্যান্ট পরা স্কুল-পড়োর চোখকেও সেদিন মহা ধন্দে ফেলে দিয়েছিল। দুপুরের তোলবলে গা আমার আরও ঘেমে ওঠে, যখন দেখি মেয়েরা আমার দিকে তাকিয়ে যত না কথা বলে, হাসে তার চেয়ে বেশি। আর অকারণ এ-ওর গায়ে ঢলে পড়ে। আমাকে কাঠফাটা রোদে

অমনভাবে দাঁড়াগোপাল হয়ে প্যাটপ্যাট করে তাকিয়ে থাকতে দেখে একজন এগিয়ে এসে বলে, "এইহানে কী কাম তোমার? কারে চাও?"

"আপনারা বলতে পারেন, এখানে *ইলাস্ট্রেটেড উইকলির* আপিসটা কোথায়?" হতচেতন আমার মুখ দিয়ে এটুকুই গড়াল।

আমার জবাবে হাসার কী হলো, বুঝলাম না। "পুইচকা শয়তান কী কয় রে," বলেই হাসির কর্কশ রোল। ওই বোলে আর রোলে আমি পালানোর পথ পাই নে।

এত সাঁচিবন্দরের কথা হলো। না, ইসলামপুরে তো নয়ই, জিন্দাবাহারের ফার্স্ট লেন, সেকেন্ড লেন, থার্ড লেন কি বাইলেনের গোলকধাঁধার কোথাও পৃথিবীর আদি পেশার বাসস্থান কোথাও দেখিনি, অবশ্যি ইসলামপুর-লয়াল স্ট্রিট-ওয়াইজঘাটের তেমাথার মোড়ের ওই একরত্তি দোতলা, Out of Bound নিঃসঙ্গ সদনটি যদি হিসেবে না ধরি।

কিন্তু জিন্দাবাহার কেন? দলিলে এর নাম পাই 'জিন্দাবায়োর কা গলি'। এই প্রাচীন নামটি লোকমুখে জিন্দাবাহারে কী করে পরিণত হলো, এখন সেই কথা।

আপনারা যদি কেউ জিন্দাবাহারে যান, তাহলে সেখানে একটি মাজার দেখতে পাবেন, যা স্থানীয়ভাবে 'জিন্দাপীর শাহবাবার মাজার' নামেই খ্যাত। জানা যায়, পশ্চিম থেকে আগত এক ফকির এখানে আস্তানা নিয়েছিলেন। তাঁর ছিল 'বায়োর' নামে এক প্রিয় কুকুর। সারা দিন শহর চুঁড়ে আস্তানায় ফিরে তার আলখেল্লার পকেট থেকে বের করতেন নানা খাবার। 'বায়োর' 'বায়োর' বলে ডাক দিলে যেখানেই থাকুক. যত দূরেই থাকুক, ছুটে আসত সে প্রভুর কাছে। তখন প্রভু আদর করে খাওয়াতেন সযত্নে আনা খাবারগুলো তাঁর সঙ্গী ওই কুকুরকে।

আস্তানায় যতক্ষণ থাকতেন, ভক্তকুল পরিবেষ্টিত হয়ে আধ্যাত্মিক আলোচনায় সময় কাটাতেন। একদিন হঠাৎ 'তোমাদের জ্বালাতনে আর পারছিনে' বলে উচ্চকণ্ঠে 'ইল্লাহল্লাহ' উচ্চারণ করে ভেলকি দেখিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন! বিস্ময়াবিষ্ট ভক্তকুলের হতবাক হওয়ার বাকি ছিল, কারণ, কিছুক্ষণ পর পীরের প্রিয় সেই কুকুরও প্রভুকে না দেখে একইভাবে উধাও হয়ে যায়! এই যে উপাখ্যান, এটাকে গল্প বলুন আর লোককাহিনি বলুন, সেই থেকে অর্থাৎ জীবন্ত অবস্থায় অদৃশ্য হওয়ার পর থেকে লোকমুখে জিন্দাপীর নামে খ্যাত হলেন ওই ফকির পীর আর তাঁর আস্তানার রাস্তাটির নাম হয়ে গেল জিন্দাবায়োর কা গলি। আরেকটি জনশ্রুতি বলে : একদিন চেলা পরিবেষ্টিত

অবস্থায় তাঁকে জীবন্ত কবর দেওয়ার নির্দেশ দিলে শিষ্যরা তাঁকে জীবন্তই কবর দেন এবং সেই থেকে তিনি জিন্দাপীর।

আপনারা সবাই কমবেশি বিখ্যাত শিল্পী পরিতোষ সেনের কথা শুনেছেন। তিনি এই জিন্দাবাহারেই এক 'গৃহস্থবাটী'তে একান্ন পরিবারসহ বাস করতেন। সেকালে এ ব্যাপারটা ছিল—বারাঙ্গনা পল্লিতে ভদ্রলোকের সহবাস। আমার কলেজ জীবনের বন্ধু শাজাহানের বাড়ি ছিল সাঁচিবন্দরে। ওর বাড়ি যাওয়ার সহজ পথটি ছিল ওই আমপট্টির গলি। কিন্তু আমরা যেতুম বাবুবাজার স্টিমার ঘাট রোড হয়ে। প্রখ্যাত সত্যবাদী কলকাতার সিটি কলেজের অধ্যক্ষ হেরম্ব মৈত্রের বাড়ি ছিল প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রিটের বারাঙ্গনা পল্লিতেই, যা হাড়কাটা গলি নামে বেশি পরিচিত। সেই পরিতোষ বাবু বলেন অন্য কথা। তাঁর ভাষ্য: এই বারবনিতা পাড়াতে শহরের গরিব-আমির সবাই আসত একটু আনন্দ, একটু সুখের আশায়—হয়তো কোনো রসিক উর্দু 'জিন্দা' ও ফারসি 'বাহার' শব্দজুড়ে এমন একটি রোমান্টিক নামের সৃষ্টি করেছিলেন। এখানে আরও বড় বড় সব লোকের আবাস ছিল, যেমন: শ্রীনগরের জমিদার খ্যাতনামা সাধক পরমানন্দ সরস্বতীর বাড়ি, ডা. গোলাম কাদির, যিনি শুধু বাস করতেন না, এই পল্লিতে ধর্মের সুবাতাস বইয়ে দেওয়ার জন্য কামরাঙ্গার মতো দেখতে গম্বুজবিশিষ্ট একটি মসজিদ তৈরি করেছিলেন, যা আজও 'কামরাঙ্গা মসজিদ' নামে টিকে আছে। তাঁর ডাক্তারি ফি ছিল তিন টাকা আর গরিবদের বিনে ফি—ওই ডা. নন্দীর মতো। এখানেই থাকতেন পৌরসভার কমিশনার ও সেকালের কট্টর কংগ্রেসপন্থী নেতা গোলাম কাদের চৌধুরী। তাঁকে সব সময় গান্ধী টুপি ও খদ্দরের পাজামা-পাঞ্জাবি পরিহিত অবস্থায় দেখা যেত। ব্রিটিশ আমলের ঢাকাতে চওড়া রাস্তায় বা চৌরাস্তার মোড়ে বেশ কিছু বটগাছ দেখা যেত। পথচারীদেব বিশ্রামের জন্য পৌরসভা থেকে বটগাছের গোড়া বাঁধিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বটগাছকে দেবতা-জ্ঞানে মূর্তি বসিয়ে পুজো করায় মুসলমান নাগরিকদের পক্ষে ওই শান বাঁধানো বটগাছের তলায় বসার ব্যাঘাত ঘটে। ফলে এ ব্যাপারে স্থানীয় হিন্দু নেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। কিন্তু তাঁরা তাদের অভিযোগে কর্ণপাত করেননি। অগত্যা গোলাম কাদিরের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া গতি রইল না তাদের। কিন্তু হিন্দুমহলে প্রভাবশালী হওয়া সত্ত্বেও যখন মূর্তি সরিয়ে ফেলার সনির্বন্ধ অনুরোধ ব্যর্থ হলো, তখন গোলাম কাদির সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জন্য প্রসিদ্ধ ঢাকার বুকে এক অসম সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন। পৌরসভার কমিশনার হিসেবে কর্তব্য-জ্ঞানে এবং কংগ্রেস পার্টির ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শকে সামনে রেখে

নবাবগঞ্জের হাতিরঘাটসংলগ্ন ও অন্যান্য এলাকার সব মূর্তি নিজে উপস্থিত থেকে সরিয়ে ফেলে সব ধর্মের লোকদের বিশ্রামের জন্য বটগাছগুলোকে উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। অন্যান্য স্থানের বটগাছের কথা বলতে পারব না তারা আছে কি নেই, তবে যেখানে নবাবগঞ্জ ঢালু হয়ে বুড়িগঙ্গায় নেমে গেছে, ঠিক সেখানে ছায়াদান করে যে বটগাছটা মাথা তুলে আজও দাঁড়িয়ে আছে, তা দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। তবে আজকাল ওই বটগাছের গোড়ার চারধারে ঝুপড়ি ঘর ও বাঁশের গুমতি ঘরের আড়ালে শান বাঁধানো গোল মঞ্চটা আর চোখে পড়ে না।

এই জিন্দাবাহারে একদা ছিলেন কলকাতার মোহামেডান স্পোর্টিংয়ের বিখ্যাত ক্যাপ্টেন শাহজাহান। এখানেই ছিল পরিতোষ সেনের দর্জিরা। নবাববাড়ির অনেকেই ফোর্ড গাড়ি হাঁকিয়ে আসতেন কিংবদন্তিতুল্য হাফিজ মিয়া দর্জির কাছে। পায়রা পোষা ও ওড়ানোর শখ আর দক্ষতাও ছিল তাঁর। পায়রা ওড়ানো প্রতিযোগিতায় হাফিজ মিয়ার দক্ষ পায়রাগুলো অন্যের পোষা পায়রাগুলোকে ধোঁকা দিয়ে যখন তাঁর ছাদে এনে বসাত, প্রাচীনেরা বলেন, সে এক ভারি দেখার বিষয় ছিল। এ ছাড়া ছিলেন খ্যাতনামা বৈদ্যরাজ শ্রী কালিকুমার সেন, পুত্র প্রসন্নকুমার সেন এবং তস্যপুত্র পরিতোষ সেন। তাঁদের বিচিত্র কথা জানতে হলে আপনাদের পড়তেই হবে নাজির হোসেনের *কিংবদন্তির ঢাকা* আর পরিতোষ সেনের *জিন্দাবাহার* বই দুটি।

হরিমতী বাইজির কথা বলেছিলাম। এমন কত হরিমতী-হরিদাসীর দাস হয়েছে কত জমিদার ও জমিদার নন্দন, বিশ্বখ্যাত সাঁতারু, আধুনিক বাংলা সাহিত্যে অবদান রয়েছে এমন কত লেখক-কবি, যাঁদের কথা পরিতোষ বাবুর বইয়েতে পাবেন। অথচ নাজির হোসেনের ভাষায়: "এমনভাবে মন-মেজাজ ও বাহারে পরিপূর্ণ করে রাখত যারা তারা আজ জিন্দাবাহারে নেই।...এতদসত্ত্বেও এখানে সেকালের অনেক পুরোনো বাড়ি এখনো আছে। গভীর রাতে কান পেতে থাকলে এখানকার অনেক কুঠুরি থেকেই শোনা যাবে নূপুরের রিনিঝিনি ঝংকার, আনন্দ আর বিরহের গানের রেশ। অনেক বাড়ির দেয়াল ও কড়িকাঠগুলো এখনো সাক্ষী হয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে—কত খুন-জখম আর অসহায় তরুণী-যুবতীদের ধরে এনে এসব ঘরে বাধ্য করা হয়েছে তাদের যৌবন অসংখ্য জনের মাঝে বিলিয়ে দেবার জন্য। এখনো অনেক বয়স্ক ঢাকাবাসী এ গলিপথের দিকে চেয়ে তাদের যৌবনকালের অনেক স্মৃতি মন্থন করেন আর মুচকি হাসেন নিজের মনেই। আরো মন্থন করেন সেই দৃশ্যটির কথা, যখন এ পাড়ার বারবনিতারা প্রতিদিন সকালে বুড়িগঙ্গা থেকে

স্নান করে ভেজা কাপড়ে ফিরত। ভেজা কাপড় লেপ্টে থাকার ফলে মনে হতো শরীরের প্রতিটি অঙ্গ যেন একটি ফুলের বিভিন্ন পাপড়ির মতো আলাদা সত্তা নিয়ে সরল বৃন্তটির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। এক একটি পাপড়িকে তখন এক একটি ফুল মনে হতো। কাঁখে থাকত বুড়িগঙ্গার পানিতে ভরা পেতলের কলসি। কলসি আর নিতম্ব দুই-ই মিলেমিশে একাকার, দুই-ই টলমল। এমন সুন্দর, সাবলীল ও বেপরোয়া চলার ভঙ্গি দেখলে মনে হতো যেন নিঃসঙ্গ সংগীতের সঙ্গে তাল রেখে পা ফেলে চলেছে। আর এভাবে ছন্দময় গতিতে পা ফেলার ফলে দুটি সোনার বাটির মতো তাদের বক্ষস্থলগুলো যেন নেচে নেচে উঠত। এই বুঝি করতালের মতো বেজে উঠবে।..."

নাজির সাহেব রসিক লোক ছিলেন। তিনি সিক্তবসনা নারীর একই অঙ্গে অনেক রূপের বর্ণনা দিয়েছেন, শিল্পী হেমেন্দ্রকুমার মজুমদার যেমন দিয়েছেন তাঁর বিখ্যাত সিক্তবসনা ছবিগুলোতে। একজন লেখায়, আরেকজন রেখায়।

...বারবণিতারা প্রতিদিন সকালে...

এই দৃশ্য আমার চোখও এড়ায়নি। তবে তা জিন্দাবাহারের নয় মোটে। আমার বেশ মনে পড়ে দলে দলে এসব মন্দোদরী সাঁচিবন্দর ও কুমোরটুলি থেকে যেমন, তেমনি নবাবপুরের কান্দুপট্টি থেকেও বুড়িগঙ্গায় নাইতে আসত। আমাদের জনসন রোডের চারুকলা ভবনের পাশ দিয়েই এসব গুরুনিতম্বিনী হট্টবিলাসিনীর গমনাগমন করতে দেখেছি। সারা রাত রঙ্গপ্রিয়দের সেবায় কাটিয়ে ভোর থেকে দুপুর বারোটা অবধি এরা পড়ে পড়ে ঘুমোতো। তারপর বিকেল তিনটে অবধি চলত এদের গঙ্গাস্নান। সব মলিনতা গঙ্গায় বিসর্জন দিয়ে সিক্তবসনা সুন্দরীরা যখন গাগরি কাঁখে নিজ নিজ সদনে ফিরত, তখন সেই দৃশ্যকে নাজির সাহেবের বর্ণনার সঙ্গে মিলিয়ে দেখি, এক বর্ণও মিথ্যে বলেননি তিনি।

'"বক্সীবাজারে" বাক্সে নক্সা মকশো একশোবার'—বকশি তথা বক্সীবাজারের কাছেই তো ছিল আমাদের ডেরা। ও পাড়ায় দুই ঘর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের বাড়ি যাতায়াতও ছিল, কই কস্মিনকালেও বাক্স তৈরির কোনো পাড়া তো চোখে পড়েনি। ওটা তো মোগলটুলির একচেটে। বুদ্ধদেব বাবুদের আমলে যদি থেকে থাকে, বলতে পারব না, তবে মোগল শাসনামলে বেতন বণ্টনকারী রাজকর্মচারীদের পদবি ছিল বকশি। এই বকশিদের সরকারি বাসস্থান ছিল এটা এবং এখানে তারা একটি বাজার প্রতিষ্ঠা করায় লোকমুখে জায়গাটার নাম দাঁড়িয়ে যায় বক্সীবাজার। কাজেই বাক্সে একশোবার কেন, হাজার বার নক্সা মকশো করলেও অনুপ্রাসের গন্ধই বেরোবে তা থেকে।

'রমা রমণীরা "রমনায়" রমে রম্যা রম্ভাসম'—বুদ্ধদেব বাবুদের 'নিউ টাউন' রমনা সম্পর্কে এই রম্য পঙ্‌ক্তিটি সেকালের জন্য খাটে কি? না তো। রমনা মানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়—বাংলা কেন সব ভারতেরই একমাত্র উদ্যান নগর—কার্জনকল্পিত পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের রাজধানীতে যা তৈরি হয়েছিল। এবার বুদ্ধদেব বাবু তাঁর *আমার যৌবন*-এ এই রমনা তথা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে কী লেখেন শুনুন : 'ভিতরে-বাইরে জমকালো এক ব্যাপার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। নিখিলবাংলাব একমাত্র উদ্যান-নগরে পনেরো-কুড়িটি অট্টালিকা নিয়ে ছড়িয়ে আছে তার কলেজ-বাড়ি, ল্যাবরেটরি, ছাত্রাবাস; আছে ব্যায়ামাগার ও ক্রীড়াঙ্গন ও জলক্রীড়ার জন্য পুষ্করিণী—যেখানে সেখানে সবুজ মাঠ বিস্তীর্ণ। ইংলন্ডদেশীয় পল্লী-নিবাসের মতো ঢালু ছাদের এক একটি দোতলা বাড়ি—নয়নহরণ, বাগানসম্পন্ন, সেখানে কর্মস্থলের অতি সন্নিকটে বাস করেন আমাদের প্রধান অধ্যাপকেরা; অন্যদের জন্যেও নীলক্ষেতে ব্যবস্থা অতি সুন্দর। স্থাপত্যে কোনো একঘেয়েমি নেই, সরণি ও উদ্যান রচনায় নয়াদিল্লির জ্যামিতিক দুঃস্বপ্ন স্থান পায়নি। বিজ্ঞান ভবনগুলো আরক্তিম ও তুর্কি শৈলীতে জাফরি খচিত, মিনার শোভন, অন্যান্য বিভাগ স্থান পেয়েছে একটি সরল ছাদের বহুপক্ষযুক্ত দীর্ঘাকার শাদা দোতলার একতলায়—সরকারি সেক্রেটারিয়েট হবার জন্য তৈরি হয়েছিলো বাড়িটি। সর্বত্র প্রচুর স্থান, ঘেঁষাঘেঁষি ঠেলাঠেলির কোনো কথাই ওঠে না।'

'আমরা জন্মেছিলুম স্ত্রীলোকহীন জগতে'—এই কথাটা রবীন্দ্রনাথ যে অর্থে বলেছিলেন, তাঁর পৌত্রের বয়সী আমাদের জীবনেও সে-অর্থে প্রযোজ্য ছিল।...

"পাঁচ মিনিট পরে মেয়েদের হস্টেল—রমনার সব সুন্দরের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর সেই তথাকথিত 'চামাদিয়া হাউস' (আসল নাম The Chummery)

[পাক আমলে যা 'চামেলী হাউস' নামেও খ্যাত ছিলো]। সেখান থেকে বেরিয়ে এলেন পাঁচটি অথবা সাতটি সহপাঠিনী, আমি চলার গতি শ্লথ করে দিলাম যাতে অন্তত পিছন থেকে তাঁদের নিরীক্ষণ করা যায়। সৈনিক অথবা খ্রিস্টান সন্ন্যাসিনীদের মতো শ্রেণীবদ্ধ হয়ে হাঁটছেন তাঁরা, সমতালে পা ফেলে ফেলে—মাথা আঁচলে ঢাকা, চওড়া-পাড়ের শাদা শাড়ি পরনে, যৌবনসুলভ চাঞ্চল্যের কোনো লক্ষণ নেই, আর পা ফেলা এমন ঢিমে লয়ের যে একটু পরেই তাঁদের অতিক্রম না-করে আমার উপায় থাকে না।"

শুনলেন তো। শ্যামলী রমনায় শ্যামল রং রমণীরা ছিলেন বটে, তবে ওই যে, বিভিন্ন পুরাণে অপ্সরা রম্ভার সৌন্দর্য ও সংগীত পারদর্শিতার যে বর্ণনা পাই, এই নীরবগমনা অচটুলা শ্লথচরণাদের মধ্যে তা পেলাম কই! বোধকরি বৈকালী ভ্রমণরতা উজ্জ্বল শাড়ি পরিহিতা কাঁচপোকার টিপ লাঞ্ছিতা অধ্যাপক তনয়া বা স্বল্পবয়স্ক অধ্যাপকদের তরুণী ভার্যাদের রমনার শান্ত নির্জন পথে দেখেই রম্ভার উপমাটা মনে এসে থাকবে তাঁদের।

'"একরামপুরে" বিক্রি মাকড়ি লাকড়ি শুক্রবার'—এ ভারি খাঁটি কথা। লক্ষ্মীবাজারের শেষ মাথায়, ওই যেখানে রাস্তাটা হৃষিকেশ দাস রোডে পড়েছে, ওই এলাকাটার নামই একরামপুর। এ পাড়াতেই একসময় বাবা-মায়ের সঙ্গে থাকতেন মুন্সিগঞ্জের সমরেশ বাবু, ঔপন্যাসিক সমরেশ বসু। তো ফি শুক্কুরবারে লাকড়ি বিক্রি হতো বইকি! অদূরে ধোলাই খালে লাকড়িবোঝাই পশারীদের নৌকোর ভিড়। কোনো হাঁকাহাঁকি নয়, শান্ত পল্লির নীরবতা না ভেঙেই বিক্রিবাট্টা হতো, এ তো দেখেছি।

'গন্ধে অন্ধ "নারিন্দ্যা" যেন বিন্দু ইন্দুপম।'—লাখ কথার এক কথা। পাঠক, যে গন্ধের কথা বলা হয়েছে, সে তো ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির মলভাণ্ড বাহিত গো-শকটের সৌরভ! হ্যাঁ, আমাদের কালে এ ব্যাপারটা ছিল—বাড়ি বাড়ি থেকে বয়ে আনা ওই পদার্থের গন্ধে পুরো নারিন্দা অন্ধ হতো বইকি! আর যে রাস্তা ধরে গজেন্দ্রগমনে ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ তুলে গাড়িগুলো চলাফেরা করত, চুইয়ে পড়া পুরীশলাঞ্ছিত সেই সব রাস্তার পথচারীদের লাঞ্ছনার কথা একবার ভাবুন তো!

এই নারিন্দাতেই ছিলুম আমরা ১৯৫০ থেকে ১৯৫৯—দীর্ঘ নয় বছর।

আমরা জানি বাহান্ন বাজার তিপ্পান্ন গলির শহর ঢাকা 'মসজিদের শহর' নামেও কমবেশি মশ্‌হুর। এর বিভিন্ন পল্লির আনাচেকানাচে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য মসজিদ। এর কোনো কোনো মসজিদের সঙ্গে জড়িয়ে আছে করুণ কাহিনি। এমনই এক মসজিদ নারিন্দার বিনট (মতান্তরে বিনাত) বিবির মসজিদ।

ছোটখাটো কিন্তু বেশ মজবুত এই মসজিদের শিল্পচাতুর্য তেমন একটা চোখে পড়েনি। এক বিঘা পরিমাণ জায়গার বেশির ভাগজুড়ে ছিল বাগান। ডানদিকে মসজিদ, বাঁ-দিকে জীর্ণ একটি মাজার। আজও মনে পড়ে, ঈদের দুই পরবে যখন নামাজ পড়তে যেতাম, তখন ওইটুকুন একরত্তি মসজিদে 'তিল ঠাঁই আর নাহিরে'—উপাসনাকারীদের দলটি টাপেটোপে উপচে পড়ত বাগানে, বাগান ছাপিয়ে রাজপথে। বরাত ফেরাবার জন্য শবেবরাতের রাতে রজনী পোহাত না যেন!

কিন্তু এই রহস্যময়ী বিনট বিবিটি কে?

এটুকু জানা যায়, বিবি ছিলেন জনৈক তুর্কি ব্যবসায়ী হার হামাটের কন্যা। আদরের দুলালিকে নিয়ে ব্যবসা উপলক্ষে কাঠের তৈরি এক জাহাজ করে পাড়ি জমান ঢাকার উদ্দেশে। স্ত্রীকে নিয়ে নয় কেন, নাকি বিপত্নীক ছিলেন তিনি, এসব প্রশ্নে ইতিহাস নীরব। জাহাজ নোঙর ফেলে ঢাকার ঘাটে। তখন নারিন্দার ধোলাই খালের পাড় ধরে ছিল তুর্কি, আফগান, পাঠান ও তুরানি বণিক ও ভাগ্যান্বেষণকারীদের ডেরা। স্বভাবত এখানেই আস্তানা গাড়েন হার হামাট। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই এক শক্ত ব্যামোয় মারা যায় শিশুকন্যা বিনট বিবি। শোকে অধীর পিতা শুধু গোর দিয়েই ক্ষান্ত হলেন না, মাজারের পাশে প্রাণপ্রিয় কন্যার স্মৃতি রক্ষার জন্য নির্মাণ করলেন এক মসজিদ—সকালে বিকেলে রাতে আজানের পবিত্র ধ্বনি শুনতে পাবে তার মেয়ে, নামাজিদের পদচারণে মুখর হবে মাজারের আঙিনা—এটুকুই ছিল তাঁর সান্ত্বনা। কালক্রমে লোকমুখে মসজিদের নাম দাঁড়ায় বিনট বিবির মসজিদ। অথচ যাকে উপলক্ষ করে এই মসজিদ, তার মাজারটি কিন্তু অবহেলিত। এর রক্ষণাবেক্ষণ কি জরুরি নয়, মসজিদটির মতো? তবে এখানেও কথা ওঠে। সম্প্রসারণ ও সংস্কার করতে গিয়ে ঐতিহ্যবাহী এই মসজিদটির মূল ভবনের আদল আজ আর খুঁজে পাওয়া যাবে না—সাঁড়াশি আক্রমণে মূল ভবনটি সম্প্রসারিত প্রথম তলার গোলকধাঁধায় হারিয়ে গেছে! এটার বাইরের কি অন্দরের চেহারা দেখে আজ
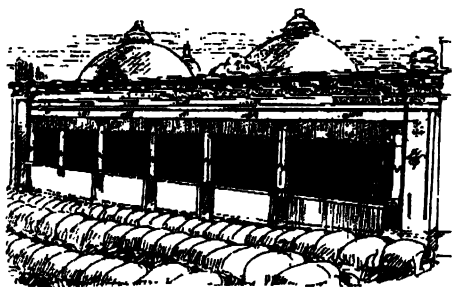
...বাগান ছাপিয়ে রাজপথে

আর বলা যাবে না ঢাকার প্রাচীন স্মৃতিবহনকারী পুরোনো ইমারতগুলোর মধ্যে বিনট বিবির মসজিদই সবচেয়ে প্রাচীন। খোদিত লিপি পাঠে জানা যায়, এই মসজিদটি বাংলার পাঠান সুলতান নাসিরুদ্দিন মহম্মদ (মতান্তরে মাহমুদ) শাহ্-এর আমলে ১৪৫৬ (মতান্তরে ১৪৫৭) খ্রিষ্টাব্দে নির্মিত হয়। তার মানে ইসলাম খাঁর ঢাকা আগমনের দেড় শ বছর আগে থেকেই যে এখানে মুসলমানদের আগমন ঘটেছিল, তা বেশ বোঝা যায়।

আমাদের একটা জিনিস দেখতে হবে, সেটা হলো, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ করতে গিয়ে যেন মূল ভবনের বিকৃতি না ঘটে, যেমনটি ঘটেছে বিবির ভাগ্যে। বিনট বিবির মসজিদ এবং সংলগ্ন মাজারটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব এবং পর্যটকদের আকর্ষণ করার ক্ষমতা আজ লুপ্ত। পুরাতাত্ত্বিক বিভাগ যদি আগ্রহী হয়, তাহলে এই মসজিদটি তার পুরোনো গৌরব ফিরে পেতে পারে বলেই আমরা ধারণা করি। আর ওই যে কচি মেয়েটি, যে বিদেশবিভুঁইয়ে প্রাণ দিল, তার কবরটাকেও দেখতে হবে তো! নাকি 'বিবি' নামের প্রতি অবহেলা? এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক সৈয়দ আওলাদ হোসেন খানবাহাদুরের বালসুলভ মন্তব্য উল্লেখযোগ্য: "ইনি [অর্থাৎ বিনট বিবি] যে উচ্চকুল সম্ভূতা ছিলেন না, তাহা উঁহার নামেই সূচিত হইতেছে।" (*ঢাকার ইতিহাস*, যতীন্দ্রমোহন রায়)। আমাদের দেশে সাধারণত নিম্নকুলের রমণীদেব নামের সঙ্গে 'বিবি' যুক্ত হতে দেখি। এই যেমন—সখিনা বিবি, কমলা বিবি, রহিমন বিবি...। এই বিবেচনাতেই আওলাদ সাহেব উল্লিখিত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। কিন্তু বিদেশে বিবি সম্ভ্রান্ত মুসলমান মহিলাদের পদবি। স্বয়ং হজরত মোহাম্মদ (সা.)-এর কন্যার নাম ছিল বিবি ফাতেমা। প্রতিবেশী দেশ ভারতের অঙ্গরাজ্য অন্ধ্রপ্রদেশের বর্তমান রাজ্যপালের নামও বিবি ফাতেমা। আগে আমাদের দেশেও বিবি ছিল মুসলমান মহিলাদের সাধারণ পদবি, আজকাল 'বেগম' সেই জায়গাটি দখল করে নিয়েছে।

'চর্ম্মে ঘর্ম্ম "আর্ম্মেনিটোলা" কর্ম্মে বর্ম্মাদেশ'—মাথার ঘাম পায়ে ফেলেও অনুপ্রাসের তরঙ্গ ভেঙে আরমানিটোলায় নিদেন চামড়ার তরে ঘর্ম ঝরাবার কাউকে খুঁজে পেলাম না—এ কাজটা মাইলখানেক দূরে পোস্তায় হয়ে থাকে, যা আজও বহাল। এখানে রয়েছে দেশের বৃহত্তম চামড়ার ব্যবসাকেন্দ্র। দেশবিদেশের বহু ব্যবসায়ীই এই পোস্তা নামের সঙ্গে পরিচিত। নবাবি পাওয়ার আগে ঢাকার নবাববাড়ির লোকেরা এই চামড়ার ব্যবসাই করতেন। সুদূর কাশ্মীর থেকে ঢাকা এসেছিলেন এই ব্যবসা উপলক্ষেই। বিভিন্ন জনহিতকর কাজে অর্থ ব্যয় ও ব্রিটিশ প্রভুদের পদলেহন করে কৃপালাভে সমর্থ

হয়ে নবাব উপাধিটা তোফা হিসেবে জুটেছিল খাজা পরিবারদের। সেই সব বিচিত্র কথা যথাস্থানে বলা যাবে।

কথায় বলে, যার নেই কোনো কান্ডারি, ভাগ্যে জোটে তার মাস্টারি। আর যার ভাগ্যে তাও নেই, সে যায় বর্মাদেশ (অর্থাৎ ব্রহ্মদেশ)। কিন্তু তখন বর্মা (ইংরেজিতে বার্মা) তো আর ভিন দেশ নয়, ব্রিটিশ ভারতেরই অঙ্গরাজ্য। কলকাতা থেকে টিকিট কেটে জাহাজে উঠে পড়লেই হলো—পৌঁছে দেবে রেঙ্গুন (এখন তো ইয়াঙ্গুন। আর দেশের নামটাও পাল্টে হয়ে গেছে মিয়ানমার)। ১৯৩৬ পর্যন্ত অবিচ্ছিন্নই ছিল, ১৯৩৭-এ বন্ধন ছিন্ন হয়ে অভ্যন্তরিক ব্যাপারে অনেকটা ডোমিনিয়ন মর্যাদা পেলেও ভাগ্যান্বেষী ভারতীয়দের বর্মা যাওয়া বন্ধ হয়নি। আমাদের ছেলেবেলায় এ ব্যাপারটা দেখেছি—স্বজনদের মধ্যে কেউ কেউ ভাগ্য ফিরিয়েছেন, আবার দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জাপানিরা যখন দখল করে নিল দেশটা, তখন সর্বস্ব খুইয়ে পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে শ্বাপদসংকুল গভীর অরণ্য ভেদ করে শুধু প্রাণটা হাতে করে ফিরেছেন, এমন অভিজ্ঞতাও হয়েছে কারও কারও। আর. পি. সাহা, অর্থাৎ দানবীর রণদাপ্রসাদ সাহার যা কিছু বিত্তবৈভব, সবই তো ওই বর্মা দেশেরই কল্যাণে। ক্রোড়পতি সাহা বাবুকেও সেদিন পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়েই স্বদেশে ফিরতে হয়েছিল। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বর্মার জীবনের কথা তো আমরা সবাই জানি। তিনি যে লেখায় নয়, রেখায়ও পারদর্শী ছিলেন, তা আমরা জানতে পারি তাঁর স্মৃতিকথায়। রেঙ্গুনে ল্যান্সডাউন স্ট্রিটের যে কাঠের বাড়িতে থাকতেন, সেখানে তাঁর শিল্পীসত্তার জন্ম হয়। একের পর এক এঁকে চলেন তেলরঙে ছবির পর ছবি। কার অনুপ্রেরণায় কার হাতে তাঁর হাতেখড়ি, জানা যায় না। তবে হৃদরোগের লক্ষণ দেখা দেওয়ার কারণে পড়াশোনা কমিয়ে তিনি যে ছবি আঁকার দিকে ঝোঁকেন, এ কথা জানা যায়। প্রথম ছবির নামকরণ করেন 'রাবণ-মন্দোদরী'। লক্ষণীয় রাম-সীতা তাঁর অনুপ্রেরণার বিষয় নয়। প্রতিহিংসাবশত রাম রাবণকে হত্যা করেই ক্ষান্ত হননি; পরন্তু পূত চরিত্রা ও ধর্মশীলা এই মহিলাকে বিশ্বাসঘাতক দেবর বিভীষণের সঙ্গে পরিণয়ে বাধ্য করেন। এখানে চিন্তা-মননের ক্ষেত্রে মধুসূদনকেই মনে পড়ে। কিন্তু ১৯১২ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি কাঠের বাড়িটা পুড়ে যায়। অন্যান্য যাবতীয় জিনিসপত্রের সঙ্গে *চরিত্রহীন*-এর পাণ্ডুলিপি এবং আঁকা ছবিগুলোও পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এরপর লেখালেখি বজায় থাকলেও ছবি আঁকায় আর হাত দেননি। এভাবে আমরা শিল্পী শরৎচন্দ্রকে স্বচক্ষে দেখার সৌভাগ্য থেকে

বঞ্চিত হয়েছি। ১৯০৩ থেকে ১৯১৬—এই তেরো বছরের রেঙ্গুন প্রবাসকালে তাঁর কাছে বাংলার পাঠককুল পায় *বড়দিদি*, *চরিত্রহীন* (১৯১২-তে *যমুনার* সম্পাদক কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে নতুন করে লেখা), *কাশীনাথ* ও এমনই আরও একগুচ্ছ গল্প ও উপন্যাস। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন, তাঁর লেখা প্রথম *চরিত্রহীন* কোন মাপের চরিত্রহীন ছিল? ঘটনাজাল তো আর এক থাকতে পারে না। তিনি তো মাপজোক করে লিখতেন না। প্রথমে লিখেছিলেন আবেগ নিয়ে সৃষ্টি সুখের উল্লাসে—নতুন *চরিত্রহীন* ছিল দায়বদ্ধতা, *যমুনা* সম্পাদকের তাগাদায় যার জন্ম।

ধান ভানতে শিবের গীত গাইলুম বোধ হয়। গাইয়ে ছাড়লেন ওই অচিন্ত্য বাবুরা। কিন্তু—

'টাকে-টিকটিক-টিকি "টিকাটুলি" টিকার টিকিট কাটে—অর্থমূল্যে অর্থহীন মনে হতে পারে; কিন্তু অনুপ্রাসের বিচারে সর্বোৎকৃষ্ট পঙ্ক্তি। কিন্তু আমাদের আমলটাই তো শেষ কথা নয়, বুদ্ধদেব বাবুদের কালে হয়তো বা ধিকিধিকি টিকে ছিল টিকিয়া তথা টিকার বাজার। নাজির সাহেব শোনান, "এ অঞ্চলে এক সময় কুটিরশিল্প হিশেবে টিকিয়া তৈরি হত। বহু পরিবার হুকোর ছিলিম, তথা কল্কেয় ব্যবহারের জন্য কাঠকয়লার গুঁড়ো দিয়ে টিকা তৈরি করতো। টিকাটুলির টিকা সেকালে ঢাকার একটি বিশিষ্ট শিল্প হিশেবে বিবেচিত হত। তখনকার টিকিয়া ছিল এত হাল্কা আর নিখুঁত যে একটি মাত্র দেয়াশলাইয়ের কাঠি দিয়ে বেশ কয়েকখানা টিকিয়া ধরানো যেত। এসব শিল্পীকে লোকে উপহাস ছলে 'মহারানিকা বেটা বলে' সম্বোধন করত বলে জানা যায়। এই মহারানি আর কেউ নন, তখনকার ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মহারানি ভিক্টোরিয়া।"

এবার তো তাঁতীবাজারের পালা—

'"তাঁতিবাজারের" তোৎলা তোতার তিতা-তরে পিত্যেশ'—ঢাকার ঐতিহ্যবাহী তাঁতি সম্প্রদায়, যারা বিশ্বের দরবারে বস্ত্রশিল্পে ঢাকার নামকে অক্ষয় করে রেখে গেছে, তাদের একটা পাড়া ছিল এবং এখনো আছে শাঁখারীবাজারের গোলকধাঁধার একপাশে। তবে তাঁতির দেখা আর মেলে না। বুদ্ধদেব বাবুদের কালে এ পাড়ার বাড়ির কোনো তোতলা তোতা তিতার জন্য হা-পিত্যেশ করত, সে সমাচার আমাদের জানা নেই।

হারাধনের শেষ পঙ্ক্তি: '"গ্যাণ্ডারিয়া"র ভণ্ড গুণ্ডা চণ্ড চণ্ডু চাটে"—এ নিতান্তই গা-জোয়ারি অপবাদ। আগে এ জায়গাটা ছিল ঝাড়জঙ্গলে পরিপূর্ণ। আশপাশে খুব আখের চাষ হতো। স্থানীয়ভাবে আখ গ্যাণ্ডারি নামেই পরিচিত

ছিল। যে কারণে জায়গাটার নামই দাঁড়িয়ে যায় গ্যাণ্ডারিয়া। প্রথমদিকের বাসিন্দা ছিলেন বিখ্যাত শিক্ষাবিদ রায়সাহেব দীননাথ সেন। গ্যাণ্ডারিয়ারকে আবাসিক এলাকায় দাঁড় করাবার জন্যে এই রায়সাহেব ও ঢাকা পৌরসভার প্রথম নির্বাচিত চেয়ারম্যান আনন্দচন্দ্র রায়ের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। সেদিন পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন আরেক সমাজসেবী—রজনীকুমার চৌধুরী। এঁর সহায়তায় ১৮৯৫ সালের মধ্যে ঝাড়জঙ্গল সব সাফ হয়ে গিয়েছিল। ফলে একজন-দুজন করে গণ্যমান্য ব্যক্তি ১৮৯৬ সালের দিকে বসতি স্থাপনে এগিয়ে এসেছিলেন। পরে সাফসুতরো গ্যাণ্ডারিয়া আরো অনেককে আকৃষ্ট করবে, এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। এ যেন ফুলবাবু উয়ারির কাননঘেরা দোসর। চারদিকে গাছপালা শোভিত শান্ত নিরুপদ্রব পরিবেশে সরদেয়াল ঘেরা মস্ত এলাকা জুড়ে এক একটা চোখ জুড়ানো বাড়ি—এতো আমি নিজের চোখেই দেখেছি।

ঝংকার-এর দিনমান

১৯৪৮-এর শেষ পাদে আমাদের হাতে লেখা কাগজটা ছেপে বের করা যায় কি না, এমন একটা তোড়জোড় যখন চলছে, তখন কে বললে, বিজ্ঞাপন না হলে কাগজ বের করবে কী করে? যোগেশ বাবুর কাছে যাও, চাই কি একটা বিজ্ঞাপন জুটে যেতে পারে। আমরা তত দিনে আমাদের কলকাতার প্রতিবেশী, শিশুসাহিত্যিক খান মুহম্মদ মঈনুদ্দীনের বাংলাবাজারের 'আলহামরা লাইব্রেরী'র কোয়ার্টার পেজ বিজ্ঞাপন জোগাড় করে ফেলেছি পাঁচ টাকার বিনিময়ে, বাবুবাজারে ধোলাই খালের পুলের কাছে 'ওসমানিয়া বুক ডিপো'র শেষ প্রচ্ছদের একটি হাফ পেজ বিজ্ঞাপন ২০ টাকার চুক্তিতে, আর পেয়েছিলাম পাটুয়াটুলির চেটেনেটে 'হারুলালের চা'-এর টেলপিস, ওই পাঁচ টাকার কড়ারে। আর আমাদের এক বোন ফনু আপা যখন ছাপাখানার রসদ জোগাতে গিয়ে দিশেহারা, তখন আমাদের হাতে পাঁচটি টাকা দিয়ে বললেন, আমার এই নূর মেডিক্যাল হলের বিজ্ঞাপনটা ছেপে দিস। বিক্রমপুরের ইছাপুরে আমাদের ডাক্তার দুলাভাইয়ের ছিল চেম্বারসহ ছাপোষা ওষুধের দোকান। আমাদের কাগজে বিজ্ঞাপন দিলে তাঁর ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে, একথা ভেবে নিশ্চয় আমাদের আপা বিজ্ঞাপন দেননি।

এই তো ৩৫ টাকার মূলধন। কাজেই যোগেশ বাবুর কাছে যেতেই হয় যে! যোগেশ বাবু মানে অধ্যক্ষ যোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম.এ, এফ-সি-এস (লন্ডন), এম-সি-এস (আমেরিকা), আবুর্বেদশাস্ত্রী, ভাগলপুর কলেজের রসায়নশাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক—সাধনা ঔষধালয়ের কর্ণধার। আমাদের তখন ডেরা চাঁদনীঘাট। তখনো ঢাকার টাউন সার্ভিস বলতে যা বোঝায়, তা ছিল না। সাকুল্যে দুটো বাস চলাচল করত। একটা সদরঘাটের ব্যাপ্টিস্ট মিশনের রিজেন্ট পার্ক হলের সামনে থেকে ছাড়ত চকবাজারের উদ্দেশে। ছাড়ত যাত্রীতে টাপেটোপে উপচে পড়লেই। আরেকটা ছাড়ত চকবাজারের আলহামরা রেস্তোরাঁর সম্মুখ থেকে। লক্ষ্য ওই সদরঘাট। ওখানে নেমে মাইল দুয়েক হাঁটা পথ ভেঙে (রিকশার দুআনা ভাড়া জোটাবাব মুরোদ কই তখন) দীননাথ সেন রোডের (এ আমাদের সেই রায়সাহেব বটে, তাঁর সমাজসেবার পুরস্কার) সাধনা ঔষধালয়ের ভেষজ সৌরভমণ্ডিত সদনে যখন পৌঁছালাম, তখন কাটফাটা দুপুর বারোটা। মস্ত পেল্লাই গেট। ফুটবল মাঠের মতো উঠোন। উঠোনের চারপাশে সারিবদ্ধ ঘরে ওষুধ বানানোর পাঁয়তারা চলছে। কেউ হামানদিস্তায় শেকড় পিষছে, কেউ দুরমুশ করছে। চারদিকে কত গাছের কাণ্ড, শেকড় আর একটা ভারি মদালস গন্ধ। নীরবে সবাই কাজ করে যাচ্ছে। তাদের বেশবাস, তাদের কর্মধারা—সবকিছু মিলিয়ে একটা প্রাচীন ভারতের গন্ধ। কেমন অলৌকিক!

উঠোন পেরিয়ে বিষণ্ণবদন যে ভবনটির সামনে এসে দাঁড়ালাম, সেইটেই সাধনার আপিস বাড়ি। ভয়ে ভয়ে দরজা পেরিয়ে ঘরে ঢুকলাম। চোখে সবকিছু ধাঁধা ঠেকল। অন্ধকার যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল। আর সেই আঁধার সাঁতরে যখন চোখটা একটু সয়ে আসল, দেখি, চৌকোনো এক মস্ত ঘর, চারধারে টেবিলের সারি। তাতে কর্মচারীরা নিবিষ্ট মনে কাজ করছেন। ওই মস্তঘরে সাকুল্যে দুটি ৪০ পাওয়ারের বাতি। বাইরের আলো থেকে ঘরে ঢুকলে হঠাৎ কিছু চোখে পড়বে না। তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। নিমে তথা ফতুয়াধারী লোকগুলোকে কেন যেন জ্যান্ত লাশ মনে হচ্ছিল—নড়াচড়া নেই, কথা নেই, ঘাড় গুঁজে কী সব আঁকিবুঁকি কষছে!

আর একেবারে সামনে নড়বড়ে টেবিলে নিমে গায়ে যিনি বসে, বিজ্ঞাপনে তাঁর চেহারা এত সহস্রবার দেখেছি যে তাঁকে চিনতে কষ্ট হলো না মোটে।

বৃত্তাবদ্ধ যিশু : যোগেশচন্দ্র

চল্লিশ পাওয়ারের আলো-আঁধারের ছলনায় মনে হল যেন-বা বৃত্তাবদ্ধ যিশু। গায়ের নিমেটা অবিকল শ্লামিস। আস্তে আস্তে বিজ্ঞাপনের সুপরিচিত বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসতে থাকেন যোগেশ বাবু। কিন্তু কিছুতেই মেলাতে পারিনে ভাগলপুর কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যাপকের সঙ্গে। ওঁর সবটাই আটপৌরে। এ না হলে জলে জল বাধে!

—কী চাই?

যেন সুদূর থেকে শুধোলেন কেউ। পিনপতনের নীরবতা সাহায্য করলে আমায়। আরজি পেশ করলাম।

—পত্রিকা বার করবা, ভালো কথা। একটা সংখ্যা দ্যাখাও, তারপর না বিজ্ঞাপন।

এমন চিকন কথা ভালো লাগেনি। কিন্তু পরে প্রথম সংখ্যাটি হাতে পেয়ে খুশি হয়েছিলেন। নড়বড়ে টেবিলের ড্রয়ারটা খুললেন মাটা পালম নিমের বহু ব্যবহারে মলিন পকেট থেকে চাবির গোছাটা বের করে। ড্রয়ার তো নয়, একটা আস্ত শেফিল্ডের পোর্টমেন্টো। তাইতে থরেবিথরে সাজানো

সব ব্লক। ওই ভিড় থেকে একটা ব্লক বের করে আনলেন। তারপর টেবিলে সুতো দিয়ে বাঁধা কলমটা নিয়ে দোয়াতে চুবিয়ে খচ্‌খচ্‌ করে একটা কাগজে বিজ্ঞাপনের মুসাবিদায় মনোযোগী হলেন। নানা দৈনিকে, সাময়িকীতে, রেলওয়ে প্লাটফর্মে, স্টিমারঘাটে, পঞ্জিকায় যাঁর ছবিসংবলিত সাধনা ঔষধালয় ঢাকার বিজ্ঞাপন কত সহস্রবার কত অযুতবার দেখেছি, সেই প্রবাদতুল্য অধ্যাপক যোগেশ বাবু আমার সামান্য কাগজের জন্য কত যত্ন করে বিজ্ঞাপনের খসড়া লিখে চলেছেন।

—এই নেও, ভুল যেন না থাকে, প্রুফটা ভালো কইরা দেইখা দিও। ভুল থাকলে কিন্তু বিল কাটুম। আর এই যে ব্লকটা, এইটা বিল দেওয়ার সময় ফিরায়া দিবা। মনে থাকবো তো কথাটা?

আমি যেন হাতে স্বর্গ পেলুম।—হাফ পেজ। তার মানে এক বিজ্ঞাপনেই ২০ টাকা।

সেদিন যোগেশ বাবু আমার ব্যক্তিগত কিছু তত্ত্বতল্লাশ নিয়েছিলেন। কথার ফাঁকে একজন কর্মচারী এসে জিগ্যেস করলেন, বাবু, একটা পেনসিল দেন।

যোগেশ বাবু কেরানি পুঙ্গবের কাছ থেকে পেনসিলটা জহুরি যেমন হীরে পরখ করে, তেমনি করে ঘুরিয়েফিরিয়ে দেখলেন বুড়ো আঙুল ও তর্জনীর মুঠোয় পোরা মার্বেলের চেয়েও ছোট্টো একরত্তি পেনসিলটাকে। ওটা টেবিলের সঙ্গে বাঁধা পেনসিল হোল্ডার থেকে নিজের পেনসিলটা বের করে নিয়ে হোল্ডারের খাপে পুরে দিয়ে বললেন, এই তো, লেখা যায় না কে কইলো! পেনসিল শ্যাষ হইলে আইসো।

—আমার খাপে ঢুকলে শিষের ডগা নাগুর পায় না বইলাই তো আইলাম।

—আমার হোল্ডার আর তোমার হোল্ডার তো আর আলাদা না অম্বিকা। এই তো কেমন সুন্দর লেখা হয়। আরো চার-পাঁচ দিন যাইবো। নেও, ধরো। বলে যোগেশ বাবু পেনসিলটা ধরিয়ে দেন। পাঠক, ওটার আয়তন আমার চোখে এক সেন্টিমিটারের বেশি হবে বলে মনে হলো না।

অগত্যা অম্বিকা বাবুর মাথা চুলকে নিজের টেবিলে গোমড়া মুখে ফিরে যাওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। টেবিল থেকে যাতে পেনসিল বা কলম এ-হাত ও-হাত না হয়, তাই ওগুলো প্রত্যেকটা টেবিলের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা। চারধারে চক্রাকারে দাঁড়ানো টেবিলগুলো সে সাক্ষ্যই দিচ্ছে। পেনসিলের শিষ যখন গোড়ায় গিয়ে ঠেকবে, অর্থাৎ দশা হবে দেয়ালে পিঠ

ঠেকানোর মতো, যখন হোল্ডারেও কাজ দেবে না, তখনই কেবল জুটবে নতুন পেনসিল। ওটার হিসেব থাকে স্বতন্ত্র খাতায়। হুট করে চাইলেই হলো না। ওটার একটা গড় হিসেব আছে। একটু এদিক-ওদিক হলেই যোগেশ বাবু মাথা হেলাবেন আর বলবেন, দ্যাখ গৌর, এই প্রতিষ্ঠানটা আর একদিনে খাড়ায় নাই। অনেক কাঠখড় পোড়াইতে হইছে। তোমরা যদি একথা না বুঝো, তাইলে তো ঔষধালয়ের লালবাত্তি জ্বলবো।

সারা ভারত ও বিশ্বজুড়ে যাঁর প্রতিষ্ঠানের শাখা-প্রশাখা, নাম-যশ-খ্যাতি, সেকালের নিরিখে যিনি কোটিপতি, ঢলকো মলিন হেঁটো ধুতি ও নিমে গায়ে পা দোলাতে দোলাতে ৪০ পাওয়ারের আলোয় বিনে চশমায় কুল্লে ১০-১২ জন প্রশাসনিক কর্মী বাহিনী নিয়ে রাজত্ব চালিয়ে যাচ্ছেন—এ ভাবতেও অবাক হতে হয়। কিন্তু এই যে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিলুম সাধনা ঔষধালয়ের কর্ণধার যোগেশচন্দ্র ঘোষের কর্মধারার, একজন সামান্য অধ্যাপক থেকে বিশাল এক কর্মযজ্ঞের কান্ডারি হওয়ার চাবিকাঠিটা কিন্তু ওখানেই লুকোনো। আপাতত মনে হতে পারে বিচ্ছু হাড় কেপ্পন, কিন্তু কথায় বলে—A stitch in time saves nine। ওঁর ১ সেন্টিমিটারের শক্তি যে মহাশক্তি, তা ওঁর কর্মকাণ্ডই সাক্ষ্য দেয়। কত লোকের অন্নসংস্থানের হেতু ছিলেন তিনি, অথচ তাঁর মৃত্যু হলো কত মর্মান্তিকভাবে, তিলে তিলে গড়ে তোলা ৭১ নম্বর দীননাথ সেন রোডে অবস্থিত তাঁর প্রতিষ্ঠানের এই ৪০ পাওয়ারের দপ্তরেই। ঢলে পড়েছিলেন ১৯৭১-এর ৪ এপ্রিল পাক-সেনাদের গুলিতে। ওরা দেরি করেনি। ২৫ মার্চের নীল-নকশায় যোগেশচন্দ্র ঘোষের নাম ছিল, যেমন ছিল রণদাপ্রসাদ সাহার, পুত্রসহ যাঁকে ধরে নিয়ে গিয়ে পাক-সেনারা আর ফিরিয়ে দেয়নি। এঁদের দোষ একটাই—এঁরা হিন্দু। আর হিন্দু মানেই ধর্মনিরপেক্ষ দল আওয়ামী লীগের সমর্থক—যারা স্বরাজ চায়। কাজেই প্রথমে দোহন, তারপরে খতম। সেনারা দলে দলে যায়, যে যা পায় কুবের যোগেশ বাবুর খাজাঞ্চিখানা থেকে তুলে নিয়ে আসে। কিন্তু সবকিছুরই শেষ আছে। লুকোনো-ছাপানো ভান্ডার থেকে দিয়ে-থুয়ে ন'দিন বাঁচলেন। ৪ এপ্রিল কুটোটি পর্যন্ত জুটল না। কাজেই এত দিন যিনি দিয়ে এসেছেন, আজ তাঁর পাওয়ার দিন—রিক্ত হতভাগ্য বাবুর কপালে জোটে কয়েকটি মাত্র বুলেট!

এই কর্মযোগীর খোঁজখবরটা একটু নেওয়া যাক তো।

১৮৮৭ সালে সেকালের ফরিদপুর জেলার মাদারীপুর মহকুমার গোসাইরহাট, মতান্তরে জলছত্র গাঁয়ে ওঁর জন্ম। বাবা পূর্ণচন্দ্র ঘোষ।

ঢাকার জুবিলি স্কুল থেকে ১৯০২ সালে এন্ট্রান্স (আমাদের কালের ম্যাট্রিকুলেশন, একালের এসএসসি) পাস করে জগন্নাথ কলেজ থেকে ১৯০৪-এ এফএ (এখনকার আইএ) এবং ১৯০৬-এ বিএ পাস করেন। তখনো ঢাকাতে বিশ্ববিদ্যালয় জন্ম নেয়নি। কাজেই পড়াশুনোর পাট চুকোতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং ১৯০৯-এ রসায়নশাস্ত্রে এমএ পাস করেন। উল্লেখ্য, তিনি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ছাত্র ছিলেন। এরপর লন্ডন থেকে এফসিএস এবং আমেরিকা থেকে এমসিএস ডিগ্রি লাভ করেন। লেখাপড়ার পাট চুকিয়ে তিনি প্রথমে বিহারের ভাগলপুর কলেজে (১৯০৮-১৯১২), এরপর টানা ৩৬ বছর—১৯১৩ থেকে ১৯৪৮ পর্যন্ত—তাঁর নিজের কলেজ জগন্নাথ কলেজে রসায়ন বিভাগে অধ্যাপনা করেছেন। শেষের দুই বছর (১৯৪৭-৪৮) কলেজের অধ্যক্ষ পদে বৃত অবস্থায় অবসর গ্রহণ করেন। আমার দুর্ভাগ্য, মাত্র এক বছরের জন্য ওঁকে আমি পাইনি, ১৯৪৯-এ আমি ভর্তি হই ওই কলেজে। প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের প্রভাবে স্বদেশচিন্তায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা নিয়ে আয়ুর্বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ফলে জগন্নাথ কলেজে অধ্যাপনাকালেই প্রতিষ্ঠা করেন আয়ুর্বেদশাস্ত্রকেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠান সাধনা ঔষধালয়। তাঁর গবেষণা, সাধনা ও কর্মোদ্যমের ফলে লুপ্তপ্রায় আয়ুর্বেদ চিকিৎসা ও আয়ুর্বেদ ওষুধ প্রস্তুত প্রণালি আধুনিক মানে উন্নীত হয়। এক হিসেবে আয়ুর্বেদ চিকিৎসা দ্বারা রোগ নিরাময়ের পথ প্রদর্শনে সমগ্র ভারতে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তাঁর কাজের পুরস্কারস্বরূপ তিনি লন্ডন কেমিক্যাল সোসাইটির আজীবন ফেলো নির্বাচিত হন এবং যুক্তরাষ্ট্রের কেমিক্যাল সোসাইটির সদস্য হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। রোগব্যাধির কারণ ও লক্ষণ, আয়ুর্বেদ চিকিৎসার অন্তর্নিহিত তত্ত্ব, আয়ুর্বেদ ওষুধের ব্যবহার পদ্ধতি ও স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। যেমন—*অগ্নিমান্দ্য ও কোষ্ঠবদ্ধতা, আরোগ্যের পথ, গৃহ-চিকিৎসা, চর্ম ও সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি, চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা ও মুখরোগ চিকিৎসা, আমরা কোন্ পথে?*, ***Whither Bound are We?***, ***আয়ুর্বেদ ইতিহাস*** ও ***Home Treatment***। তিন খণ্ডে সমাপ্ত তাঁর *আমরা কোন্ পথে?* বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। শিক্ষক জীবনে ছাত্রদের জন্যও তিনি কিছু পাঠ্যবই লিখেছিলেন। যেমন—***Simple Arithmetic, Text Book of Inorganic Chemistry*** প্রভৃতি।

যোগেশ-তর্পণ হলো। কিন্তু আজও সেদিনের কথাটা আমার মনে পড়ে। উদুখলে মুষলের ঘায়ের শব্দে মুখর বনৌষধির গন্ধামোদিত উঠোন ভেঙে

হাঁটছি না তো, উড়ছি। পকেটে সাধনার বিজ্ঞাপনের কপি, আর ছোট্টো ব্লকটা যেন সমগ্র পৃথিবীকে নিয়ে এসেছে আমার ঘরে। এই যে এক বালকের হৃদয়ে আনন্দ বিলোনো যোগেশ বাবুর, এ তো বড় কম কথা নয়। এমন আরও জুটিয়েছেন আরও অনেকের হৃদয়ে। কত কাগজ তাঁর বিজ্ঞাপন পেয়ে সমৃদ্ধ হয়েছে, অর্থের সাশ্রয় হয়েছে কতজনের, এ কথা ভুলি কী করে! তাঁর কাছে একবার গিয়ে দাঁড়ালেই হলো, জুটে যেত বিজ্ঞাপন। কোনো বিজ্ঞাপনী সংস্থার দ্বারস্থ হতে হতো না কাউকে। শুধু কি কাগজ, পুজোয় কি ঈদে কি আর কোনো পরবে স্যুভেনির বেরোবে, যাও যোগেশ বাবুর কাছে। পাড়ায় নাটক নাববে, ক্লাবের বার্ষিকী বেরোবে—যোগেশ ভরসা।

ঝংকার : পলকে খাক হয়ে গেল

বিজ্ঞাপন যা পাওয়ার, হাতের কবজায় এসে যাওয়ার পর যখন বুঝলাম ভরণদানে আর কেউ এগিয়ে আসবে না, তখন চাঁদার জন্য হাতপাতা ছাড়া গতি রইল না। আরম্ভটা হলো বাবা-মাকে দিয়ে, তারপর ওই যে হাতে লেখা কাগজে যে ছোট্টমণিদের বিভাগ ছিল—'কাগজ কলম কালি', তার যে সদস্যকুল, তাদের দ্বারে দ্বারে—চারআনা-আটআনা করে জমা হয় 'ঝংকার তহবিলে'। ছুটে যাই ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, শামসুন্নাহার মাহমুদ, মুহম্মদ হবীবুল্লাহ বাহার চৌধুরী, হামিদুল হক চৌধুরীর কাছে। শহীদুল্লাহ্ সাহেব তখন লালবাগে থাকতেন। অলিগলি সাতগলি ভেঙে যখন ওঁর ডেরায় পৌঁছালাম, তখন ভরদুপুর। জানালা দিয়ে তাকিয়েছি, ওমা! এ যে অবিকল রবিবাবু! গভীর মনোযোগ দিয়ে কী লিখছিলেন, আমার উপস্থিতি টের পেয়ে বলে উঠলেন, কী চাই খোকা? বাইরে কেন, ভেতরে এসো।

আমার আরজি চাঁদার সঙ্গে একটা লেখারও আবদার ছিল। তিনি যে বাঙালি মুসলমান সম্পাদিত প্রথম শিশু মাসিক *আঙ্গুর*-এর (১৯২০) সম্পাদক ছিলেন, তা তখন জানা না থাকলেও অচিরেই জানতে পেলুম। তবে এটা মনে

পড়ে, ১৯৪৫-৪৬-এর দিকে *গুলবাগিচা* নামে একটি কিশোর মাসিকের সম্পাদনা করতেন। *বুলবুল*-এর পাশাপাশি কাগজটা বোধকরি হবীবুল্লাহ বাহারই বের করতেন কলকাতা থেকে। এসব বিবেচনায় এনে ওই আবদার। খুব খুশি হয়েছিলেন শহীদুল্লাহ্ সাহেব, বাহার সাহেবের মতো উপদেশ দেননি (যদিও তেতো ছিল, তবে যথার্থ উপদেশই দিয়েছিলেন)।

—এইটুকুন বয়সে কাগজ বের করছ, খুব আনন্দের কথা। আমাদের কালে তো ভাবতেই পারতুম না। তবে বহু বছর আগে *আঙ্গুর* নামে ছোটোদের জন্য একটা কাগজ সম্পাদনা করেছি। কাগজটা বেশিদিন বাঁচেনি। বলে খস্‌খস্ করে চাঁদার খাতায় গোটা গোটা অক্ষরে নিজের নামটি লিখে অঙ্ক বসালেন—পাঁচ টাকা। নিজের চোখকেই বিশ্বাস হচ্ছিল না।

—এই নাও টাকাটা। কিন্তু লেখা যে দিতে পারব না। হাতে অনেক কাজ।

—তাহলে একটা বাণী দিন। আমি নাছোড়বান্দা, পাঁচ টাকার নোটটা পকেটে পুরতে পুরতে বলি।

—বোসো, দিচ্ছি। বলে একটা কাগজে লিখে দিলেন সনাতন এই বাণী :

> *"আমি শুনিয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম যে শীঘ্রই ঢাকা হইতে 'ঝংকার' নামে একটি কিশোর মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইবে। পাকিস্তান রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ কর্ণধারদের গড়িয়া তুলিবার বিরাট দায়িত্ব ঝংকারের।*
>
> *"আমি ইহার সর্বাঙ্গীণ উন্নতি কামনা করি।*
>
> "মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, ৫/১২/৪৮"

মজা কি. এরপর হবীবুল্লাহ বাহার, শামসুননাহার ও হামিদুল হক—যাঁদের কাছেই গিয়েছি, তাঁদের সবাই শহীদুল্লাহ্ সাহেবের পদাঙ্ক অনুসরণ করে হাতে ধরিয়ে দিয়েছেন ওই পাঁচ টাকা আর শেষোক্ত জন ছাড়া একটি করে বাণী।

খেলাঘরের খেলা সাঙ্গ হওয়ার পর পত্রিকা-পত্রিকা খেলার হাতে লেখার পর্ব শেষ হয়ে গেল, যেদিন ১১নং মাহুতটুলির আলতাফ প্রেসে পাণ্ডুলিপি জমা দিলুম।

কিন্তু ছোটোদের কাগজের লেখার পরেই প্রাণ হলো ছবি। *মৌচাক, রংমশাল, পাঠশালা, কিশলয়, শিশুসাথী, শিশু সওগাত, রামধনু, শুকতারা*—এসব প্রাণকাড়া সেকালের শিশুতোষ কাগজই কি শুধু পড়তাম? না তো, প্রেমেন মিত্র, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, হেমেন্দ্রকুমার রায়, ধীরেন্দ্রলাল ধর, বুদ্ধদেব বসু, সুনির্মল বসু, নীহাররঞ্জন গুপ্ত প্রমুখের লেখা গোগ্রাসে গিলতুম। তারপর শৈল চক্রবর্তী, প্রতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ফণীগুপ্ত, পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী, বলাইবন্ধু রায়—এঁদের ছবিও আমাদের কম আনন্দ জোগাত না। কিন্তু

কাগজে ছবি ছাপাতে হলে চাই ব্লক—সেই ব্লকেরই কোনো প্রতিষ্ঠান ছিল না সেকালে ঢাকাতে। এখানকার কাগজগুলো কলকাতা থেকে তৈরি করে নিয়ে আসত ব্লক। আমাদের নুন আনতে পান্তা ফুরোয়—অতো খাই-খরচা মেটাবে কে! কে বললে ইসলামপুরে আছে এক ব্লকের কারখানা। খুঁজে পেতে বের করলাম ঢাকার আদি গৌরব ইসলামপুর রোডের চট্টেনেট্টে ব্লকের কারখানাটি। সেকালে ঢাকার নবাবের পরেই যিনি ধনেমানে কেউকেটা হিশেবে বিবেচিত হতেন, তিনি সর্দারকুল শিরোমণি কাদের সর্দার—মির্জা আবদুল কাদের। নবাববাড়ির উল্টো দিকেই ছিল ওঁর বাড়ি ও বিখ্যাত প্রেক্ষাগৃহ 'লায়ন' সিনেমা। পশুরাজ্যের দীপ্তি হয়তো ছিল না, কিন্তু দর্শকদের মনোরঞ্জনের জন্যে বায়োস্কোপ ছাড়া অতিরিক্ত বোনাস হিশেবে ছিল ক্ষীণ কটিযুক্তা বিপুলজঙ্ঘা লাস্যময়ীদের নৃত্যকৌশল। এই নৃত্য কোলাহলপূর্ণ হলের সমুখেই ঐ কারখানা—বি.এস. ব্লক কোম্পানি। যিনি মালিক, তিনিই কর্মচারী—কুল্লে ঐ একজন। বিজ্ঞানসম্মত প্রথায় নয়, সিসের পাত তৈরি করে বাটালি ও হাতুড়ির ঘায়ে উডকাটের মতো ঠুকেঠুকে রূপ দেন ব্লকের ছাঁচ—আধো আলো আধো আঁধারির আধিভৌতিক পলেস্তারা খসে পড়া স্যাঁতসেঁতে নোনাধরা ওঁর একরত্তি ঘরে। ওঁর নুয়ে পড়া দেহে একটা ব্রজভাব। চাঁচুনি ছিটকে ছিটকে পড়ে, চালশে চোখে লাগল কি লাগল না! কামরুল ভাই (শিল্পগুরু কামরুল হাসান) তখন কলকাতার সান্দ্র মায়া ত্যাগ করে ঢাকার বাসিন্দে, সদ্য প্রতিষ্ঠিত চারু ও কারুকলা ইনস্টিটিউটের গুরুমশাই। মুকুল ফৌজের কল্যাণে কলকাতা থেকেই মিত্রতা। দ্বারস্থ হতে এঁকে দিলেন শীর্ষনাম—*ঝংকার*। ওইটে সামনে রেখে কাজ এগোচ্ছে, আমি পাশে বসে। যত বলেন, 'বানাইতে দেরি হইবো, সামের বেলা ভি লইয়া যাইও', আমার ততো জেদ। অগত্যা, চম্‌চমা চোখে দেখি—চিকি পাতের গায়ে বাটালির ঘা পড়ে অক্ষরগুলো কেমন বেরিয়ে আসে! আমার মনের পটে সব আঁকা হয়ে যায়। বিকেল নাগাদ কাজ শেষ হতে ছ'টা টাকা ওঁর হাতে

...কাদের সর্দার

তুলে দিয়ে প্রবল উত্তেজনায় রাজপথে পা ফেলি। আমার হাতে তখন সাত রাজার ধন মানিক ঝংকার-এর আস্ত ব্লক! একরকম উড়েই বাড়ি ফিরি।

দু ভায়েতে ঘোর পরামর্শ। তারপর বাজার থেকে সিসে কিনে আনা। হবে তো, আমাদের হাতেও হবে। তবে কি সিসের পাতে নয়, আমাদের ঘা কাঠের গায়ে। তাই তো কাঠের টুকরোও জোগাড় হলো—ওর র‍্যাঁদা বুলোনো মসৃণ গায়ে ছবি এঁকে ওই রেখা বরাবর বাটালির ঘা চলে। উডকাট শেষ—অর্থাৎ ব্লকের ছাঁচ (mould), এবার বাকি যা, সে তো গালানো সিসে ওই ছাঁচে ঢেলে দেয়া, তার মানে জ্বলজ্যান্ত ব্লক! আমাদের হাতে! বড় ভাই (*ময়ূরের পা* খ্যাত মঈদ-উর-রহমান) ততক্ষণে কড়াইয়ে সিসে গালিয়ে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। কাঠের বুকে আমার খোদাইয়ের কাজ শেষ হয়েছে কি কড়াইয়ের বাঁট ধরে গালানো সিসে ঢেলে দেন কাঠের ছাঁচে। বিকট শব্দে মুহূর্তে জ্বলে ওঠে আগুন আর ফুলে ফুঁসে ওঠা ধূম্রজাল। আমাদের কামিনীভূষণ রুদ্র রোডের তেকেলে দোতলা বাড়ির রান্নাঘরে ব্লকবিষয়ক যজ্ঞাগ্নি উদ্ভূত ধূম্রজাল অতঃপর চতুর্দিকে ধাবমান। জনক-জননী, ভ্রাতা-ভগিনীর শঙ্কাশ্রু আমাদের চোখের জলে নাকের জলে এক মহাদশা বিপর্যয়।

হায়, এত পরিশ্রম এত সময় আর ধৈর্যের ফসল যে ছাঁচ, পলকে কেমন খাক হয়ে গেল!

ও খোদা! ও হরি! একী করেছি দুভায়েতে! বুদ্ধিসুদ্ধি শিকেয় উঠল যে! কাঠের ছাঁচে উত্তপ্ত তরল সিসে—ঘৃতপাত্রে অগ্নি! কাঠ তো পুড়বেই। অথচ খেয়াল হয়নি প্রেসেই কাঠের ব্লক দেখা সারা। আমার তৈরি উডকাটটি নিজেই যে ব্লক, এ খেয়াল হল কোথায়! একেই বলে রাম-ভেকোমি!
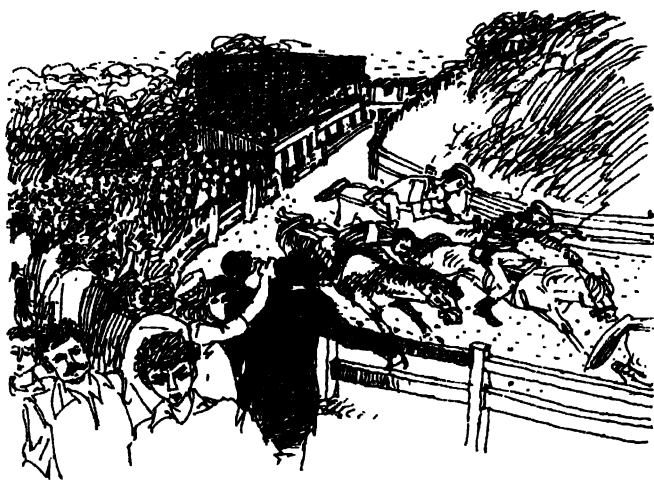
সেকালের ঢাকার বিনোদন

দেশভাগের পর কলকাতার পাট চুকিয়ে যখন এক রত্তি ঢাকায় এলাম, তখন ব্রিটিশ-উত্তর যুগের সেই বাঘাহামা কালে বিনোদনের জায়গা বলতে ছিল ছড়িয়েছিটিয়ে থাকা ছটা প্রেক্ষাগৃহ রমনার রম্ভা 'ব্রিটানিয়া', সং বংশালের 'মানসী', কাচারি পল্লীর 'মুকুল', সদরের শোভা 'রূপমহল', উর্বশীসম 'লায়ন', চর্মে ঘর্ম আর্মেনিটোলার 'নিউ পিকচার হাউস', আর চকের চাক্কু 'তাজমহল'। পরে পঞ্চাশের দশকের মধ্যে গড়ে ওঠে মায়া (বর্তমানে স্টার), নিউ প্যারাডাইজ (অধুনালুপ্ত), গুলিস্তান, নাজ ও নাগরমহল (বর্তমানে চিত্রামহল)। কোনো নাট্যশালা নয়, কোনো চিড়িয়াখানা নয়, ভালো পার্ক নয়, সাংবৎসরিক সার্কাস নয়—কিছু না। তবে অপার সবুজের স্নেহসান্নিধ্য পেতে ছিল কিন্তু নরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর বলধা গার্ডেনের আশ্চর্য সব তরুলতা ও বৃক্ষেরা—রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য ক্যামেলিয়া থেকে শুরু করে শঙ্খনিধির কানায় কানায় বুকভরা জলে নলিনীসকলসহ আমাজন লিলিরা ছিল তো। ছিল গোটা রমনার অনন্ত সবুজ।

বলতে ভুলেছি, বিনোদনের আরেকটা জায়গা ছিল—রমনার রেসকোর্স—ঘোড়দৌড়ের মাঠ—আজ যা সোহরাওয়ার্দী উদ্যান। কিন্তু বালকের এলাকা নয় মোটে ওটা, নয় আমাদের সুশীল রক্ষণশীল সমাজের। কারণ একটাই, ওটাকে বলা যাবে না পুরো সুস্থ প্রমোদ। প্রতিযোগিতার দৌড় জয়পরাজয়ের রোমাঞ্চ হয়তো ছিল, কিন্তু ওর সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা ছিল জুয়োর উন্মাদনা। আপনারা বলবেন, ওই কালে ওই একটা জুয়োর কথা বলছেন, অথচ যে বুদ্ধিজীবীদের আখড়া প্রেসক্লাব, বেনিয়া ও আমলাদের ঢাকা ক্লাব ও অফিসার্স ক্লাব, এবং ফুটবল ক্লাবগুলোতে তিন তাস ও হাওজির যে সর্বনাশা খেলা চলছে, সেটার বেলায়? তুলনায় ফি হপ্তাহে পান্টার গুনতে হয় তুলনামূলকভাবে কম। তবে পান্টারদের মতো বাজি না ধরেও ফার্লঙের হিসেব কষে ঘোড়ার বেগের সঙ্গে মনের আবেগের যোগ হতে কোনো মানা ছিল না। যত দূর মনে পড়ে ফি শনিবার রেস হতো। ঘোড়ারোগ যাদের পেয়ে বসেছে, পুরান ঢাকার সেই বনেদি পান্টারেরা সকাল থেকেই পিল পিল করে জুটত রেসকোর্সে। এখন যেখানে পুলিশদের আড্ডা ঘরবাড়ি, ওগুলো ছিল ঢাকা রেস ক্লাবের প্রশাসনিক ভবন ও টিকিট ঘর। সামনেই ছিল দর্শকদের গ্যালারি। এদিন কান্দুপট্টি, সাঁচিবন্দর, কুমোরটুলির হট্টবিলাসিনীদেরও দেখা মিলত এই ভিড়ে—কেউ রিকশায় ভেড়োর হাত ধরে, অনেকে ঘোড়ার গাড়িতে দলবেঁধে। সাধারণ পান্টারদের সঙ্গে রেলিং ঘেঁষে এক ঠায় দাঁড়িয়ে সারা হপ্তা অন্যদের আনন্দ বিলিয়ে নিজেরা আনন্দ লুটত দেহবল্লরীতে ঢেউ তুলে, হরষে পুলকে নিজেদের উজোড় করে দিয়ে। সমাজপতি, বিত্তবান ও ক্লাবের সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত হোয়াইট গ্যালারিতে তখন আড়চোখের চালাচালি। এই গ্যালারির একজন নিয়মিত সদস্য ছিলেন সিকান্দার আবু জাফর—খেলাটা যেমন বুঝতেন, উপভোগ করতেন ততোধিক। ওদিকে বুকিরা ছোটাছুটি করছে রেসপিটস্-এর বই হাতে। কেউ কেউ একবার ঘুরে আসছে ঘোড়াশালে—ওই যেখানে আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসগুলো গজিয়ে উঠেছে, ইকবাল হলের পেছনে ছিল তো মোগল আমলের বিশাল বৃত্তাকার ঘোড়ার আস্তাবল। বুকিদের কথার সঙ্গে, টিপস বইয়ের মিল না বেমিল একবার দেখতে হয়তো—ঘোড়ারা সব ঠিকঠাক? হ্রেষারব কী বলে? পা ঠুকঠুকানি লেজ নাড়ানি? খাওয়াদাওয়া, জাবর কাটা—সব নরমাল? জ্বলজ্বলে রঙের জার্সি গায়ে জকিরা তৈরি হচ্ছে মাঠে যাবে বলে। না, কোনো কথা কি ইশারা নয়, কোনো টিপস নয়—পাক্কা নিষেধ আছে ক্লাবের বিধানে। আহা, ঘোড়াগুলোর কী বাহারে সব নাম:

ফ্লাইং কুইন, রোজ অব ঢাকা, ভিক্টোরিয়া রেজিনা, বিউটি কুইন, ঢাকা থান্ডার। টিকিট ঘর খুলতেই পান্টারদের মধ্যে হুটোপুটি!

ঘোড়া ছুটছে, এক এক ফার্লং পেরোচ্ছে আর দর্শকদের হল্লা বাড়ছে, পিছিয়ে-পড়া জকির নামে খিস্তিও অনুপাতে কম জুটছে না। মফস্বলের ঘ্রাণমাখা রাজধানীর সুশীল আকাশবাতাস মুহুর্মুহু গর্জনে কেঁপে কেঁপে উঠছে। কলকাতায় গড়ের মাঠে বাবাদের আপিসের কোনো ফুটবল ম্যাচ থাকলে, কিংবা লিগের কোনো বড় ম্যাচ—তখন দূর থেকে ভেসে আসা রয়েল ক্যালকাটা টার্ফ ক্লাবের ঘোড়দৌড়ের চিৎকার শুনেছি; কিন্তু কখনো কাছে থেকে দেখিনি। এখন একেবারে সুমুখ থেকে।

বিকেলে খেলা সাঙ্গ হলে সারা দিনের চিৎকার ও উত্তেজনায় পর্যুদস্ত দর্শক ও বাজি ধরিয়ে দলটি ফিরে যেত যে যার ডেরায়—বাজি হেরে কারও প্রতিবারের মতো মিথ্যে শপথ—'খোদাকি কসম, ইয়ে জিন্দেগি মে আর খেলুঙ্গা নাহি' কিংবা 'মায়ের কসম খাইয়া কইতাছি, রেসের নাম ভি আর জবানে আইলে তরা হালায় কিয়া বলুঁ---কুত্তা কা নাম সে পুকারো'—এমনি কাঁচি উর্দু-বাংলার ভিয়েন দেওয়া সব সংলাপ কানে আসত। ঢাকার লোকদের মুখে শুনেছি, এই রেস খেলতে গিয়ে অনেক পরিবার নিঃস্ব হয়ে গেছে যেমন, তেমনি খুনখারাবিও ঘটেছে অনেক। এক পান্টার তার ভাইজির গলার চেন নেওয়ার জন্য তাকে হত্যা করেছিল। স্ত্রীর গহনা বিক্রি করে সর্বস্বান্ত হয়েছে কেউ কেউ। দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হয়েছে অনেকে। শেয়ারে টিকিট কিনে জয়ী হলে ভাগবাটোয়ারা নিয়ে খুনোখুনি পর্যন্ত হয়ে যেত। স্ত্রী কিছু বললে প্রহারই ছিল তার একমাত্র পুরস্কার।

কানে আসত মাহ্‌বুব আলী ইনস্টিটিউটের মঞ্চ থেকে ভেসে আসা *সিরাজউদ্দৌলা* নাটকের কুটকচালে ওয়াটসনের এঁড়ে গলার সংলাপ, "বাংলা, বিহার, ওড়িষ্যা আপনাদের হোবে! অ্যান্ড উই, এবং হামরা মজা সে বাণিজ্য করিবে।" হ্যাঁ, এ ব্যাপারটা ছিল—নেই নেই করেও রেলওয়ের এই মিলনায়তনটা সেকালের নাট্যপিপাসুদের স্বাদ কিছুটা হলেও মেটাত। নবাবপুর রেলগেটের পাশেই ছিল ওটা। তথাকথিত নগর উন্নয়নের সাঁড়াশি আক্রমণে ওটা আজ ইতিহাস।

হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো পঞ্চাশের যুগে ঢাকার বুকে প্রমোদ ভেলায় চেপে এসেছিল মাদ্রাজ তথা ভারতবর্ষ থেকে বিখ্যাত *কমলা সার্কাস* তাদের বিপুল বহর নিয়ে, আর এসেছিল মার্কিন মুলুক থেকে *সার্কারামা*। পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী হলে কী হয়, ওর সারা গায়ে তখনো জেলা-

শহরের গন্ধ। কমলা সার্কাস ও সার্কারামার আগমনে শহরটা যেন চেত্তা ভেঙে উঠে বসল।

পল্টনজুড়ে কমলা সার্কাসের বহর আঁট হয়ে ঘাঁটি গাড়ল। যেন বা এক সার্কাস নগর। ছোট ছোট তাঁবুর ঘর, তাতে সার্কাসের খেলোয়াড় ও কর্মী বাহিনীর সংসার। সারিবদ্ধ বড় বড় খাঁচা, পশুরাজ সিংহ, বেড়াল মামা, বাঘ মশাই, মক্ষী-প্রেমী ভালুক, রামসখা বানর—বিরস নয়নে অরণ্য ধ্যানে মগ্ন। ওদিকে একধারে শেকলে বাঁধা হাতির পাল—মুখে কলার পেটো, পাশেই ঘোড়া আর একটু তফাতে ফুটফুটে স্প্যানিয়্যালগুলোর ছোটাছুটি, হুটোপুটি! চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে খেলোয়াড়েরা, তাদের কিছু কাচ্চাবাচ্চা—এদের তো আর দেশে ফেলে আসা যায় না! উপরন্তু খেলাটা শিখবে মায়ের পেট থেকে পড়েই। রাতে খেলা দেখাবে এরা। বিশাল তাঁবু পড়েছে মাঠের মাঝে। এরা কেউ সাজবে ক্লাউন। নিজেদের জীবনে হাসি না থাকলেও হাসাবে আগত দর্শকদের—কত রঙে কত ঢঙে কত রঙিন আঙিয়া আর টোপর মাথায় দিয়ে। কেউ কেউ ট্র্যাপিজের খেলায় মাতবে। ৫০০ ফুট উঁচুতে শূন্যে পাক খাবে। দুগাছি দড়ি ঝোলানো আড়কাঠে ঝুলতে ঝুলতে দেখাবে গা হিম-করা নানা দড়িবাজির কসরত। আর এটাই তো সার্কাসের আসল খেলা। তারপর রয়েছে সরু তারের ওপর সাইকেল চালনা, নাচানাচি, রঙিন হাওদায় চড়ে হাতি নিয়ে বল খেলা, ঘোড়া চড়ে এক ঘোড়া থেকে আরেক ঘোড়ায় লাফানো, সিংহ ও বাঘেদের সব তেজ ফুটুস করে তাদের নিয়ে নানা খেলা—এসব দেখেছি তো! বেশির ভাগ খেলাতেই মেয়েদের প্রাধান্য। নানা কারণে কমলা সার্কাস তিন মাসের কড়ারে এসেও বছরখানেক আনন্দ বিলিয়ে ভারতে চলে যায়।

এরপর আসে সার্কারামা। মার্কিন মুলুক থেকে। কাগজে কাগজে কত বিজ্ঞাপনের ফাঁদ, দেয়ালে দেয়ালে পোস্টারের বাহার! পল্টনের ময়দানে পড়ল মস্ত তাঁবু—ওই সার্কাসের মতোই গোলাকার। তাঁবুর ভেতরে ওই সার্কাসের মতোই দর্শকদের আসন। ঠিক মাঝখানে গোলাকার বড়সড় সাদা পর্দা। সিনেমার মতো তাতে ছবি আসবে। ছবিতে একটা গাড়ির উইন্ড-স্ক্রিন ফুটে উঠবে—সুমুখে অনন্ত রাজপথ। মধুর বাদ্যধ্বনির মাঝে গাড়িটা চলতে শুরু করবে, সামনে রাজপথ, দুধারে সবুজের খেলা, গিরিশ্রেণী, হয়তো ওই মুহূর্তে কোনো ধূসর খোলা প্রান্তর ভেঙে এগোচ্ছে গাড়ি, ওই দূরে দেখা যাচ্ছে স্কাইস্ক্র্যাপারের শৃঙ্গ, একসময় কাছে আরও কাছে, এবার শহরের মাঝ দিয়েই, হয়তো সেটা ডালাস নগর, এমনিভাবে কত প্রান্তর, কত রাজ্য, কত শহর-নগর, কত ট্রেইল, চকচেরি কিংবা অ্যাসপেন গাছের সারিকে পাশ কাটিয়ে

গাড়ি শহরের উদ্যানের পাশে এসে হঠাৎ থেমে পড়ল। কেন, কেন, গাড়ি থামল কেন, আরও কত দেখার আছে যে! হঠাৎ সবাই নিজের মধ্যে ফিরে আসি আমরা, অর্থাৎ দর্শকেরা। না, আমরা কোনো গাড়ির যাত্রী নই, আমরা টিকিট করে আসা দর্শকমাত্র। অর্থাৎ সার্কারামার ওই ঘুরন্ত পর্দার এমনই গুণ যে, কখন-যে আমরা ওই ছবির গাড়ির সোয়ারি হয়ে গিয়েছি, বেমালুম ভুলে গিয়েছিলাম! ঢাকার কথা, পল্টনের কথা তাঁবুর কথা, তাঁবুর এতগুলো দর্শকের কথা—সব ভুলে ঢুকে পড়েছি ছবির পর্দার ওই গাড়িতে—উইন্ডস্ক্রিনের সামনে বসে দেখছি গোটা মার্কিন মুলুকের রাজ্যগুলো! এ এক অভিজ্ঞতা বটে। যাকে বলে ত্রিমাসিক অভিযান!

এরপর কেটে গেছে ৪০-৫০ বছর। আর এমন চমক-দেখানো ঘটনা ঘটেনি ঢাকার বুকে।

শুরু করেছিলাম কিন্তু প্রেক্ষাগৃহ দিয়ে। বোধ করি ঘোড়ারোগে পেয়ে থাকবে আমাকেও, তাই আনবাড়ি যাওয়া। এখন সেই কথা।

গুলিস্তান সিনেমার উল্টো দিকে ওই যেখানে সাধারণ বিমার সদন, সেখানে ছিল ব্রিটানিয়া হল। তখন তো পুরো এলাকাটাই ছিল ন্যাড়া, ঘরবাড়ি বলতে তেমন কিছু ছিল না। ছিল কিছু ক্লাবঘর, ডিএসএ গ্রাউন্ড আর বাকিটা সবুজ। এই সবুজের পটে ওই একরত্তি হল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ঢাকাতে সমবেত মার্কিন জিআইবৃন্দ ও ব্রিটিশ টমি সেনাদের বিনোদনের জন্য রাতারাতি গজিয়ে ওঠা—দেখতে মোটেও সুশ্রী নয়, কিম্ভুত একটা গুদোমঘর বুঝিবা! কলকাতার টকি শো হাউসকে মনে করিয়ে দেয়। ভেতরে বসার আয়োজনও তেমনই, যেন বা অতিথি এসেছে, সম্ভ্রম বুঝে বাড়ি থেকে, ধারকর্জ করে, কিছু সস্তায় বানিয়ে আনা সোফা, চেয়ার—তেকেলে, নড়বড়ে। মার্কিন-ইংরেজ সেনারা বিদেয় নিয়েছে সেই কবে, কিন্তু হলের শুধুই ইংরেজি ছবি দেখানোর ঐতিহ্যটুকু থিতু ছিল ওই চল্লিশের শেষ পাদেও। কত ছবি দেখেছি : রোনাল্ড কোলম্যানের ভালো ও মন্দে মেশানো দ্বন্দ্ববিধুর *ডাবল লাইফ,* এস্থার উইলিয়াম্‌সের হাসি রাশি বিকিনি শো *বেদিং বিউটি,* লরেল-হার্ডির হাস্যেলাস্যে ভরপুর *এ হান্টিং উই উইল গো,* পিটার উস্তিনভ অভিনীত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধনির্ভর ছবি *সাহারা,* আর সাত-আট বার দেখেও তৃষ্ণা মেটেনি যে ছবি—স্যার লরেন্স অলিভিয়ার অভিনীত শেকসপিয়ারের *হ্যামলেট*।

নবাবপুর-বংশালের তেমাথার অদূরে 'মানসী' (পাক আমলে 'নিশাত' নামধারণ করে যা বর্তমানে পুনরায় স্বনামে বহাল) তিরিশের দশকের শেষপাদে বলিয়াদির জমিদার পরিবারের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। যত

দূর জানা যায়, এ দেশের নারী চিকিৎসকদের মধ্যে অন্যতম পথিকৃৎ ডা. কমলাকুমারীও এই হলের মালিকানার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। দিলীপ কুমারের অভিনয়জীবনের গোড়ার দিকে যে কটা ছবি প্রথম হিট করেছিল, তার মধ্যে *মেলা, আরজু, আন্দাজ, নদীয়া কে পার* অন্যতম—সব কটি ছবিই 'মানসী'তে দেখা।

এখনকার 'আজাদ' সেকালের 'মুকুল' বা 'মুকুল টকী'। কোর্ট-কাচারির উল্টো দিকে। মূলত বাংলা ছবি দেখানো হতো। মুড়াপাড়ার জমিদার মুকুল ব্যানার্জি এর প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর নামেই হলের নাম। ভদ্রলোক ঢাকার প্রাচীনতম চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠান 'ঢাকা পিকচার প্যালেস'-এরও প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। প্রতিষ্ঠাকাল ১৯২৮। উল্লেখযোগ্য যে, এই হলের একটা শেয়ার কিনেছিলেন সুপণ্ডিত অধ্যাপক ড. কাজী মোতাহার হোসেন। মুকুলের উদ্বোধনী ছবি ছিল ব্রিটিশ আমলে ঢাকায় নির্মিত প্রথম পূর্ণাঙ্গ নির্বাক ছবি *শেষ চুম্বন (দি লাস্ট কিস)*। উল্লেখযোগ্য, রূপমহলে মুক্তি পাওয়ার আগে বাংলাদেশের প্রথম পূর্ণাঙ্গ সবাকচিত্র *মুখ ও মুখোশ*-এর প্রথম বিশেষ প্রদর্শনীও এই মুকুল হলেই

...বংশাল রোডে মানসী সিনেমার...

হয়েছিল (৩.৮.১৯৫৬) সকালবেলা। *রূপছায়ার* সম্পাদক হিসেবে এই প্রেস শোতে আমিও আমন্ত্রিত ছিলাম।

ঢাকার প্রথম প্রেক্ষাগৃহ ছিল 'নিউ পিকচার হাউস'। কিন্তু তার আগে 'রূপমহল'-এর কথাটা সেরে নেওয়া যাক। কারণ, এর সঙ্গে ওই মুকুল বাবুর নামটিও জড়িয়ে। ১৯২৪ সালে যাত্রা শুরু 'সিনেমা প্যালেস' পরিচয়ে। তবে মালিক নিয়ে মতভেদ আছে। কেউ বলেন, বিখ্যাত রূপলাল হাউসের রূপলাল দাস, কেউ বা বলেন ধীরেন রায়, কেউ শচীন ব্যানার্জি। পরে এক মাড়োয়াড়ির হাতে মালিকানা গেলে নাম দাঁড়ায় 'মতিমহল'। কিছুকাল পর আবার হাতবদল। এবার মুকুল টকির মুকুল ব্যানার্জির হাতে পড়ে নাম দাঁড়ায় 'রূপমহল'-এ। ১৯২৯ সালে বঙ্কিমচন্দ্র রচিত *দুর্গেশনন্দিনী* মুক্তি পেলে সাম্প্রদায়িক কারণে মুসলমানেরা আপত্তি তুললে এবং দাঙ্গার আশঙ্কা দেখা দিলে দুটি আপত্তিকর দৃশ্য বাদ দিয়ে ছবিটি প্রদর্শিত হয়। মুকুল বাবুর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র কমল ব্যানার্জি মালিক হন। সহজ-সরল সদাহাস্যময় গৌরকান্তি কমলবাবুর সঙ্গে আমার মিত্রতা ছিল। তাঁর সহৃদয়তার কারণেই এই হলে *মুখ ও মুখোশ*-এর মুক্তি সম্ভব হয়েছিল। গুদামঘরের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে গড়ে উঠলেও আমাদের চলচ্চিত্র ইতিহাসে অক্ষয় হয়ে থাকবে এই প্রেক্ষাগৃহটি। বোম্বে ও লাহোরের হিন্দি-উর্দু এবং কলকাতার বাংলা ছবির দৌরাত্ম্যে কোনো হলই যখন আবদুল জব্বার খাঁ পরিচালিত পূর্ব বাংলার প্রথম ছবি *মুখ ও মুখোশ দেখাবে* না বলে বেঁকে বসল, তখনই বিদেশি ছায়াছবির পরিবেশকদের অসহযোগিতার হুমকি অগ্রাহ্য করে এই কমলবাবুই নিলেন ঝুঁকিটা। মুকুলে প্রেস শো হলেও ছবিটির প্রদর্শন শুরু হয় এই হলেই। ১৯৫৬ সালের ৩ আগস্ট পূর্ব পাকিস্তানের তৎকালীন গভর্নর এ. কে. ফজলুল হক প্রধান অতিথি হিসেবে ছবিটির উদ্বোধন করেছিলেন। স্টুডিও নেই (১৯৫৮ সালে তৎকালীন বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের উদ্যোগে এফডিসি সক্রিয়ভাবে তার কাজ শুরু করে বর্তমান কমপ্লেক্সে ১৯৫৯-এ), অভিজ্ঞ কলাকুশলী নেই, অর্থাৎ ঢাল নেই তলোয়ার নেই নিধিরাম জব্বারের ছবিটি দেখার জন্য সেদিন ঢাকার চলচ্চিত্রপ্রেমী সবাই যেন ভেঙে পড়েছিল সদরঘাটের ওই আচাভুয়ো হলে। প্রতিটি শো হাউসফুল হওয়া সত্ত্বেও শর্ত অনুযায়ী সপ্তাহ শেষে ছবিটির প্রদর্শন বন্ধ হয়ে যায়। এই হলে আরেকটি স্মরণীয় ছবি দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল, প্রমথেশ বড়ুয়া ও যমুনা দেবী অভিনীত শরৎচন্দ্রের অমর কাহিনি সংবলিত *দেবদাস।* বোধকরি এটাই দেবদাসের শেষ প্রদর্শনী। কারণ, কলকাতা কি ঢাকা,

কোথাও ছবিটির প্রিন্ট পাওয়া যাচ্ছে না। কেউ কেউ বলেন, ওটার প্রিন্ট নাকি ফিল্ম আর্কাইভের গুদামে পচে মরছে।

এবার 'নিউ পিকচার হাউস'-এর কথা। এই হলটি প্রধানত সেকেন্ড রান ইংরেজি ছবি দেখাত। আর্মেনিয়ান গির্জার পাশে আর্মেনিয়ান স্ট্রিটে অবস্থিত এই হলটির গোড়ায় নাম ছিল 'পিকচার হাউস'। প্রথম মহাযুদ্ধের কোনো এক সময়ে যাত্রা শুরু। লেজার নামে জনৈক ইংরেজ প্রথমে পাটের গুদাম, পরে একে প্রমোদ হলে রূপান্তর করেন। হাত বদল হয়ে উদ্ধভজী ঠাকুর নামে এক মাড়োয়ারি 'পিকচার হাউস' নাম দিয়ে দর্শনীর বিনিময়ে গ্রেটা গার্বো অভিনীত একটি ছবি দিয়ে প্রদর্শনী শুরু করেন। এরপর আরও হাতবদল হয়ে রাজেন্দ্রকুমার গুহ ও মতিলাল বসু হলটি কিনে নিয়ে 'নিউ পিকচার হাউস' নামকরণ করেন। অনেকের মতে, এটাই বাংলাদেশের প্রাচীনতম প্রেক্ষাগৃহ। এখানেই দেখানো হয় সর্বকালের সাড়া জাগানো ছবি অশোক কুমার ও দেবিকা রানী অভিনীত *অচ্ছুৎ কন্যা* এবং চার্লি চ্যাপলিনের *মডার্ন টাইমস্*। কিন্তু একবার এই হলে একটা ছবি দেখতে গিয়ে যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল, তা ভোলার নয়। ছবিটার নাম ছিল *কমান্ড ডিসিশান।* আজ আর মনে নেই কারা ছিলেন এর অভিনেতা (কোনো অভিনেত্রী যে ছিলেন না, এটা বেশ মনে আছে)। মার্জারি প্রেম দেখে দেখে চোখ পচে যাচ্ছিল, তাই একটা মারদাঙ্গা ছবি দেখার খাতিরেই যাওয়া আরকি! হলের সামনে যুদ্ধ-যুদ্ধ ভাবের পোস্টার দেখে হৃষ্টচিত্তেই ঢুকেছিলুম হলে। কিন্তু বিমানঘাঁটির একটা ঘরে পাঁচ ইয়াংকি বৈমানিকের সংলাপের আর যেন শেষ নেই—শত্রুপক্ষের ঘাঁটি কী করে আক্রমণ করা যাবে, তারই প্ল্যান চলছে মুখে মুখে। কিন্তু বাচালদের কথা আর শেষ হয় না—আধঘণ্টা ধরে ওদের প্যাঁচাল শুনে শুনে দর্শকদের প্রাণ অতিষ্ঠ। এরপর মদীয় সম্পাদিত *রূপছায়া*-র ১৯৫৮ সালের ফাইল থেকে অগ্রজ মঈদ-উর-রহমানের সমালোচনা থেকে বাকিটা: "থার্ড ক্লাস ও ইন্টার ক্লাসের দর্শকবৃন্দ সমস্বরে চীৎকার কোরে উঠলো—'অই অই ...লার পো'রা, কত ওয়া ওয়া করবি? গরের থে' বাইর অ' জলদি।' কী আশ্চর্য! মনে হলো পর্দার অভিনেতারা এদের ধমক শুনতে পেল। পাঁচজন সৈনিক ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হলো। আমরাও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

"যাক, এবার একটা ফাইটিং-টাইটিং একটা কিছু অবশ্যি হবে। পরের দৃশ্যে দেখা গেল সৈনিক পাঁচজন পাঁচটা বোমারু বিমানে আসমানে চক্কর মারছে। ফ্রন্ট ক্লাসের দর্শকেরা উৎসাহের চোটে তালিয়া বাজিয়ে বলে উঠল, 'অক্ষণে মাইরপিট অইবো রে! ওই যে ওইটা (ষণ্ডাগুণ্ডা মার্কা একজন

অভিনেতা দেখিয়ে) অইল বাহাদুর।' কিন্তু হা হতোস্মি! আধ মিনিট পরেই অপর এক দৃশ্যে দেখা গেল সৈনিক পাঁচজন কোন্ ফাঁকে বোমারু বিমান থেকে নেমে আবার সেই ঘরে ম্যাপ নিয়ে প্ল্যান কোরতে বসে গেছে! চললো এরকম আরো কুড়ি মিনিট। ফ্রন্ট রো'র দর্শকেরা গেট কীপারদের উত্তেজিতভাবে জিগ্যেস করলো, 'ফাইটিন অহে না ক্যাল্লা?' গেটকীপার ঢোক গিলে বললো— 'এট্টু সবুর করেন না। এই অক্ষণেই অইব।'

"তারপরেই ইন্টারভ্যাল।

"ফ্রন্টরোর দর্শকশ্রেণী... গেটকিপার ও ম্যানেজারকে শাসিয়ে বললো, 'কিবে ফাইটিন্ অইব কবে? খেল শ্যাস্ অইলে?' ওরা জবাবে বললো, 'এই হাফটাইমের পরেই অইব।'

...মার হালারে, ধর ধর

"ইন্টারভ্যালের পর ছবি শুরু হলো।

"সেই ঘর। সেই সৈনিক পাঁচজন। সেই ম্যাপ। আর সেই ওয়া ওয়া জাতীয় আলোচনা। আমাদের বারোটা তখন। পয়সা খরচ করে পুটুস পুটুস ছারপোকার কামড় খেয়ে শেষকালে এই ছবি দেখা বরাতে ছিল? ...একটা বিতৃষ্ণার ভাব শরীরে জ্বালা ধরিয়ে দিতে শুরু করেছে, এমন সময় সিনেমা গৃহের চারদিকে থেকে আওয়াজ উঠলো, 'মার হালারে, ধর ধর।'

"কয়েকটা ঢিল গিয়ে পড়লো পর্দার গায়ে। আসল ফাইটিং শুরু হোয়ে গেলো এতোক্ষণে। আওয়াজ শুরু হলো মড় মড় মড়াৎ। ঠাস ঠুস ঠসাৎ! বুঝলাম, চেয়ারভাঙ্গা পর্ব চোলছে। কতগুলো ছোট ছেলে স্টেজে উঠে "হে ডিং ডিং" কোরে নিজেদের মধ্যে "ফাইটিন" অভিনয় শুরু কোরে দিয়েছে। ফ্রন্টরো'র দর্শকদের একদল চেয়ার-দরজা ভাঙ্গা ও পর্দা ছেঁড়ার কাজে মত্ত হলো। অপর একদল গেটকীপারদের একজনকে সোয়া পাঁচমণি ঘুঁষাঘুষি মেরে চিৎ পটাং কোরে ম্যানেজার নিধন পর্ব শুরু করার জন্যে ম্যানেজারের কামরার দিকে ধাবিত হলো। তখন ব্যাঁক-পাওয়ালা এক ম্যানেজার ছিল নিউ

পিকচার হাউসে। ...বেগতিক দেখে ব্যাঁকা-পাওয়ালা আগে থেকেই টিকিট ঘরে গিয়ে লুকিয়েছে।

"ম্যানেজারের তকদির ভাল যে ফাইটিং যখন পুরোদমে চলছে, আর নিজের ওপর আক্রমণ শুরু হবে, ঠিক সেই মুহূর্তে দুই লরী বোঝাই পুলিশ এসে হাজির। সঙ্গে সঙ্গে ছুটোপুটি ও লৌরালৌরি!"

এরপর ক্ষতবিক্ষত হলটি পুনরায় মেরামত করে চালু করতে বেশ কয়েক মাস লেগেছিল। পরে হলটি হাতবদল হয়ে চলে যায় মো. মোস্তফা নামের এক চিত্রপরিবেশকের কাছে। তিনি নাম বদলে রাখেন 'শাবিস্তান'।

এবার 'লায়ন সিনেমা'র কথা। কিশোরীলাল রায়চৌধুরীর প্রতিষ্ঠিত নাট্যশালা 'ডায়মন্ড জুবিলী থিয়েটার' বিশ শতকের গোড়ায় ঢাকার সর্দারকুলে বিখ্যাত আবদুল কাদের সর্দারের মালিকানায় চলে গেলে ওটার নাম দাঁড়ায় 'লায়ন থিয়েটার'। কাদের সর্দার এখানে শুধু নাটক মঞ্চায়ন করতেন না, নাচ-গানেরও ব্যবস্থা ছিল। চলচ্চিত্রের প্রতি দর্শকদের অধিক আগ্রহের কারণে তিনি এখানে ছবি দেখানো শুরু করেন এবং হলের নাম বদলে রাখেন 'লায়ন সিনেমা' (১৯২৭)। এই হলেই মুক্তি পায় উপমহাদেশের প্রথম সবাক ছবি *আলম আরা।*

পাঠক, এই লায়ন সিনেমার সঙ্গে জড়িয়ে আছে দুটি বিখ্যাত নাম: হামিদুর রহমান ও সাঈদ আহমদ। ১৯২৭ সালে নির্বাক যুগে হলে বায়োস্কোপের যন্ত্রপাতি বসানোর সময় ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন হামিদুর রহমান এবং ১৯৩১ সালে সবাক চিত্রের যন্ত্রপাতির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন সাঈদ আহমদ। এরা পরস্পর সহোদর ভাই ছিলেন এবং কাদের সর্দারের ভাইপো। তখন দুজনেই এরা শিশু। পরবর্তীকালে হামিদুর রাহমান বিখ্যাত হয়ে পড়েন শহীদ মিনারের অন্যতম রূপকার হিসেবে, আর সাঈদ আহমদ বিশিষ্ট নাট্যকার হিসেবে। এঁদের আরেক ভাই নাজির আহমদ ছিলেন বিবিসির বাংলা ভাষ্যকার এবং এফডিসির অন্যতম রূপকার। হারাধনের শেষ হলটি হলো 'তাজমহল'। এই হলের মালিক ছিলেন কবি শামসুর রাহমানের বাবা মুখলেসুর রাহমান চৌধুরী ও সহোদর আরিফুর রাহমান চৌধুরী। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯৩৭ সালে নারায়ণগঞ্জের 'বাণী সিনেমা'-র (পরে যা 'ডায়মন্ড' সিনেমা) অন্যতম মালিকও ছিলেন রাহমানের পিতৃদেব। দ্বিতীয় শরিক ছিলেন কাদের সর্দারের ভাই মির্জা ফকির মোহাম্মদ। কাজেই—নটে গাছটি মুড়ল, নটনটীদের নাট্যনিকেতনের কথাও ফুরোল। ফুরোতে ফুরোতে আজ কানে এসে ভাসে ইন্টারভ্যালের 'গানের বই! চাই

গানের বই!' আর সেকালের সফট ড্রিংক 'ভিমটো, দিল ঠান্ডা ভিমটো'র যুগল কলরব।

এর পর একে একে মায়া, নাগরমহল, গুলিস্তান, নাজ, বলাকা, জোনাকী, মধুমিতা, অভিসার, মুন-এর আলোয় ঢাকা আলোকিত হয়েছে। কিন্তু এরা অনেক একেলে।

ওই যে ওয়াটার ওয়ার্কস রোডের কথা বলেছি আগে, ওটার নাম ওয়াটার ওয়ার্কস এ-কারণে যে সেকালে ঢাকার বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের একমাত্র ব্যবস্থা ছিল এই এলাকাতেই। ১৮৭৪ সালের আগে ঢাকায় বিশুদ্ধ পানির কোনো ব্যবস্থা ছিল না। ঢাকার নবাব বাহাদুর খাজা আবদুল গনি নগরবাসীদের সুবিধার্থে আড়াই লাখ টাকা ব্যয়ে এই ওয়াটার ওয়ার্কস নির্মাণ করেন। তখনকার দিনের নিরিখে এই অঙ্ক বিপুল বটে। এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন তৎকালীন লাট বাহাদুর লর্ড নর্থব্রুক (এই লাটের নামে ফরাশগঞ্জ অঞ্চলে একটি পাঠাগার ও রাস্তার নামকরণ প্রসঙ্গে পরে আসব)। এই ওয়াটার ওয়ার্কসের নামানুসারেই পোস্তা, কাঁসার হাট্টা, চাঁদনীঘাট, রহমতগঞ্জ ও চুড়িহাট্টার অংশবিশেষ নিয়ে রাস্তাটির নামকরণ করা হয় ওয়াটার ওয়ার্কস রোড।

আমাদের বাড়ি থেকে বেরিয়েই যে রাস্তা দিয়ে ঢাকার আর্থিক প্রাণকেন্দ্র চকবাজারে (মোগল আমলে যা পাদশাহি বাজার নামে খ্যাত ছিল) যেতে হতো, সে তো উর্দু রোড। এই রাস্তার নাম উর্দু রোড হলো এ কারণে যে মোগল আমলে এখানে সেনাদের ছাউনি ছিল। তুর্কি ভাষায় ছাউনি বা ঘাঁটিকে উর্দু বলা হয়। যেহেতু মোগল সেনারা অধিকাংশ তুর্কি ছিল এবং ছাউনির আশপাশে ছিল তুর্কিদের আবাস, তাই এই এলাকার নাম উর্দু রোড দাঁড়ায় এবং বাজারটাও প্রথম দিকে উর্দু বাজার নামেই খ্যাত ছিল। এখানে উল্লেখ্য, ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের পাশ দিয়ে যে একটি সরু গলি উর্দু রোড থেকে যাত্রা শুরু করে চকবাজারে গিয়ে শেষ হয়েছে, ওটার নাম এই সেদিনও গির্দে উর্দু নামেই জানতুম। কিন্তু ইদানীং ওটা কমলদহ রোড নামেই বেশি খ্যাত। তবে প্রাচীন ঢাকাবাসীদের কাছে ওই রাস্তা এখনো গির্দে উর্দুই।

এই পুরো এলাকাতেই ঢাকার আদিবাসীদের বাস ছিল, যা এখনো পুরোপুরি বহাল রয়েছে কেবল আমাদের ওই কামিনীভূষণ রুদ্র রোডে এবং তার আশপাশের কিছু এলাকা একসময় হিন্দুসম্প্রদায়ের বাস ছিল। এখন তা কয়েক ঘরে এসে ঠেকেছে। একে একে সবাই পাড়ি জমিয়েছে ভারতে।

যারা টিকে গিয়েছিল, কলকাতায় ১৯৫০-এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে ঢাকাতেও তার প্রতিফলনের ভয়ে নিরাপত্তার কারণে একরকম ঝেঁটিয়ে বিদেয় হয়। এ প্রসঙ্গে একটি হৃদয়বিদারক ঘটনার কথা মনে পড়ছে। আজ আর নাম মনে নেই। আমাদের পাড়ায় সবার প্রিয় ডাক্তার বাবু যেদিন নিজে যেমন চোখের জল ফেলে তাঁর প্রাণপ্রিয় ঢাকা শহর ত্যাগ করে কলকাতায় যাত্রা করলেন, আমাদের চোখ থেকেও সেদিন কম অশ্রু বয়নি। কিন্তু যে নিরাপত্তার কারণে সপরিবারে ডাক্তার বাবু কলকাতায় গেলেন, ছয় মাস পর এক চিঠি মারফত জানা গেল, তিনি ট্রামের চাকার তলায় পিষ্ট হয়ে প্রাণত্যাগ করেছেন।

ফুল কাঁসা চকবাজারের ফুল্ল কথা

উর্দু বাজার তথা উর্দু রোডের কথা বলতে গিয়ে পুরান ঢাকার প্রাণভোমরা চকবাজারের কথা একটু ছুঁয়ে গিয়েছিলাম মাত্র, এখন সেই চক নিয়ে কিছু বলব।

মুসলমানেরা বিশ্বের যেখানেই শাসনের ঝান্ডা উড়িয়েছে, সেখানেই শহরগুলোর প্রাণকেন্দ্রে গড়ে তুলেছে প্লাজা ধাঁচের চক—আভিধানিক অর্থে বহু গৃহবিশিষ্ট চতুষ্কোণাকৃতি বাজার। ঢাকা কিংবা চাটগাঁর চকবাজারের ক্ষেত্রে তার ব্যত্যয় ঘটেনি। আপনি দিল্লি-কলকাতা যেখানেই যান, একটা চক পাবেন। আর ঢাকার চকের বয়েসও মন্দ হলো না—চার শ বছরের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে সে। এবার একদার ফুলকাঁসা সেই ফুল্ল বাজারের রূপকথা। রূপকথা বইকি! এটা ছিল অভিজাত ও ধনাঢ্য ঢাকাবাসীদের বিপণিকেন্দ্র। শুধু ঢাকাবাসীদের কথা বলি কেন, মোগল আমলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ্যে এটাই ছিল প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। এখানে পারসিক, গ্রিক, আরমেনিয়ান, ফিরিঙ্গি, কাশ্মীরি প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির ব্যবসা উপলক্ষে আনাগোনা ছিল। অনেকে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপনও করেছিলেন, যার অনেক নিদর্শন বিভিন্ন স্থান ও রাস্তার নামকরণে খুঁজে পাওয়া যায়। এই

যেমন— আর্মানিটোলা, আর্মেনিয়ান স্ট্রিট, ফরাশগঞ্জ প্রভৃতি। তখন অবশ্যি এটা পাদশাহি বাজার নামে পরিচিত ছিল। আর মোগল আমলের কথা, সে তো রূপকথাই। একবার কল্পনা করুন তো আমির-ওমরা ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের চতুষ্কোণ এই বাজারে সওদা করার দৃশ্যটি: নেকাব মুখে মহামূল্যবান অলংকার সজ্জিতা, সালোয়ার-কামিজ ও বহু বর্ণে রঞ্জিত ওড়না পরিহিতা কুলীন নারীদের খোজা ক্রীতদাস পরিবৃত হয়ে আতরের খুশবু ছড়াতে ছড়াতে কেনাকাটার দৃশ্যের পাশাপাশি ক্ষণে ক্ষণে অকারণ হাসি ও রঙিন চুড়ির রিনটিন ঝংকারের কথা ; দেশ-বিদেশের নানা বর্ণের নানা ভাষাভাষী সওদাগরদের আনাগোনার কথা—রোমাঞ্চ বয়ে যাবে দেহ-মনে। যেদিন নওয়াব মুর্শিদ কুলি খাঁ স্বয়ং পরিবারসহ সওদা করতে আসতেন, সেদিন তো আর কারও পাদশাহি বাজারের ত্রিসীমানায় যাওয়ার হুকুম ছিল না। এই মুর্শিদ কুলির হাতেই এই বাজার ১৭০২ খ্রিস্টাব্দে স্বয়ংসম্পূর্ণ আধুনিক বাজারে রূপান্তর লাভ করে। তবে মূল বাজারটা গড়ে ওঠে আরও এক শ বছর আগে—১৬০২ সালে, রাজা মানসিংহ যখন তাঁর সদর দপ্তর ঢাকায় নিয়ে আসেন, তখন। ঢাকার গুরুত্বও সেই সঙ্গে বেড়ে গিয়েছিল। ধীরে ধীরে লোকলস্কর ও স্থানমাহাত্ম্যের কারণে গড়ে ওঠে এক অবিন্যস্ত বাজার। প্রথমে বাজারটি ছোট ছিল। ১৭৩৩-৩৪ সালে নওয়াব লুৎফুল্লাহ ওরফে দ্বিতীয় মুর্শিদ কুলি খাঁ বাজারটির গুরুত্ব বুঝতে পেরে এটাকে সম্প্রসারণ করবেন বলে স্থির করেন। চারদিকে রাস্তা পরিবেষ্টিত যে বাজারটি বর্তমানে দেখছেন, এই দ্বিতীয় মুর্শিদ কুলিই তার নির্মাতা। এখন যেখানে কেন্দ্রীয় কারাগার (অনেকেরই অজানা—এখানে একটি পাগলা গারদও রয়েছে, যা ১৮১৯ খ্রি. ইংরেজদের আনুকূল্যে স্থপিত হয়েছিল), সেখানে একদা ছিল গভর্নর-নওয়াবদের সুদৃশ্য অট্টালিকা। আগেই বলেছি এই পাদশাহি বাজারে স্থানীয় ক্রেতা ছাড়াও নানা দেশের নানা জাতির বণিকেরা ভিড় করতেন। যখন কোনো রাজকুমার কিংবা রাজকীয় সম্ভ্রান্ত লোক বাজারে সওদা করতে আসতেন, তখন সহগামী নকিব আগমনবার্তা ঘোষণা করতেন এবং চোপদারেরা ব্যস্তসমস্ত হয়ে রাস্তার ভিড় সরিয়ে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের জায়গা করে দিতেন। আগত ক্রেতারাই শুধু নয়, সোৎসুক নাগরিকেরাও রাস্তার দুই ধারে শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে সম্মান দেখাত ওই অভিজাত ক্রেতাদের।

এই বাজারের পশ্চিম দিকে এখন যে সুউচ্চ মিনারসংবলিত চারতলা মসজিদটি দেখতে পাওয়া যায়, এই সেদিনও তা এত বিশাল ছিল না। মিনার

তো ছিলই না। আমাদের কালে এটা দোতলা ছিল আর তেমন সৌষ্ঠবসম্পন্ন না হলেও প্রায় মোগল আমলের মতোই অবিকৃত ছিল। বেশ পুরোনো মসজিদ—নওয়াব শায়েস্তা খাঁ তাঁর নিজ স্থাপত্যকলা প্রয়োগ করে ১৬৭৬ খ্রিষ্টাব্দে নির্মাণ করেছিলেন এই মসজিদ। মসজিদের সুমুখে কয়েকটি দোকানের ব্যবস্থা রেখেছিলেন, যাতে এসব দোকানের আয় থেকে মসজিদের সাংবৎসরিক ব্যয় নির্বাহ হয়। মজা কি, আজও দোকানগুলো বহাল আছে। বেশির ভাগই ধর্মীয় বইপুস্তকের দোকান। আমি যখনকার কথা বলছি, অর্থাৎ চল্লিশের যুগের শেষ পাদের কথা, তখন ইসলামিয়া ও এমদাদিয়া লাইব্রেরিসহ কতিপয় ধর্মীয় বইয়ের দোকান, কাগজ ও বোর্ডের দোকান এবং বাইন্ডিং কারখানা ছাড়া 'কমরেড ব্যাংক' নামক একটি দেশীয় ব্যাংক ছিল আর ছিল ব্যাংকের ঠিক নিচের তলায় একটি বিশুদ্ধ পুস্তক বিপণি। এই দোকান নিয়ে এক মজার ঘটনা জড়িয়ে আছে। এখন সেই কথা।

ফুলবাড়িয়ার জসীমউদ্‌দীন

কাছেই ফুলবাড়িয়া। এখন যেখানে রাজ্যের বাস ভেড়ে, যেখানে ডাইনোসরের ফসিলের মতো দানবাকার হতকুচ্ছিত দীর্ঘদিন অবহেলায় মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা নির্মীয়মাণ অট্টালিকার সারি, একদা এখানেই ছিল ঢাকার প্রধান ফুলবাড়িয়া রেলস্টেশন। এই পুরোনো রেলস্টেশনের পাড়াতে ভাঙচুরের এতই পরাক্রম যে আজকাল আর এলাকাটা চেনাই দায়, তা যদি অনেক কাল পরে হুট করে পা দেওয়া যায়, তাহলে তো কোনো কথাই নেই। তবে এই ভাঙচুরের পরিবর্তে শ্রী পাল্টায়নি হতশ্রী পল্লিটির।

কিন্তু এমন সুন্দর নাম ফুলবাড়িয়া—সেকালে কি একালে তার দশা কেন হাভাতে—এমন একটা প্রশ্ন আসতেই পারে। শরণাপন্ন হলাম *কিংবদন্তির ঢাকার* স্বনামধন্য লেখক নাজির হোসেনের। ঢাকার সব পল্লির নামের সঙ্গে ওই এলাকার পেশাজীবীদের সম্বন্ধ দেখাই যায়। ফুলবাড়িয়ার সঙ্গেও থাকবে, তাতে সন্দেহ কি। আমরা পর্তুগিজ পরিব্রাজক ম্যানরিকের লিখিত বিবরণে ১৬৪০ সালেও ফুলবাড়িয়া নামটি পাই। ১৭৯০-এর দিকে মহাফেজখানার কাগজপত্রে আমরা 'ফুলবাড়িয়া'র পাশাপাশি 'ফুলমণ্ডি' এই নামটিও পাই।

কিন্তু আমরা ঘেঁটে দেখেছি এখানে কোনো মোগল বাগিচা ছিল না। তবে সিদ্দিকবাজার এলাকায় একটা গলি ছিল গান্ধী গলি (নাম বদলেছে, নাকি গলিটাই লুপ্ত স্থানীয় লোকদের জিজ্ঞেস করে জানতে পাইনি। জবাব পাইনি গান্ধী গলি নামকরণের পেছনের ইতিহাস সম্পর্কেও) নামে।

তবে জানতেই হবে এমন কোনো কথা নেই। এই যেমন আমাদের এক হাসকুটে দাদুকে আমরা গান্ধী দাদু বলেই ডাকতুম। বোধকরি উনি মিষ্টভাষী ও ভারি মিশুক ও অজাতশত্রু ছিলেন বলে। তবে গান্ধীজীর যেখানে পদধূলি পড়ত, সে স্থানটি তাঁর নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ত—এটা আমাদের জানা। ১৩৩২ বঙ্গাব্দে তিনি বাংলার পথে-প্রান্তরে পাদ ভ্রমণ করেন। এই ভ্রমণ তালিকায় ঢাকাও ছিল। তিনি ৩ জ্যৈষ্ঠ ঢাকায় আসেন। এখানে তাঁর কর্মব্যস্ততার কথা আমার জানা নেই। এই গলিটার নাম বদলেছে, নাকি লুপ্ত, এ ব্যাপারেও কিছু জানা যায় না। তবে *কিংবদন্তির ঢাকা*য় নাজির হোসেন এই গলির নামকরণের একটা সূত্র আমাদের জানিয়েছেন। তাঁর কাছে জানতে পারি, ঢাকার কোনো এক ব্যক্তি ফুলের নির্যাস সংগ্রহ করে এক বিশেষ শোধন পদ্ধতিতে চম্পা, বেলী, জুঁই ইত্যাদি নাম দিয়ে সুগন্ধি (essence) তৈরি করতেন। সে সময় এই সুগন্ধি খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং বাজারে সমাদৃত হয়। তা ছাড়া তিনি গোলাপি আতর, গোলাপ পানি ইত্যাদিও তৈরি করতেন। তিনি সবার কাছে 'গান্ধী' নামেই পরিচিত ছিলেন। আর এই গান্ধী সাহেব (সাহেব হতে বাধা নেই, কারণ, গুজরাটি ভাষায় প্রধানত যারা মুদি, তাদের এই পদবি জুটত। আমাদের এই গান্ধী গুজরাট থেকে আগত—এ কথা বিশ্বাস করতে অসুবিধা কোথায়! আতরের পেশাটা সেকালে কি একালে মুসলমানদের একচেটে ছিল, এটা অজানা কিছু নয়) যে গলিতে বাস করতেন, কালে সে গলিই 'গান্ধী গলি' নামে পরিচিত হয়। অনুমান করি, এই গান্ধীর কারণে আরও অনেক আতর ব্যবসায়ী এখানে এসে জড়ো হয়েছিলেন এবং আতরের সঙ্গে ফুলের সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, একথা সবার জানা। কাজেই ফুলের ব্যবসাও চলত এখানে এই ফুলবাড়িয়া বা ফুলমণ্ডিতে, একথা ভাবাই যায়; বিশেষ করে মণ্ডি শব্দটা যেকোনো বাজারের সমার্থক। এ সবই তো অনুমানের কথা, বরং বিশ্বাসযোগ্য ওই যে স্টেশন-লাগোয়া ফুল সাহেবের মাজার—এই নামটি। ফুল শাহ নামে এক বুজুর্গ এখানে চিরনিদ্রায় শায়িত। কবে কোন আমলে তিনি এখানে এসে ডেরা বেঁধেছিলেন, বলতে পারে না কেউ। কিন্তু আজও মোম জ্বলে, আগরবাতি খুশবু ছড়ায়, আর যাদের একটু দুর্বলতা আছে, শিরনি বিলোয়।

প্রাচীনের এই লাগামছাড়া কলমটাকে ক্ষমা করবেন। বলছিলাম জসীমউদ্‌দীনের কথা। এই পল্লিতেই, স্টেশন রোডের ওপারেই, স্টেশন উজিয়ে আরও পুবে ছিল কবি জসীমউদ্‌দীনের বাসাবাড়ি। তখনো তিনি পল্লিকবি, পূর্ব বাংলা সরকারের প্রচার বিভাগে কর্মরত। জীবন শুরু করেছিলেন ১৯৩৮-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে। ১৯৪১-এ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় প্রচার বিভাগে যোগ দেন। দেশ ভাগের পর রয়ে গেলেন এই বিভাগেই। আবাসিক ইডেন কলেজ রাতারাতি হয়ে গেল সচিবালয়, আর এখানেই ছিল তাঁদের দপ্তর, যা আজও টিকে আছে।

একটা পুরোনো ঝরঝরে সাইকেলে করে সারা শহর চষে বেড়াতেন। সাইকেল ছাড়া ওঁকে ভাবা যেত না, যেমন যেত না আরেক কবি আ.ন.ম. বজলুর রশীদকে। তবে এ বাবদে রশীদ সাহেব ছিলেন এক কাঠি বাড়া—সুদিনেও এ অভ্যেসটা ছাড়তে পারেননি। শেষ বয়সে ডাক্তারের কারণে হেঁটেই চলাফেরা করতেন—কখনো গাড়ি ঘোড়া নয়, দূরত্ব যা-ই হোক। যা বলছিলাম, সেকালের দুই লাখ জনবসতির ওইটুকুন তো শহর, যার সীমানা ছিল নবাবপুর রেলগেট। ফলে কাজে-অকাজে মূল শহরে ঢুঁ মারতেই হতো কবিকে। তাই সবার চেনা ওই সরল মুখখানা। পাদচতুর চাঁদনীঘাট থেকে ফুলবাড়িয়ায় ওঁর বাড়ি পৌঁছে ক্লান্ত হাতে কড়া নাড়তেই যিনি দরজা খুলে দিলেন, তাঁকে চিনতে ভুল হলো না আমার। আমি যে প্রবেশিকা পরীক্ষার্থী, রাত জেগে পদ্যের ভিড়ে 'কবর'ও যে আমাকে মুখস্থ করতে হয়—যুগপৎ যুগলবন্দী অনুভূতি কার্যকর।

এর আগে কত দেখেছি ওঁকে ওঁর ওই নিত্যসহচর চলন্ত সাইকেলে, কিংবা সাইকেলে ঠেস দিয়ে পথচারী কোনো বান্ধবের সঙ্গে আলাপ করতে। কিন্তু সাহসে কুলোয়নি মুখোমুখি হওয়ার। কিন্তু সেদিন একেবারে কাছাকাছি, *ঝংকার*-এর জন্য একটি কবিতার আবদার নিয়ে। ফ্যাকাসে হলদে চুনকাম করা পলেস্তারা খসে পড়া নিরাভরণ ঘরটা কেমন বিষণ্ন, শীতল। মোটেই কাব্যিক নয়। ওদিকে নড়বড়ে তক্তপোশ, পাশে কেরোসিন কাঠের টেবিল ও গোটা দুয়েক চেয়ার। কবি টেবিল থেকে একটা ফুলস্কেপ সাইজের খাতা এনে আমার হাতে দিয়ে তক্তপোশে হেলান দিতে দিতে বললেন, "পড়ে দেখো, যেটা পছন্দ হয় কপি করে নিয়ে নাও।"

কিন্তু মুশকিল হলো বাংলা বর্ণমালার অবয়ব সম্বন্ধে আমার তাৎক্ষণিক দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব দেখা দিল। খাতার সাদা পৃষ্ঠায় শয়ান চরণ ও তার অক্ষরগুলো আলিঙ্গনাবস্থায় উচ্চনীচ ভেদাভেদ উপেক্ষা করে তরঙ্গায়িত চিত্তে যেমৎ

কেলিমত্ত, তাতে করে অর্থোদ্ধার দূরে থাক, বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণ ও গোপীগণের জলকেলিবিষয়ক 'আধ্যাত্মিক' জটিলতাই বৃদ্ধি করে। নিজের হস্তাক্ষর সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়ার চলতি প্রয়াসটি এভাবে ব্যর্থ হওয়ায় এবার জসীমউদ্‌দীন নিজেই এগিয়ে এলেন। বললেন, "বুঝেছি, পড়তে বোধ করি তোমার অসুবিধা হচ্ছে। তাহলে আমিই পড়ি। তুমি শোনো। যেটা ভালো লাগবে, বলবে।"

কবিতা ও ছড়া মিলিয়ে চার-পাঁচটি তাঁর ফরিদপুরী উচ্চারণে আবৃত্তি শেষে চশমার আড়াল থেকে তাকালেন আমার দিকে, "কী খোকা, কোনটা?"

"লাবলু ও ভেবলু", আমার তাৎক্ষণিক জবাব।

আমার জবাব শুনে অন্দরমহলের উদ্দেশে কাকে যেন ডাকলেন। একটি ষোলো-সতেরো বছরের ফড়িঙের মতো হালকা মেয়ে সামনে এসে দাঁড়াল, "দে তো মা এটা লিখে।"

খাতাটি নিয়ে নিঃশব্দে মেয়েটি ভেতরে চলে গেল। বিছানায় আবার হেলান দিয়ে আমার খোঁজখবর করলেন। হাতের লেখা কাগজকে ছেপে বের করার দুঃসাহসের বৃত্তান্ত শুনে বললেন, "বড়রা যে কাজে হাত দিতে সাহস পায় না, তোমরা দুভায়েতে সে কাজ করতে যাচ্ছ। এ তো খুব আনন্দের কথা। কাগজ বেরুলেই এক কপি দিয়ে যেতে ভুল করো না যেন। এ ভুলটা সবাই করে।"

এমন সময় তরুণী ঘরে ঢুকে খাতা এবং 'লাবলু ও ভেবলু'র পাণ্ডুলিপি জসীমউদ্‌দীনের হাতে দিলে চোখ বুলিয়ে কবি খসখস করে দস্তখত করে যখন আমাকে ধরিয়ে দিলেন, সমস্ত গা বেয়ে পুলকে হরষে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল সেদিন। এ পদ্য থেকে আপনাদের একটু ভাগ দিই :

পথ দিয়ে যায় লাবলু
দেখল তারে ভেবলু;
বলল, ভায়া যাও কোথায়?
নীল আকাশের ঐ মাথায়
গড়িয়ে যায় চাঁদ যেথায়
যাবে তুমি আজ সেথায়?

[ঝংকার/১মবর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৯৪৯/পৃ. ১৫]

পাঠক, জসীমউদ্‌দীনের পর্ব এখানে শেষ হলে ভালো হতো। কিন্তু এরপরের ঘটনা রটনার শিকার হয়ে অনেকের রসনার খোরাক জোগালেও পঞ্চাশ বছরের এ পারে এসে মনোলোকে পঞ্চতিক্তের স্বাদ থেকে থেকে বিব্রত করে আমায়। একজন বিবেক-মন্থর কিশোরের কাজ ছিল ওটা—এখন এইটুকুই সান্ত্বনা। কিন্তু ঘটেছিল কী?

সেকালে ঢাকাতে ফুলবাড়িয়া রেলস্টেশনের বিখ্যাত হুইলার বুকস্টলসহ যে চারটে সাময়িকীর দোকান ছিল, তার বাইরে আশুতোষ লাইব্রেরি ও বৃন্দাবন ধর বুক অ্যান্ড সন্স—এই দুটি বইয়ের দোকানেও কলকাতার পত্রপত্রিকা রাখত।

বসুমতী, *প্রবাসী*, *ভারতবর্ষ*, *রূপমঞ্চ* এসব ছাড়াও ছোটদের কাগজ *শিশুসাথী*, *রংমশাল*, *পাঠশালা*, *কিশলয়*, *শুকতারাও* আসত। কলকাতায় ঝলমলে এসব কাগজ কিনতুম। এখন তো নিজেদেরই কাগজ হয়েছে, আর তাতে আছে 'ত্রিফলার বড়ি' শীর্ষক ছোটদের বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় লেখাজোখার ওপর টকঝাল মেশানো হুল ফোটানো সমালোচনা বিভাগ। কাজেই কোনো কাগজই চোখের আড়াল হতো না। দৈনিক কাগজের ছোটদের বিভাগগুলোও ত্রিফলার বড়ির কোবরেজ মশাইয়ের চোখ এড়াতে পারত না। এড়ালেও ওঁর ভাবশিষ্য বাবলু ওই তেতো বড়ি গেলাতে সাহায্য করত। একদিন বাবলু তা-ই করলে, কোবরেজ মশাইয়ের হাতে তুলে দিলে ১৩৫৬ সালের আষাঢ় সংখ্যা (মে, ১৯৪৯) *শিশুসাথী।* তাতে ছাপা হয়েছে জসীমউদ্‌দীনের 'পথের আলাপ' নামক এক কবিতা। হুবহু 'লাবলু ও ভেবলু'—চরণে চরণে। এস্থলে কবির প্রতি রাগ করার কথা *শিশুসাথী*-র সম্পাদকের, মুদ্রিত কবিতা ভিন্ন নামে পাঠানোর কারণে। কিন্তু মাথা গরম করে বসলাম আমরা। উল্লিখিত 'অপরাধে' কোবরেজ মশাই ওরফে অগ্রজ চলবেচল চোখো তিখনি ভাষায় সমালোচনা করে বসলেন কবিকে। অগ্রজ মঈদ বরাবরই নেপথ্য ভূমিকা রাখতেন *ঝংকার*-এর সম্পাদনার ক্ষেত্রে [যে অভ্যাস তিনি পরবর্তীকালে আমাদের দুভাইয়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম বিনোদন পত্রিকা *রূপছায়া*র (১৯৫০—১৯৬০) ক্ষেত্রেও বজায় রেখেছিলেন]। কাজেই কাগজ বের করতে গিয়ে ঝড়ঝাপটা যা পোয়াবার, তা আমাকেই বইতে হতো। সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে কবির এ কাজকে অবিমৃষ্যকারিতার পর্যায়ে ফেলা যায় হয়তো; কিন্তু দেখতে হবে একজন অকালপক্ক কিশোরের কাজ ওটা গুরুজনের প্রতি। তাই ছোটো শহরের হাওয়ায় ভেসে আসে কবির ক্রোধাগ্নির ফুলকি। এড়িয়ে বেড়াই—পারতপক্ষে ফুলবাড়িয়া মাড়াইনে। 'শেষ কহে, একদিন সব শেষ হবে'—আমার বেলায়ও তা-ই হলো। শেষরক্ষা হলো না।

সেকালে বইপাড়া বলতে বাংলাবাজার আর লয়াল স্ট্রিটকে বোঝাত। পুরোনো বইয়ের জোরটা ছিল বাংলাবাজারেই। চেটোনেটো লয়ালে আশুতোষ, স্কুল বুক সোসাইটি বিল্ডিং নামাঙ্কিত ত্রিতল ভবন আজও চোখে

ভাসে। অনতিদূরে সিম্পসন রোডের মাথায় ছিল কলকাতা থেকে ব্যবসা গুটিয়ে আসা ইসলামিয়া লাইব্রেরি, বাবুবাজারে চৌমাথার ডানপাশের গলিতে ওসমানিয়া বুক ডিপো আর বাবুবাজার পুলের ওপর মখদুমিয়া অ্যান্ড আহসান উল্লাহ্ লাইব্রেরি। আরেকটি বইপাড়া ছিল চকবাজারে—ব্রিটিশ ও মোগল আমলের ছিটেফোঁটা গন্ধ তখনো পাওয়া যেত এই এলাকায়। দোতলা মসজিদের নিচে ছিল সারিবদ্ধ বইয়ের দোকান—তবে সাধারণ বই নয় মোটে, বলা চলে ধর্মীয় কেতাবের আড়ং। আহ্‌মদিয়া লাইব্রেরি, এমদাদিয়া লাইব্রেরি—এ রকম কিছু নাম আজও মনে পড়ে (হয়তো এগুলো আজও টিকে আছে)। পুব বাংলার ঘরে ঘরে এদের বই দেখা যেত। কিন্তু এ-পাড়াতে একটা সাধারণ বইয়ের দোকানও ছিল। কমরেড ব্যাংকলাঞ্ছিত সদনের নিচের তলায়। ব্রিটিশ আমলে কিছু মুসলিম বিত্তবানের চেষ্টায় গড়ে উঠেছিল এই ব্যাংকটি। যত দূর মনে পড়ে, পৃষ্ঠপোষক হিসেবে এ.কে.এম. ফজলুল হকের নামটি ছিল। কিন্তু অনভিজ্ঞতার কারণে ব্যাংকটি বেশি দিন টেকেনি। তবে তাঁর ভবনটি টিকে ছিল। বেশ উঁচুতে ছিল ভিত। কয়েক ধাপ সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতে হতো ব্যাংকে কিংবা লাইব্রেরিতে পৌছাতে হলে। এখানে বই যত না বিক্রি হতো, আড্ডা চলত তার চেয়ে বেশি—সাহিত্যের আড্ডা। আসতেন কবি ব'নজির আহমদ, ছোটো গল্পকার মবিনউদ্‌দীন আহমদ, শিশুসাহিত্যিক মোহাম্মদ নাসির আলীকেও দেখতাম কখনোসখনো। সেদিন গল্পে মজেছিলাম, হঠাৎ তোলবলে দেহে মধ্যাহ্নের তিখনি প্রহরে জসীমউদ্‌দীনের উদয়! এ যে দিনদুপুরে ভূত দেখা! বাগে পেয়ে প্রথমে বাক্যবাণ : "এই পুইচ্‌কা ছেলে, কবিতার কী বোঝো? তুমি যে লিখলা আমার কবিতাটা রদ্দি?"

"কিন্তু এটা তো আর আমাদের কথা নয়—অন্য পত্রিকার সমালোচনা, আমরা উদ্ধৃতি দিয়েছি মাত্র।" আমার কথা শুনতেই চান না তিনি। আমি এক কথা বলি তো তিনি দশ কথা শুনিয়ে দেন, "সেদিনকার পুচকে ছেলে—গা টিপলে দুধ বের হয়—আমার সঙ্গে পাইজামি?" তাতেও ঝাল মেটে না। এবার তিনি হস্তবান, আস্তিন গুটিয়ে। মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়েন আমার ওপর—রীতিমতো হাতাহাতি। কবি ব'নজির স্থানীয় লোক হিসেবে তাঁর দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে ব্যর্থ হন। তখন দোকানের মালিক ও আরও দু-তিনজন সুশীল ভদ্রজন কবির বেগবান মুষ্টিকে অর্ধপথে ব্যর্থ না করে দিলে নির্ঘাত আমাদের উভয়ের কপালে রক্তপাত ছিল সেদিন।

তবে ওই যে বলে : 'পিরীত ভাঙলে বিচ্ছেদের আগুন নেভে না।'

কথাটা মিথ্যে নয়। পরের বছর বৈরী ভাবটা দূর হয়ে আমরা আবার কাছাকাছি হলাম বটে, তবে আগের সেই উষ্ণতা ছিল না। ট্রেনের কামরায় পাশাপাশি বসেও। ১৯৫০-এর কথা। চারু ও কারুকলা ইনস্টিটিউটের দ্বিতীয় বর্ষের পড়ো তখন আমি। বার্ষিক প্রমোদ ভ্রমণে বেরিয়েছি আমরা। লক্ষ্য, ময়মনসিংহ হয়ে মধুপুর। এর আগের বছর কাটিয়েছি মুন্সিগঞ্জে পদ্মার বালুচরে। এবারও আমরা স্কুলের সবাই—স্যারদের মধ্যে জয়নুল আবেদিন, কামরুল হাসান, সফিউদ্দিন আহমদ, আনোয়ারুল হক, খাজা সফিউদ্দিন প্রমুখ এবং ছাত্রদের মধ্যে যত দূর মনে পড়ে আমিনুল ইসলাম, হামিদুর রহমান, সতীর্থ রশিদ চৌধুরী, কাইয়ুম চৌধুরী, মুর্তজা বশীর, আবদুর রাজ্জাক, জুনাবুল ইসলাম, এমদাদ হোসেন, খালেদ চৌধুরী ও আলতাফ মাহমুদ এবং অতিথিদের মধ্যে কবি জসীমউদ্‌দীন ও গায়ক আবদুল আলীম। এখানে বলে রাখা ভালো, শেষোক্ত ছাত্র দুজন ও আমি আঁকিবুঁকি শেষ না করেই চারুকলা ছাড়ি। খালেদ তো দুবার ছাড়ল—ওই ১৯৪৮-এ, যেবার স্কুলটা প্রথমবারের মতো খুলল, তখন একবার ভর্তি হয়ে মাস ছয়েক পরে 'ভাল্লাগে না' বলে চলে যায়। তারপর আমার সতীর্থ হয়ে আসে পরের বছর। কিন্তু স্যারদের 'ভাবনা নিয়ে মরিস কেন খেপে'—এই প্রশ্নের উত্তর না দিতে পেরে ভক্তকুলের দেওয়া 'গুরু' খেতাব নিয়ে জন্মের মতো বিদায় নেয়। আলতাফ মাহমুদের জীবনে তখনো 'গাবার মতো হয়নি কোনো গান'। কী কারণে পলাতক হলো জানা নেই। তবে একাত্তরে মরে গিয়ে অমর হয়ে রইল 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি' সুরারোপের মধ্যে। আর আমি তো আমি। যেদিন সফিউদ্দিন স্যার আমার ডক্কির পেছন থেকে উঁকি মেরে বললেন, "বাঃ বেড়ে এঁকেছ তো—আকাশটা সবুজ, ঢেউগুলো নীল আর গাছগুলো সব লাল", সেদিনই বুঝতে পেরেছি ছবি আঁকা আমার কম্মো নয়।

...আলতাফ মাহমুদ

এবার ফিরে যেতে পারি ময়মনসিংহের ট্রেনে, চারুকলার জন্য সংরক্ষিত কামরায়। "গাও না আলিম, এই তো সময়,' জসীমউদ্‌দীনের আবদার।

আলিমের আবার 'গলা বসে গেছে', 'মুড নেই' ইত্যাকার বাতিক ছিল না, অর্ডার বুঝে ডেলিভারি :

ঘাটে লাগাও রে নাও
কূলে লাগাও রে নাও।
আমি চিনা লই, বেপারীরে,
নাও ঘাটে লাগাও রে।

দুলকি চালে চলে আমাদের মিটারগেজ রেলগাড়ি, আর মুর্শিদা গান ফেলে ঘোরে। আর কী? আর রেল দোলে, দোলেন কবিবর, দুলি আমরা সবাই। আর ভাবের ঘরে দুলকি চালে একই রোল :

বাইলাম নৌকা ঘাটের ধারে ঘাটে নাহি পাইলাম রে কূল,
এই গাঙে ভাসায়েরে দিছি আমার সোবর্নের ফুল
—রে নাও ঘাটে লাগাও রে।

চোখবোজা জসীমউদ্‌দীনের ভাবের ঘোরের অঙ্গভঙ্গি এখনো চোখে ভাসে। আর ভাসে মধুপুরের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর খামারবাড়ির জ্যোৎস্নাস্নাত আঙিনার অলৌকিক দৃশ্যটির কথা। আহা রে, ভুবন ভাবনের কত আয়োজন! মোড়ল বাড়ির নৈশ ভোজান্তে প্রলম্বিত খোশ-গপ্‌পো অকস্মাৎ জারি গান হয়ে নেচে যায় :

হায় কাছেম চলিল রণে হাতে বান্ধি কঙ্কনা,
শিরে বান্ধি সেহেরা, মেন্দির দাগ তো গেল না।

'হায়! হায়! গেল না! গেল না!' গাইতে গাইতে নিজের ধুয়ো তুলে জসীমউদ্‌দীনের সে কী পাগলপারা উদ্দান্ত নৃত্য! ওঁর অনির্বচনীয় প্রভাব সমবেত প্রায় সবার মাঝে সঞ্চারিত।

তারপর কী হলো?

এই শোকে আফশোস করে কান্দে বিবি সকিনা,
জিন্দিগি ভরিয়া পতি আর তো দেখা হল না।

অঘ্রান মাসের জোনাকি পোকার নিশুতি আদরিণী রাত, কুয়াশার চাদর মুড়ি দেওয়া রহস্যমদির শশিপ্রভা, আঙিনায় কাটা আমন ধানের প্রাণকাড়া সুবাস, শশিভালিনী বৃক্ষ সকল, ঠারেঠোরে ভুবন ভাবনের উপস্থিতি আর বৃষ্টির পানি ধোয়া শীতল উঠোনের মাতৃ-অঙ্কে উদ্বাহু জসীমউদ্‌দীন! গাইছেন, পাক দিচ্ছেন, উৎক্ষিপ্ত মুদ্রা ও উত্তরী ঈশ্বরপ্রাপ্তির আকুলতায় কী অস্থির! তালে তালে আরও অনেকেই—মাদল নেই, একতারা নেই, বাঁশি নেই, খঞ্জনি? তাও না! না!

তবু জারি গান, তবু নাচ। তবু উৎক্ষেপ। তবু কম্পন। তবু জাগরণ। তবু উল্লম্ফন। তবু উতরোল। তবু গো-শালে গাভি ও বৃষের উৎখাত কেলি! তবু...তবু...তবু...।

শাহ সুজার আমলের কথা। ঢাকার জনৈক নওয়াব তাঁর অধস্তন হিন্দু আমলাকে একটি মসজিদ নির্মাণের আদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু নওয়াব নাজিম ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে তিনি নওয়াব প্রদত্ত অর্থে নির্মাণ করেন এক মন্দির। তাতে প্রতিষ্ঠা করেন বাসুদেবের এক বিগ্রহ। কিন্তু ঘটনাটি সুবেদারের কানে যেতে হিন্দু আমলার বিরুদ্ধে শাস্তির ব্যবস্থা না করে প্রতিমা সরিয়ে ফেলে নিরাকার সৃষ্টিকর্তার উপাসনালয় হিসেবে মসজিদে পরিণত করার পুনরাদেশ দেন। যে কারণে মসজিদটির আদল বহু দিন মন্দিরের মতোই ছিল। এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে এর আকৃতির পরিবর্তন সাধন করা হয়। এই পরিবর্তন-পরিবর্ধন কালে মাটি খুঁড়তে গিয়ে বাসুদেবের একটি মূর্তি পাওয়া গিয়েছিল। এতে একটা জিনিস পরিষ্কার হলো, হিন্দু আমলা তার জেদ বজায় রেখেছিলেন সব কুল রক্ষা করেই—বহিরঙ্গে মসজিদ বটে অন্দরে বাসুদেবের অধিষ্ঠান! কিন্তু এই যে মন্দির থেকে মসজিদে রূপান্তর—এর জন্য সেকালে কোনো সাম্প্রদায়িক অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। কারণ, হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে ছিল সম্প্রীতি। এক হিন্দু আমলার যথাযোগ্য বিচার ও শাস্তি—এই আলোকেই সমগ্র বিষয়টি দেখেছিলেন তৎকালীন সজ্জন হিন্দুসমাজ। ধর্মকে অযথা টেনে আনেননি। আজকাল এমনটা ভাবাই যায় না। এই শতাব্দীর গোড়া থেকে নিরন্তর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং সাম্প্রতিক বাবরি মসজিদ নিয়ে যা ঘটছে, তা তথাকথিত এই বিংশ শতাব্দীর সভ্য সমাজের জন্য কলঙ্কজনক। এই ঐতিহাসিক এবং বলা চলে এই কাহিনির নায়ক উদ্ধারপ্রাপ্ত বাসুদেবের অতঃপর কী হল—এ কৌতূহল আপনাদের স্বাভাবিক। ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন তখন জে.টি. র‍্যাংকিন (এঁর নামানুসারেই ওয়ারীর র‍্যাংকিন স্ট্রিট)। তিনি বাসুদেবের বিগ্রহটি সংগ্রহ করে তাঁর কালেক্টরির সম্মুখে সবার প্রদর্শনের জন্য রেখে দেন। এই অবস্থায় ওটা ওখানে বহু দিন ছিল। বর্তমানে বিগ্রহটি কোথায় আছে, সে সম্পর্কে জাদুঘর কর্তৃপক্ষ বলতে পারবেন ভালো।

আসুন, আমরা আবার ফিরে যাই চকবাজারে। চকবাজারকে মোটামুটি বলা চলে পাইকারি বাজার। এখানে সাধারণ ক্রেতার চাইতে পাইকার বণিকদের আনাগোনা বেশি। গ্রামেগঞ্জে যে বেদেনিরা মনোহারি জিনিসপত্র

বিক্রি করে থাকে, তাদের অনেকেরই দেখা মেলে এই বাজারে। এই বেদেনিদের নৌকোর একটা বহর চাঁদনীঘাটের কাছেই সারা বছর দেখতে পাওয়া যেত। বেদে-বেদেনিদের ব্যবসা পাটে ওঠায় ওদের আর তেমন দেখা মেলে না আজকাল। পুব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ—যেদিক দিয়েই ঢোকেন না কেন, বাজারের ভেতরে শতমুখী অলিগলি সাপের মতো এঁকেবেঁকে মিলেছে ফের ওই মূল সড়কেই। ভেতরে ঢুকলে মনে হতো ছিটেফোঁটা মোগল আমলেই ফিরে গেছি বুঝিবা। ঢাকাইয়া উর্দু বোল এবং মনোহারি জগতের একটা প্রাণকাড়া সুবাস বইত চারদিকে। কিন্তু একদিন সেই সুবাস ধোঁয়ায় হারিয়ে গেল। এখন সেই কথা।

১৯৪৯-৫০ সাল হবে। মাসটা ফেব্রুয়ারি কি মার্চ—একেবারে মনে নেই। রাত ১০টা-১১টার দিকে হঠাৎ শোরগোল শুনে বাড়ির সবাই সচকিত। গোলটা ওই চকবাজারের দিক থেকে। রাস্তায় বেরিয়ে লোকমুখে শোনা গেল, আগুন লেগেছে বাজারে। দাউদাউ করে জ্বলছে দোকানপাট। ছুটলাম উর্দু রোড ধরে। যত কাছাকাছি হচ্ছি লোকের ছোটাছুটি হাঁকাহাঁকি তত বাড়ছে। পাড়ার ভোলাও ছুটছে। বাড়ির রকে উৎকণ্ঠিত কথাসাহিত্যিক মবিনউদ্দীন আহমেদ। *ঝংকার*-এ লেখালেখির সুবাদে ওঁর সঙ্গে পরিচয়। ওঁর ডেরা উর্দু রোডের ওপরেই। স্বাস্থ্যহীন চির রুগ্ণ মবিনউদ্দীন ঘরকুনো লোক। একটু ভীতুও
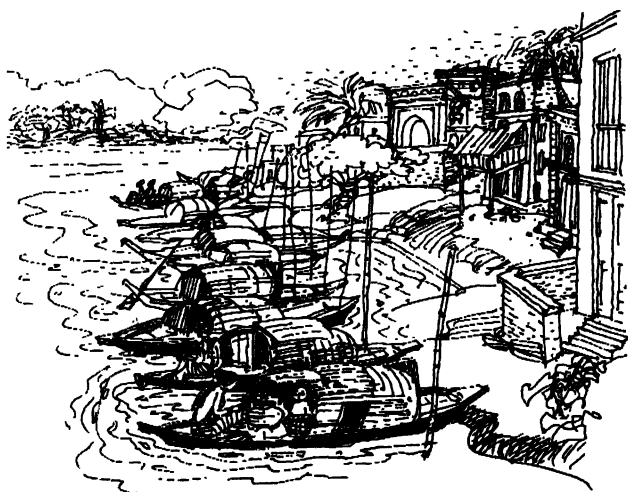
..বেদেনিদের নৌকার একটা বহর..

বুঝিবা। ওঁর বাড়ি থেকে ঢিল ছোড়ার দূরত্বেই অগ্নিদগ্ধ চকের খবর নিচ্ছেন আমারই কাছে : কিহে, কিছু বুঝলে? আগুনটা লাগল কী করে?

ততক্ষণে আমরা আলহামরা রেস্টুরেন্টের কাছে এসে গেছি। ছেলেবেলায় কলকাতায় নিমতলা ঘাটে চিতার আগুন দেখেছি, দেখেছি তার লেলিহান শিখা। কিন্তু এত বড়, এত জায়গাজুড়ে আগুনের দোর্দণ্ড প্রতাপ! বিশ্বাস হচ্ছিল না চোখকে। দাউদাউ জ্বলছে চকবাজার। সম্রাট নিরোর রোমের কথা মনে পড়ে গেল। কেউ বললে, আলহামরার উল্টো দিকে যে বাখরখানি ও তন্দুরের দোকান, সেখান থেকেই আগুনের সূত্রপাত। কেউ বলছে উনুন থেকে, কেউ বলছে বিদ্যুতের শর্টসার্কিট থেকে। কিন্তু ওর জন্ম যেখান থেকে যে উপায়েই হোক না কেন, আগুনের শিকলভাঙা এমন রাঙা মূর্তি সাতজন্মে দেখিনি। সত্যি তা-ই, রাঙাও এত ভয়ংকর! রাস্তার ধারের কিছু দোকানপাটের জিনিসপত্র পশারিরা সরাতে পারলেও বাজারের ঘিঞ্জি অন্দরমহলে ঢোকার কারও সাধ্যি হলো না। বালতি বালতি পানি ছিটানো হলো; কিন্তু তা সমুদ্রে বিন্দুর মতোই মনে হলো। ঢাকাতে তখন গ্যাণ্ডারিয়া অঞ্চলে এবং সিম্পসন রোডে ফায়ার সার্ভিসের প্রধান আড্ডা। আর পলাশী ব্যারাকে ছোটখাটো একটা ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু এদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা সেদিন রক্ষা করতে পারেনি চকবাজারকে। পুড়ে পুড়ে ছাই হয়ে গেল একদা মোগল আমলের পাদশাহি বাজার। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ভস্মীভূত হয়ে গেল কোটি কোটি টাকার পণ্যসম্ভার। পুড়ল শত বণিকের ভাগ্য। এরপর বছরজুড়ে ধীরে ধীরে আবার গড়ে উঠল চকবাজার। এবার কারও কারও ঝুপড়ির জায়গায় উঠল দালান—সংখ্যাধিক্যে কিন্তু কাঁচা ঘরই রইল বজায়। তবে আগুনে ঝলসে যাওয়ার পরে যে বাজারটি ছিল অক্ষত, সে তো ইফতারির বাজার। এই বাজারে মুখরোচক এমন কোনো সুস্বাদু খাবার নেই, যা বিক্রি না হতো। বাজারটা বসত মসজিদের (এই শতাব্দীর গোড়ায় শায়েস্তা খান নির্মিত এই একতলা মসজিদটি তিন গম্বুজমণ্ডিত ছিল। বর্তমানে তা চারতলায় দাঁড়িয়েছে, সেকথা তো আগেই বলেছি) দিকের রাস্তায়, আজও যার জৌলুশ কমেনি একরত্তি। বরং লোকের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় পশারির সংখ্যা বেড়েছে। বেড়েছে মজাদার খাবারের সংখ্যা। খাবারেও রঙের কত বাহার! তার ওপর আছে তো রংবেরঙের চাঁদোয়া। শুধুই কি রোজাদারদের আনাগোনা! শিশু-বালক-বালিকাদেরও কলরব সেখানে। এ যেন খাদ্যদ্রব্যের মেলা। পুরো রমজান মাসে এই এলাকায় যানবাহন চলাচল একেবারে বন্ধ থাকত। এখনো সেই নিয়ম প্রবহমান।

চকবাজারের ইফতারির মেলা

কিন্তু চকবাজারের ইফতারি মেলার কথা এত অল্প কথায় সারা যায় না। কারণ, ঢাকার ঐতিহ্যের মধ্যে এটা বিশেষ এক উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে। ভূ-ভারতে এর তুলনা মেলা ভার। মুখরোচক খাবারের এত আইটেম হতে পারে, তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস হবে না আপনার। আজকাল তো শুনি শতগুণ বেড়েছে। প্রাচীন কোনো বৃদ্ধকে জিজ্ঞেস করুন, তিনি বলবেন: ইফতারির এত মজা আর কোথায় পাবেন! নবাবি আমলে রমজান মাসে নাকি পেস্তা, বাদাম, দুধ, জাফরান এবং আরও কত কি মেশানো শরবত খাওয়ানো হতো মিনিমাগনা পথচারী রোজাদারদের! যত পাও, তত খাও। কিন্তু সোনার চেয়ে দামি সেই জাফরানও নেই আর সেই নবাবি শরবতের স্বাদও নেই। তার পরও যা টিকে আছে, যে খেয়েছে, সে বারবার ছুটে যায় ওই চকবাজারে। আমার বেশ মনে পড়ে, তিরিশ-চল্লিশের যুগে কলকাতায় মহররমের সময় ট্রাকবোঝাই শরবত পূর্ণ পিপে থেকে ওই জাফরান-পেস্তা মেশানো শরবত পথচারীদের খাওয়াতে দেখেছি। আমার জিভে না অমৃতই ঠেকত!

যেসব মুখরোচক খাবার সেকালে কি একালে খদ্দেরদের বিশেষ করে আকর্ষণ করে থাকে, তার মধ্যে সিরমল পরাটা প্রধান। এই পরোটা চিনি মেশানো ঘিয়ে ডোবানো থাকে। ডুবন্ত ঘি থেকে উঠিয়ে পরিবেশন করা হয়। আজকাল ঘি, দুধ ও পরোটা তৈরির অন্যান্য উপকরণের দাম চড়া হওয়ায়, বিশেষভাবে অর্ডার দিলেই এই পরোটা মুখে রোচে। এ ছাড়া বোঁদের চেয়ে বড় চিনির রসে ডোবানো রসবড়ি, দুধের মালাই দিয়ে তৈরি মালাই দুধ; ফুলকো চাপ দিলে ঝুর ঝুর করে ভেঙে যায় ক্রেসবুন্দিয়া নামে পরোটা; এক থেকে দুই কেজি ওজনবিশিষ্ট বড় জিলিপি, গজা, দইবড়া, পেস্তা শরবত; কিসমিস, পেস্তা বাদাম, কুচি, আঙুর, কলা, খোরমা; মালাই, দুধ অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে বরফের গুঁড়ো দিয়ে পরিবেশন করা হয় ফালুদা। এ ছাড়া রয়েছে বেলের শরবত, তোকমা দুধের সরবত, লাচ্ছি, মাঠা; বিভিন্ন রকম কাবাবের মধ্যে সুতি কাবাব, শামি কাবাব, নার্গিস কাবাব, জালি কাবাব, শিক কাবাব, খিরি কাবাব, গুর্দা কাবাব, বটি কাবাব, কচুরি, ফুলো পুরির মতো খাজলা, ডিম পিঠা, সবজি পিঠা আর চাপড়ি, যা চালের গুঁড়ি পানিতে ভিজিয়ে ভেজা গুঁড়ির সঙ্গে কাঁচা মরিচ, ধনেপাতা, পুদিনা পাতা প্রভৃতি সহযোগে গরম তাওয়ায় ঢেলে রুটির আকার নেয়, দেখতে যেমন সুন্দর, খেতেও ভারি মজা। ঢাকার স্থানীয় বাসিন্দারা ২০ ও ২৭ রোজায় বিশেষ করে চাপড়ি খেয়ে থাকেন।

এ ছাড়া 'বড় বাপের পোলায় খায়' নামে ৮০-৯০ বছরের ঐতিহ্যধারার এই অদ্ভুত আইটেমটি একটিমাত্র দোকানে পাওয়া যায়। শুধু রোজার মাসেই তৈরি হয়। এই দোকানের মালিক মো. সালেকিন বলেন, '৮০ বছর আগে আমার দাদা কামেল মিয়া প্রথম এই সুস্বাদু খাবারটি তৈরি করেন। এরপর আমার বাবা জানে আলম মিয়ার হাত ধরে আমি তৈরি করি—আর কেউ জানে না এর তৈরির রহস্য। মুরগির মাংস, কলিজা, মগজ, ডিম, মাংসের কিমা, বুটের ডাল, আলু ভাজি, চিঁড়ে ভাজা, সুতি কাবাব, ঘি, দারচিনি, এলাচ, জায়ফল, জয়ত্রী, মেথি, কালোজিরা, গোলমরিচ, জৈতুনসহ বিভিন্ন প্রকার মসলার মিশ্রণে তৈরি হয় বড় বাপের পোলায় খায়। এর উচ্চ মূল্যের জন্য (প্রতি কেজি ১৮০ থেকে ২০০ টাকা) এই আইটেমের এমন নামকরণ।'

এবার মতিন খান জিনু ও বশীর আহমাদের কাছে শুনুন 'ইফতারির ডালা'র অভিনব কথা :

ঢাকাইয়া 'ইফতারির ডালা'র কথা অনেকের কাছে গল্পের মতো মনে হতে পারে। বিয়ের প্রথম বছর কিংবা পানচিনি হওয়ার পর যদি রমজান মাস

আসে, তবে অবশ্যই ইফতারির ডালা পাঠানো হয়। এটা বিয়ের ডালা থেকে আলাদা। অনেকেই ট্রাকভর্তি করে ইফতারির ডালা পাঠান। এই ডালা নিয়ে অনেকের সঙ্গে আলাপ হলো। বিভিন্নজন বিভিন্ন উপমা দিলেন ইফতারির ডালা সম্পর্কে। তবে তাদের দেওয়া উপমার সঙ্গে অনেকটা মিল পাওয়া গেল পুরান ঢাকার বংশাল এলাকার এক প্রভাবশালী পরিবারের গৃহকর্ত্রী মিসেস সোলাইমানের সঙ্গে কথা বলে। আসলে যার যার সামর্থ্য অনুযায়ী ইফতারির ডালা পাঠানো হয়। ট্রাকভর্তি ডালা পাঠানোকে আমি অপচয় মনে করি না। কারণ, কনেপক্ষ বা বরপক্ষ থেকে আগেই জানিয়ে দেওয়া হয় কোন দিন ডালা পাঠানো হবে। কারণ, ডালার ইফতার (বর বা কনেপক্ষ) তারা তাদের আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীর মধ্যে বিতরণ করে। তাই এটাকে অপচয় বলা ঠিক নয়। ঐতিহ্য বলা ঠিক। তবে কিছু কিছু জিনিস ডালায় অবশ্যই থাকতে হয়; যেমন—আর সব ফলের সঙ্গে কিছু মৌসুমি বিশেষ ফল—পাংখিচুংখি (ছোট বুন্দিয়ার মতো লাল-সবুজ রঙের অত্যন্ত টকজাতীয় দেশি ফল), লটকন, পানিফল, মাখনা (ঝিল, হাওর-বাঁওড়ে হয়)। মাখনার ওপরের অংশ সবুজ কাঁটাযুক্ত। খোসা ছাড়ানোর পর ভেতরে কালো মতির মতো গোল ও শক্ত অসংখ্য দানা থাকে। প্রতিটি দানাই পাতলা আবরণ দিয়ে ঢাকা থাকে। আবরণটি সরিয়ে দানাটি ভাঙলে ভেতরে সাদা অংশ (চুনের মতো সাদা) খাওয়া হয়। ডেউয়া ফল (ওপরের আবরণ পাতলা, ওজন ২০০ গ্রাম থেকে দেড় কেজি পর্যন্ত। হলুদ আবরণটি ভাঙলেই ভেতরে কাঁঠালের মতো কোষ পাওয়া যায়। স্বাদ হালকা টক-মিষ্টি), পায়নালা (অনেকে এটাকে টিপাফল বলে। টিপে টিপে নরম করে খেতে হয়, তা না হলে টক ও কষ কষ লাগবে), বনখই (পায়নালার মতোই, তবে বুন্দিয়া আকৃতির, মালা গেঁথে বিক্রি করা হয়), লটকন, চালতা, জলপাই, খেজুর, কতবেল, বেল, বিলেতি গাব (লাল গাব), দেশি গাব, খোরমা, কামরাঙা প্রভৃতি।

সবজির মধ্যে : কচুর লতি, শজনে, বেগুন, মিষ্টিকুমড়া, বিভিন্ন রকমের শুঁটকি, অন্য আরও কিছু যার যার সামর্থ্য অনুযায়ী।

ইফতার আইটেমের মধ্যে : বড় বাপের পোলায় খায়, রসবড়ি, সিরমল পরাটা (ঘি চিনির সিরায় ভেজানো), ছোট পুরি মাংসের বড়া (ডাল, শুঁটকি, মসলা—প্রথমে তেলে ভাজা হয়, কিছুটা শক্ত হলে ঠান্ডা করা হয়, পরবর্তীকালে আবার তেলে ভেজে লাল করা হয়। ঢাকাইয়া এই ইফতার আইটেম চকে পাওয়া যায়), বড় জিলাপি, ক্রেসবুন্দিয়া, পায়েস (বিশেষ ধরনের মাটির খোরায়) পাওয়া যায়। আরও অনেক কিছু তো থাকেই।

এ ছাড়া মুরগির কাবাব, যা কয়লার তাপে পোড়ানো হয়; জালি কাবাব, নার্গিস কাবাব, গরু ও খাসির চপ, গ্লাসি (খাসির বুকের চাপের মাংস দিয়ে তৈরি, তবে ঝোল থাকে), আস্ত খাসির রোস্ট, মাছের কাবাব, সুতি কাবাব, খিরি ও খাসির গুর্দা ভাজা, হালিম, ফালুদা, মালাইয়ের লাচ্ছি, তেহারি, মোরগ পোলাও, রেজালটা (মুরগি ও খাসির), কোপ্তা পোলাও প্রভৃতি। আরও অনেক আইটেম আছে...।

আমার কৈশোর কালের চোখে চকবাজারকে মনে হতো হারুন অর রশিদের বাগদাদ।

আরেক মজা এই চকবাজারকে ঘিরে। ঢাকার আদিবাসীদের, যাদের আমরা ঢাকাইয়া বলি, তাদের কারও বিয়ে হলে বরকে এই চকবাজার প্রদক্ষিণ করতেই হতো। চক্কর শেষে তবে বিয়ের মজলিসে। আমাদের পাড়ার কত বিয়েতে এ ব্যাপারটা দেখেছি। যদি দুলহা দরিদ্র হতো, তাহলে রুমাল মুখে পাগড়ি পরে পায়ে হেঁটে, অল্প বিত্তবান হলে ঘোড়ায় কি রিকশায় চড়ে, বিত্তবান হলে জুড়িগাড়িতে রাজপুত্তুরটি হয়ে চকবাজারের চারদিকে চক্কর দিত—কেউ এক চক্কর, কেউ দুই চক্কর, আবার হিন্দুশাস্ত্রমতে সপ্তপদী গমনের মতো সাতচক্করও দিত কেউ কেউ। এই পাক দেওয়ার সময় বাদ্যযন্ত্রের বাদন ও বরযাত্রীদের আনন্দকোলাহলে চকবাজার যেন মায়াবী মোগল আমলে ফিরে যেত। এই যে চক্কর, এই চক্করজুড়ে দুলহাকে হাজার বার সালাম ঠুকে যেতে হতো উৎসুক পথচারীদের—বিবাহ মজলিসে হতো যার ক্ষান্তি।

এই চক্কর দেওয়ার ব্যাপারটির সঙ্গে মুসলমানদের আরেকটি অনুষ্ঠানও জড়িয়ে আছে, আর তা হলো খতনা। এই খতনা (যাকে অনেকেই 'মুসলমানি'ও বলে থাকেন) অনুষ্ঠানটি পূর্ণাঙ্গ হতো না, যদি খতনা করা ছেলেকে মিছিলসহকারে চকে চরকির মতো চক্কর না দেয়ানো হতো। এ স্থলে ধনী-নির্ধননির্বিশেষে ঘোড়ায় চড়ে ছেলেকে প্রদক্ষিণ করতে হতো। একজন প্রবীণ আত্মীয়ের কোলে বসা পাগড়ি পরিহিত সুবেশধারী ছেলেটিকে মনে হতো রাজকুমার বুঝিবা! দুলকি চালে ঘোড়া চলে, এগিয়ে চলে আনন্দোচ্ছল মিছিল, তারই সঙ্গে পা মিলিয়ে চলে ঢাকি ও সানাই বাজিয়ের দল। ভারি সুন্দর দেখাত।

এই চকবাজারই ছিল ওই সাতচল্লিশ-আটচল্লিশ কালের যাত্রী বহনকারী 'টাউন সার্ভিস' নামে খ্যাত বাসের দুই টার্মিনালের একটি, অন্যটি ছিল সদরঘাট। কুল্লে দুটি বাস চলাচল করত এই একমেবাদ্বিতীয়ম রুটে। একটি

ছাড়ত সদরঘাটে থেকে চকবাজারের দিকে, অপরটি চকবাজার ত্যাগ করত সদরঘাট অভিমুখে। এদের কোনো সময়সূচি ছিল না। যতক্ষণ পর্যন্ত তিল ধারণের জায়গা অবশিষ্ট থাকত, ততক্ষণ পর্যন্ত তিরিশ দশকের মডেলবিশিষ্ট ফোর্ড বাস দুটির ভেঁপুর আর্তনাদে এবং কন্ডাক্টরের মুহুর্মুহু 'চকবাজার চকবাজার', 'সদরঘাট সদরঘাট' আহ্বানে চকবাজার ও সদরঘাট এলাকার নিস্তব্ধতা খান খান হয়ে ভেঙে যেত। যাওয়া যেত হয়তো ঘোড়ার গাড়িতে কিংবা রিকশায়। কিন্তু অল্প ভাড়ায় এবং দ্রুত পাড়ি জমাবার মোহে চাপা হতো বাসে। বাস যাত্রীবোঝাই হতে অনেক সময় আধঘণ্টা থেকে চল্লিশ

..সদরঘাট-সদরঘাট...

মিনিট এবং তেমন দুর্ভাগ্য হলে এক ঘণ্টাও লেগে যেত। কোনো সময় দেখা যেত যে রিকশা ও ঘোড়ার গাড়ি চকবাজার ছেড়ে সদরঘাট অভিমুখে যাত্রা করেছে, ফিরতি পথে দেখা হয়ে যেত চকবাজার থেকে সদ্য যাত্রা করা বাসের! বাসের ভাড়া ছিল এক আনা। রিকশার ভাড়া ছিল চার আনা। তবে শেয়ারে গেলে দুআনাই পড়ত। ঘোড়ার গাড়িতে ভাড়া ছিল যাত্রীপ্রতি দুআনা। গাড়ির ভেতরে চারজন এবং কোচোয়ানের পাশে একজন বসত। এই কোচোয়ানের পাশের সিটটি আমার খুবই প্রিয় ছিল। হাওয়া খেতে খেতে ঢাকা শহর চেখে দেখার এমন মনোরম ব্যবস্থা আর কোথায় পাব! অনেক সময় তেমন জরুরি হলে ঘোড়ার গাড়ির পেছনে যে পাদানি, তাতেও

যাত্রী বহন করা হতো। ওদিকে সদরঘাট থেকে নবাবপুর রেলগেট পর্যন্ত যে শহরের সীমানা, সেখানে পরিবহনব্যবস্থা ছিল ঘোড়ার গাড়ি ও রিকশা। ভাড়া চক-সদরঘাটের অনুরূপ। পঞ্চাশের দিকে ওই রুটেও বাস চলাচল শুরু করে। রেলগেটের ওপারে সবুজে ঘেরা পল্টন তখন নগরসভ্যতার অগ্রাভিযানে থরহরি কম্পমান। একটা-দুটো করে বাড়ি মাথা তুলছে, মাথা তুলছে *গুলিস্তান* প্রেক্ষাগৃহ ব্রিটানিয়াকে হারিয়ে দিয়ে। জিন্নাহ এভিনিউয়ের (এখনকার বঙ্গবন্ধু এভিনিউ) রাস্তা চওড়া হচ্ছে আর তলিয়ে যাচ্ছে বুদ্ধদেব বসুর প্রাণমাতানো সবুজ পল্টন।

ঢাকার সীমিতসংখ্যক রাজপথে যানবাহন বলতে ঘোড়ার গাড়ি ও রিকশাই ছিল প্রধান। হঠাৎ হঠাৎ ধূমকেতুর মতো দু-একটি প্রাইভেট গাড়ির দেখা মিলত। এদের মধ্যে *বেবি অস্টিন, মরিস মাইনর ও ফোর্ড* অন্যতম। কিন্তু যে গাড়িটি আমার দৃষ্টি কাড়ত, সেটা নবাব বাড়ির কোনো এক সদস্যের ফোরডোর 'ন্যাশ'। খুব স্মার্ট ও ফুলবাবু মনে হতো—এখনকার বিচারেও। রাস্তা দিয়ে যখন যেত, মনে হতো একটা রাজহাঁস যেন নিঃশব্দে দুলকি চালে এগিয়ে যাচ্ছে। যদি ওটা আজও ভিন্টেজ হিসেবে বেঁচেবর্তে থাকে কারও গ্যারেজে (নবাববাড়ির সঙ্গে যুক্ত 'ডিয়েনফা মটরস' বলতে পারবে ভালো), তাহলে ২০০৩ মডেলের আধুনিক গাড়ির পাশে ন্যাশকে খুব একটা বেমানান *ঠেকবে* না বলেই ধারণা করি।

...সুনসান বইপাড়া

তো বাস কি ঘোড়ার গাড়ি সদরঘাটের পাঁচ মাথার মোড়ে থামতে না-থামতেই নেমে পড়তাম। সদরঘাট মানেই আনন্দধনি। সুনসান বইপাড়া। আশুতোষ লাইব্রেরি, বৃন্দাবন ধর বুক অ্যান্ড সন্স, আলহামরা লাইব্রেরি—আরও কত সারিবদ্ধ নাম। কলকাতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া কিশোরের আত্মিক যোগাযোগ ঘটে এই তীর্থে এসে। *শিশুসাথী, শুকতারা, কিশলয়, রামধনু, পাঠশালা* প্রভৃতি শিশু পত্রিকার উষ্ণ সান্নিধ্য ঘটে, সান্নিধ্য

ঘটে কিরীটী, সুব্রত, রাজু এবং বিমল কুমার ও সুন্দর বাবুর সঙ্গে আর দীনেন্দ্রকুমার রায়ের রবার্ট ব্লেক ও স্মিথের সঙ্গেও। এই পাড়াতেই ছিল ঢাকার সবচেয়ে উঁচু ভবন—চারতলা কুমিল্লা ব্যাংক, যেখানে ঢাকার একমাত্র লিফটটি বহু দেহাতির কাছে ছিল এক অপার বিস্ময়। এই আজব গাড়ি, যা শূন্যে ওঠে, আবার ধরিত্রীর বুকে নেমে আসে! কাছে থেকে দেখার লোভ হলে গোঁফওয়ালা লিফটম্যান কর্তৃত্বের সুরে বলত, “ভাগো ইধারসে।” অগত্যা (ঢাকার একমাত্র) ফুটপাতে দাঁড়িয়ে হাঁ করে দেখত মাথা উঁচু করে ওপরে উঠে যাওয়া লিফটকে আর চোখ বড় বড় করে বলত, “দ্যাহো দ্যাহো মনুর মা, আসমানের দিকে উঠবার লাগছে উড়াজাহাজের লাহান।” আবার নেমে আসতেই বলে উঠত, “বাপ্পুস রে, কেমুন মাছরাঙ্গার লাহান তরতরাইয়া নামল!”

জনসন রোড ও বাংলাবাজারের মোড়ে ছিল ব্যাপটিস্ট মিশনের রিডিং রুম। এই রিডিং রুমের আশপাশে কলকাতার কলেজ স্ট্রিট থেকে আসা কিছু কলকাতিয়ার পুরোনো বইয়ের দোকান ছিল। দোকান মানে রাস্তার ধারে বইয়ের পশরা সাজিয়ে বসত ওরা। এদের মধ্যে কয়েকজনকে কলকাতা থেকেই চিনি। এরা আমার মনের ক্ষুধা মেটাতে কম সাহায্য করেনি। রোববার রিডিং রুম বন্ধ থাকলে ওটার সিঁড়ির ধাপে বসত কালোকিষ্টি রহমত মিয়া। ওর একটাই আক্ষেপ, এখানে যেমন বই নেই, তেমনি ক্রেতাও নেই। এই এলাকাটাকে বলা চলে বিদ্যাপল্লি। জুবিলি স্কুল, মুসলিম হাইস্কুল, কলেজিয়েট স্কুল, সেন্ট গ্রেগরি স্কুল, সেন্ট জেভিয়ার্স গার্লস স্কুল, পোগোজ স্কুল, জগন্নাথ কলেজ, ইসলামিয়া মাদ্রাসা, লেডি ডাফরিন গার্লস স্কুল, ন্যাশনাল মেডিক্যাল স্কুল—এই এতগুলো বিদ্যাপীঠ নিয়ে যে পল্লি তাকে বিদ্যাপল্লি না বলে উপায় আছে' তারপর বইপাড়াটাও তো এখানেই—বাংলাবাজারের যেখানে নর্থব্রুক হল রোড শেষ হয়েছে, ওই মোড় পর্যন্ত লাইব্রেরি ও খাতাপেনসিলের দোকান সারি সারি। একটু উজিয়ে নর্থব্রুক হল পাঠাগার আর এদিকে স্কুল বুক সোসাইটির উল্টো দিকে ব্রাহ্মসমাজ ও তার সাধারণের জন্য উন্মুক্ত পাঠাগার। এই শান্ত নিরুপদ্রব এলাকাটি পড়ালেখার জন্য যথার্থ স্থানই ছিল। আজকের কোলাহলমুখর সদরঘাটের সঙ্গে যার কোনো মিলই নেই।

সবুজ আলোর দেশ : রমনা

পুরান ঢাকায় অনেক দিন ঘুরছি। একটু খোলামেলা হাওয়া আর আকাশ দরকার। 'কচি লেবুপাতার মতো নরম সবুজ আলোয় পৃথিবী ভরে' গিয়েছে যেখানে, 'কাঁচা বাতাবীর মতো সবুজ ঘাস—তেমনি সুঘ্রাণ' যার ভুবন—ওই রমনার কোলে। এই যে প্রাচীন ঢাকা থেকে পালাবার ইচ্ছেটা, এটা উসকে দিয়েছে গত অধ্যায়ে পাঠকদের নবাবপুর রেলগেটে নিয়ে গিয়ে ওপারের সবুজ পল্টনের কথা ছুঁয়ে যাওয়ায়। বুদ্ধদেব বসুর পুরানা পল্টনের ঘাসে মাখা উন্মুক্ত মাঠ তখনো খুব একটা বদলায়নি। ১৯২৮-৩১ সালের পল্টনের যে বিবরণ পাই ওঁর বিখ্যাত ব্যক্তিগত নিবন্ধ 'পুরানা পল্টন'-এ, বলা চলে, তার প্রায় পুরোটাই পেয়েছিলাম আমরা ওই ১৯৪৭-৪৮ সালেও। বুদ্ধদেব বাবুর আরেক গ্রন্থ *আমার ছেলেবেলাতেও* রয়েছে এই পুরানা পল্টনকে ঘিরে এই অসাধারণ বর্ণনা :

> "আমরা প্রথম যখন পুরানা পল্টনে এলাম তখন এবড়োখেবড়ো মাঠের মধ্যে ছড়ানো-ছিটানো তিনটি মাত্র বাড়ি উঠেছে, আরও দু-একটা নির্মীয়মাণ। সবগুলোই... দালান—শুধু আমাদেরটাই নয়। উত্তরে অনেকখানি জমি ছেড়ে দিয়ে দক্ষিণ ঘেঁষে লম্বা একটি টিনের ঘর তুলেছেন দিদিমা, ইটের পাঁচিলে ঘিরে দিয়েছেন। ঘরটি তিন কামরায় বিভক্ত, সামনেরটায় আমি থাকি।...আমাদের পুবে-উত্তরে

বনজঙ্গল—অনির্ণেয় গ্রাম—আর দক্ষিণে তাকালে চোখ চলে যায় রেললাইন পেরিয়ে নবাবপুরের প্রথম কয়েকটি বাড়ি পর্যন্ত—ঝাপসা—দুপুরবেলার রোদ্দুরে যেন কাঁপছে।"

আমার প্রথম দেখা ৪৭-৪৮-এর ঢাকার পুরানা পল্টনে তিনটে নয়, ছড়ানো-ছিটানো আরও বেশ কিছু কাঠাবাড়ি দেখেছি। দেখেছি এখন যেখানে গৃহ নির্মাণ সংস্থার বাড়ি, তারই পেছনে বুদ্ধদেব বাবুদের টিনের বাড়িটি, যার মেঝে ছিল পাকা। যে বাড়িতে চৈত্র মাস এলেই বাতাসে উড়িয়ে নিয়ে যেত বুদ্ধদেবের টেবিলের তাবৎ কাগজপত্র, আর নিবিয়ে দিত সন্ধেবেলার কেরোসিন-ল্যাম্প।

রমনার আগে তাহলে পল্টনকে ঘিরেই কিছু কথা বলা যাক। এলাকাটি বৃহত্তর দিলকুশার চৌহদ্দির মধ্যে পড়েছে। এই দিলকুশার মধ্য দিয়ে খালের মতো একটা ছোট নদী কুলকুল শব্দে বয়ে যেত একসময়। নাম ছিল মতিঝিল। আমরা যখন ঢাকায় আসি, তখন ওই খাল বা ঝিলের অস্তিত্ব একেবারে যে ছিল না, বলব না। পুরো দিলকুশা-মতিঝিল এলাকা তখন সবুজ ঘাসে মোড়া বিরান এলাকা। এই যে খাল, এটা কোনো প্রাকৃতিক খাল ছিল না। ইসলাম খাঁর দূরদর্শিতার ফলে তাঁরই আদেশবলে নৌপরিবহন ও ময়লা পানি নিষ্কাশনের লক্ষ্যে ঢাকার বুকে দুটি কৃত্রিম খাল কাটা হয়েছিল—একটি তো ধোলাই খাল, যার যাত্রা শুরু হয়েছিল বুড়িগঙ্গার বাবুবাজার থেকে। বাবুবাজারের পুল (এখন তো খালও নেই, পুলও নিশ্চিহ্ন) পার হয়ে খালটা এরপর জিন্দাবাহারের উত্তর দিকে প্রবাহিত হয়ে তাঁতীবাজারের পাশ দিয়ে গোয়ালনগর, নবাবপুর ও নারিন্দা রোড অতিক্রম করে জালুয়ানগর ঘুরে শরাফতগঞ্জ হয়ে লোহারপুলের নিচ দিয়ে যথাপূর্বং বুড়িগঙ্গার অঙ্কে। ১৯৫৫ সালে একবার ভারী বন্যা হয়েছিল। আমাদের জিপসি ডেরা তখন নারিন্দার ১১৩ নম্বর শরৎগুপ্ত রোডে (পূর্বে এ রাস্তার নাম ছিল দয়াগঞ্জ রোড এবং বাড়ির নম্বর ছিল ১৪৫)। বন্যার পানি ধোলাই খালের কূল ছাপিয়ে পুরো নারিন্দা এলাকায় ঢুকে পড়েছিল। আমাদের বাহন ছিল তখন নৌকো। সে-কথা পরে বিশদভাবে বলা যাবে। এখন দ্বিতীয় খালের কথা। তাঁতীবাজার ও মালিটোলা থেকে দ্বিতীয় সংযোগ খালটি বংশাল রোড পেরিয়ে সুরিটোলার পশ্চিমে ঘুরে নাজিরা বাজার ও দেওয়ান বাজার অতিক্রম করে নিমতলী হয়ে শাহবাগ ও রমনা গ্রিন (মোগল আমলের বাগ-ই-বাদশাহি) ধরে প্রবাহিত হয়ে সেগুনবাগিচা, পুরানা পল্টন, মতিঝিল পুল পার হয়ে মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকার পেছন দিক অতিক্রম করে পুবদিকে চলে গিয়েছিল। আমরা ঢাকাতে এসে ধোলাই খালের পুরোটাই

পেয়েছিলাম। তবে দ্বিতীয় খাল সম্পর্কে বলা যাবে না তা। যেটা এখন নয়াবাজার এক্সটেনশন এবং নর্থ সাউথ রোড এক্সটেনশন, সেটাই খাল ছিল আর এটা পুরোনো রেললাইনের কাছে এসে নগরসভ্যতার আক্রমণে থমকে গিয়েছিল। ফাঁকফোকরে নিমতলীর আড়ালেআবডালে খালটা জীবিত ছিল। তারপর সেগুনবাগিচা, গুলবাগ ও পুরানা পল্টনে এই সেদিনও বড় বড় অট্টালিকা ওঠার আগে ঝুপড়ি ও ঘরবাড়ির আড়ালে ধুঁকে মরতে দেখেছি কচুরিপানায় আকণ্ঠ ডোবা খালটাকে। মতিঝিলের যে অঞ্চল এখন আরামবাগ, সেখানে আজও একরত্তি কচুরিপানা আক্রান্ত বিষণ্ণ জলাশয় রয়ে গেছে। এখনো খালের ওপারে ঠাকুরপাড়া যেতে হলে নৌকো পারাপার করতে হয়। ৪৭-৪৮-এ এই গ্রামাঞ্চলের মাঝ দিয়েই বয়ে যেতে দেখেছি ওই ঝিল তথা খালকে। বর্তমানে যেখানে নটর ডেম কলেজ, এটা ছিল এই এলাকার শেষ গ্রাম। আজও চোখে ভাসে সবুজ ঘাস ও ধানখেতের পটভূমিতে মতিঝিলের জল-টলমল খালের ধারে কলাগাছের জানালার ফাঁকে ফাঁকে কান্না ভেজা কুয়াশার মাঝে নিঃসঙ্গ কতিপয় মায়াবী কুটিরের ছবি। আহা, অর্ধশত বছর আগের ওই ঘাসের ঘ্রাণ মাখা নিসর্গের কোলে যদি আবার ফিরে যেতে পারতাম! শহরের মাঝে 'অনেক কমলা রঙের রোদ' মাখা কলাগাছের ছায়াঘন পল্লবের আড়ালে লুকোনো স্বর্গ—ভাবলেও পাওয়া হয়ে যায়।

মনে পড়ে যায় বড় ভাইয়েতে আমাতে মতিঝিলের এই নির্জন ধু-ধু প্রান্তরে সাইকেল চালানো শেখার কথা। বড় ভাই প্যাডেলে পা রেখে যখন বলতেন, "ছেড়ে দে, একাই পারব"—এঁকেবেঁকে কিছুদূর গিয়েই যখন হতেন পপাত ধরণিতল, আমার সেকি হাসি! আমার বেলায়ও ওই হাসি ফিরিয়ে দিতে কার্পণ্য করতেন না অগ্রজ। আমাদের প্রাণখোলা অট্টহাসি দিলকুশা গার্ডেনের নোনাধরা প্রাচীন প্রাচীরে প্রতিধ্বনিত হয়ে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ত। এই যে দিলকুশা গার্ডেনের কথা বললাম, এটা তো বাগ-ই-দেলখোশ। এর সীমানা ছিল বর্তমান পুরো দিলকুশা বাণিজ্য এলাকা ও বঙ্গভবন। নবাব স্যার সলিমুল্লাহ প্রভুভক্তির নিদর্শন হিসেবে এই এলাকাটি ইংরেজদের দান করেছিলেন। এই বিশাল এলাকার মাঝে ছিল একটি নিঃসঙ্গ অসংস্কৃত দোতলা বাগানবাড়ি—ইংরেজদের চিত্তবিনোদনের আখড়া। শুনেছি, মনোহর বাগান ছিল একসময়। আর এই বাগানবাড়িতে চলত টুপভুজঙ্গদের চোহেলের রইরই কিন্তু অযত্নলালিত পদ্মপাতা ভারাক্রান্ত মস্ত সরোবর এবং বিক্ষিপ্ত শ্রীহীন গাছপালা ও শণগাছে ভরপুর ভাঙা প্রাচীর দিয়ে ঘেরা ওই রহস্যময় আচাভুয়ো বাগানবাড়ি ছাড়া আমার চোখে আত্মহারা হওয়ার মতো কিছু নজরে পড়েনি।

আরও ১০ বছর পিছিয়ে ১৯৩৫-৩৬ সালে মতিঝিল-বিধৌত দিলকুশা যে পাখি শিকারিদের স্বর্গ ছিল, তা সৈয়দ নাজমুদ্দীন হাশেম আমাদের জানিয়েছেন। দশ কি এগারো বছরের বালক নাজমুদ্দীন তাঁর বাবার সঙ্গে পাখি শিকারিদের দলে ভিড়ে গিয়েছিলেন ওই ঝিলে। কেউ ঝিলের পাড় থেকে আবার কেউ বা নৌকো করে ঝিলের মাঝে গিয়ে কী করে পানিফলের পাতার ওপর হেঁটে বেড়ানো সবুজ আর পলিশ করা পিতলের রঙের হলুদ ঠোঁটো জোড়া পাখি শিকার করা দেখলেন, তার এক চিত্তাকর্ষক বর্ণনা দিয়েছেন তিনি মদীয় ত্রৈমাসিক পত্রিকার পক্ষী সংখ্যায়।

প্রাচীনের এই দোষ। পল্টনের কথা বলতে গিয়ে চলে গিয়েছি আরেক পল্লিতে। তবে মজা কি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আমলে এই পুরানা পল্টন (নয়াপল্টনসহ) ও দিলকুশা জুড়েই ছিল বিশাল ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর ছাউনি। তখন এই এলাকাটি গার্ড বাজার হিসেবে পরিচিত ছিল। সেনানিবাসের মাঝে বাজার থাকায় জনসাধারণের অসুবিধে হওয়ায় ১৮৪০ সালে সরিয়ে নিয়ে বর্তমান ঠাটারীবাজারে অপসারণ করা হয় এই বাজার। এই পল্টন এলাকায় আজকের যে তোপখানা রোড—এই রাস্তার নামকরণের পেছনেও রয়েছে ওই কোম্পানির অবদান। এখানে ছিল কোম্পানির গোলন্দাজ বাহিনীর এক অস্থায়ী আস্তানা। একসময় গোলন্দাজ বাহিনী অন্যত্র চলে গেলেও নামটি থেকে যায় স্থায়ীভাবে! একই কথা খাটে পল্টন এলাকা সম্পর্কে। পরবর্তীকালে সেনা ছাউনিটি প্রথমে রমনা রেসকোর্স (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) এবং পরে মিরপুরের বেগুনবাড়িতে স্থানান্তরিত হলেও পুরো এলাকাটি আজও পুরানা ও নয়াপল্টন নামেই পরিচিত হয়ে আসছে।

এত কিছু বলা হলো অথচ পল্টন ময়দানের কথা বলা হলো না। বায়তুল মোকাররম থেকে শুরু করে স্টেডিয়াম পাড়াসহ পুরো গুলিস্তান এলাকাই ছিল ঘাসে মোড়া হরিৎস্বর্গ—পল্টন ময়দান। প্রাণহরণ করা ওই ঘাসের ভেতর ঘাস হয়ে জন্মাব আরেক জীবনে, এমন সাধও হতো। মাঝে মাঝে ওই ঘাসের কোলে ছড়ানোছিটোনো কিছু গাছের কথাও মনে পড়ে—হবে তা কৃষ্ণচূড়া, নাকি আর কোনো গাছ? এই পল্টনেই ছিল ঢাকার তাবৎ ফুটবল ক্লাব এবং ক্লাব ঘিরে ঢাকা স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশন তথা ডিএসএ টেন্ট। এই ডিএসএ নিয়ন্ত্রণ করত ঢাকার ফুটবল, ক্রিকেট ও হকি লিগ এবং বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। ডিএসএর ছিল নিজস্ব যেনতেন টিনঘেরা মাঠ—এখন যেখানে স্টেডিয়াম, ঠিক সেইখানে। মাঠের ভেতরে মাত্র এক ধারে ছিল তিন চার সারি কাঠের গ্যালারি। মনে আছে, এই সাদামাটা মাঠে খেলতে এসেছিল

আমেরিকান এক রাগবি ফুটবল দল। স্থানীয় চ্যান্সারি ও ইউসিসের কিছু লোক নিয়ে গড়া দুটি দলের রাগবি খেলা দেখা হয়েছিল। দুধারে আকাশচুম্বী গোলপোস্ট (তখন তা-ই মনে হতো) তৈরি করা হয়েছিল। এই অভিনব গোলপোস্ট, প্রায় ডিম্বাকার বল আর দুদলের ১৫+১৫=৩০ জন খেলোয়াড়ের হাতে-পায়ের রোমহর্ষক মারামারি ও হুটোপুটি খেলার চপটে সেদিন পল্টনের উন্মুক্ত আকাশ অবোধ দর্শকদের করতালি ও চিৎকারে মুখরিত হয়ে উঠেছিল। ঢাকার দর্শকদের জন্য সে এক অভিজ্ঞতা বটে। তবে রাগবি খেলা আমার

...হুটোপুটি খেলার চপটে...

জন্য কোনো নতুন অভিজ্ঞতা ছিল না। তিরিশ ও চল্লিশের দশকে কলকাতায় রাগবি দেখা সারা। কলকাতায় তো রাগবির জন্য ক্যালকাটা কাপ-ই ছিল। ১৮৭৯ সালে ব্রিটিশনিয়ন্ত্রিত ক্যালকাটা ক্লাব এই কাপটি উপহার দেয়। কোনো স্থানীয় রাগবি টিম না থাকায় এই প্রতিযোগিতায় খেলত কেবল ইংল্যান্ড ও স্কটল্যান্ডের দলগুলো। বার্ষিক যে খেলা হতো, তার বিজয়ীকে এই ট্রফি উপহার দেয়া হতো। বুঝি বা না-বুঝি দেখেছি তো সেই খেলা। ওই যে, হুটোপুটির ব্যাপারটা ছিল তো—একজন বালকের জন্য ওটা কম আকর্ষণের বিষয় ছিল না।

কথা হচ্ছিল ডিএসএকে নিয়ে। এই অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে ফুটবল লিগ ও রোনাল্ডসে শিল্ড পরিচালিত হতো। গুরুত্বপূর্ণ খেলাগুলো হতো ওই টিনঘেরা ডিএসএ গ্রাউন্ডে। অন্যান্য খেলা হতো বিভিন্ন ক্লাবের নিজস্ব

খোলামেলা উদোম মাঠে। প্রথম বিভাগ লিগে যেসব ক্লাব খেলত, তাদের কিছু নাম আজও উজ্জ্বল হয়ে আছে মনের পটে : ইস্ট পাকিস্তান জিমখানা, ডিসি মিল, ভিক্টোরিয়া ক্লাব, ঐতিহ্যমণ্ডিত ওয়ারী ক্লাব, ঢাকাইয়াদের নিজস্ব ওয়ান্ডারার্স ক্লাব, ইবিআর ক্লাব, মোহামেডান স্পোর্টিং, পুলিশ এসি—এই সব। আমরা ছিলাম জিমখানার সমর্থক। কারণ, খুব পরিচ্ছন্ন ছিল এদের খেলা, খেলোয়াড়েরাও। উপরন্তু, এই দলে ছিলেন কলকাতা থেকে আগত কিছু খেলোয়াড়। এঁদের মধ্যে ভবানীপুর-মোহনবাগান-মোহামেডান স্পোর্টিং খ্যাত খালেক (সম্পর্কে আমার পিতৃব্য) অন্যতম। এই খালেক কাকুর অপূর্ব নৈপুণ্যের কারণেই ১৯৪৯-এ লিগ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল জিমখানাই। কিন্তু ঢাকার জনপ্রিয় কালেক্টর ও ম্যাজিস্ট্রেট রোনাল্ডসের নামে প্রবর্তিত রোনাল্ডসে শিল্ডের খেলায় ওই বছর জিমখানা ভালো খেলতে পারেনি। পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থান থেকে আগত তিরিশটি দলের মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি খেলার মাঝামাঝি সময়ই বিদায় নেয়। বিদায়ী দলগুলোর সঙ্গে জিমখানাও। তবে মনে পড়ে সেবার (১৯৪৯) সবচেয়ে উত্তেজনাকর ও প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক খেলা হয়েছিল ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ও কলকাতা থেকে ভাড়া করা খেলোয়াড়সমৃদ্ধ খুলনা দলের খেলা। পর পর দুই দিন খেলা হওয়ার পরও এই শ্বাসরুদ্ধকর ম্যাচের জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হয়নি। শহরের তাবৎ ঢাকাইয়ার তো বটেই, আমাদের মধ্যেও চরম উত্তেজনা—কে হারে কে জেতে—কলকাতাসমৃদ্ধ খুলনা, না ঢাকা! শেষ পর্যন্ত তৃতীয় খেলায় কিন্তু হার মানতে হয়েছিল খুলনা দলকে ৪-১ গোলের বিরাট ব্যবধানে।

এবার আসুন ১৯৫০ সালের জুলাই সংখ্যা *ঝংকার*-এর 'খেলার মাঠে' বিভাগ থেকে কিছু উদ্ধৃতি দেওয়া যাক, যা সেকালের ফুটবল জগৎ সম্বন্ধে একটা ধারণা দেবে :

> "ঢাকায় আবার বছর ঘুরে ফুটবল খেলা শুরু হয়েছে। প্রথম বিভাগের খেলা একটু দেরি করেই মাঠে নেমেছে এবার। মোট ১০টি দল যোগ দিয়েছে। মোহামেডান স্পোর্টিং কিন্তু প্রতিযোগিতায় খুব কমই যোগ দিচ্ছে। এতে করে প্রতিযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা কিছুটা ব্যাহত হয়েছে বলে মনে হয়। অন্যান্য ক্লাবের একটা মহা দোষ, সবাই দেরিতে মাঠে নামে। দর্শকেরা ধৈর্য ধরে না থেকে শেষ পর্যন্ত হইচই শুরু করে দেন। এতে খেলার মাঠের মান কমে যাওয়া ছাড়া বাড়ে না।
>
> "তা ছাড়া আছে রেফারিকে প্রহার করা, প্রতিদলের সমর্থকদের অখেলোয়াড়ি মনোভাব ইত্যাদি আমাদের বাস্তবিকই ব্যথিত করে।...

> "এবার ইবিআর (ইস্ট বেঙ্গল রেলওয়ে) ও ওয়ান্ডারার্স দলের চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। গতবারের চ্যাম্পিয়ান ইস্ট পাকিস্তান জিমখানা বিশেষ সুবিধা করতে পারছে না। নতুন নতুন খেলোয়াড় ঘন ঘন পরিবর্তন করার দরুন তাদের দলের শক্তি অনেক কমে গেছে। গতবার আশা করেছিল রাজধানীবাসীরা যে এ বছর ডিএসএ মাঠটি আরও উন্নত আকারে দর্শক ও খেলোয়াড়দের অভিনন্দিত করবে। কিন্তু তার মুখে ছাই পড়েছে। আমরা বর্তমান ডিএসএ কর্তৃপক্ষকে সরকারের কাছে একটি কলকাতার Calcutta F.C. মাঠের অনুরূপ গ্যালারিসহ ঘেরাও মাঠ তৈরি করতে অনুরোধ করছি। স্টেডিয়ামের কথা উল্লেখ করা বৃথা।"

তো সেকালের আগের কাল থেকেই ঢাকা ফুটবলে কলকাতা থেকে খুব একটা পিছিয়ে ছিল না। ব্রিটিশ রাজত্বকালে বলা চলে ঢাকা ছিল কলকাতার ফুটবল খেলোয়াড়দের ভান্ডার। বহু নামীদামি খেলোয়াড় ওই সময়ের মোহামেডান, ইস্ট বেঙ্গল ও মোহনবাগানে খেলতেন, যাঁরা ছিলেন এই পূর্ব বাংলা তথা ঢাকার ফুটবল টিমের খেলোয়াড়; বিশেষ করে ওয়ারী ক্লাব ছিল খেলোয়াড় সরবরাহের এক নম্বর টিম। লন্ডন থেকে বিশ্ববিখ্যাত কোরিন্থিয়ান টিম ভারতে এসেছিল কিছু প্রদর্শনী খেলা খেলতে। সব টিমের সঙ্গে অর্থাৎ ইস্ট বেঙ্গল, মোহনবাগান ও আইএফএ টিমের সঙ্গে জয়ী এবং কলকাতা মোহামেডানের সঙ্গে ড্র করে ঢাকা এসে এই ওয়ারী ক্লাবের সঙ্গে এক গোলে পরাজিত হয়ে ভারতে কোরিন্থিয়ান টিমের অপরাজিত রেকর্ডটি ভেঙে খান খান হয়ে যায়।

বিভাগোত্তর ঢাকার ফুটবল নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে। ওই অবস্থার উত্তরণ ঘটাতে ঢাকাকে পাঁচ-ছ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল।

এই ডিএসএর ছিল নিজস্ব টিনের সুদৃশ্য চকমিলানো চকবন্দী কপাট ও টপ বারান্দাবিশিষ্ট বাংলো ধরনের চৌরিঘর বা টেন্ট, যা-ই বলুন। মাঠ থেকে একটু উঁচুতে কাঠের পাটাতনের ওপর দাঁড়ানো এই টেন্টে খেলার আগে ও পরে খেলোয়াড়, দলের ভক্তকুল ও ডিএসএর কর্তাব্যক্তিদের চলত গপপো-গুজব, যার তাল বোঝা দায় হতো। এই হাসির হররা পরক্ষণে ক্রুদ্ধ হল্লার মহাকলরবে পৌছাত। কেউ চেয়ারে হেলান দিয়ে, কেউ টেবিলে বসে, কারও মুখে ঝালমুড়ি-চিনাবাদাম, কারও মুখে সুপেয় পানীয় ভিমটো—সেকালের একমাত্র স্থানীয় সফট ড্রিংক। কতিপয় ধনবানের বাড়িতে ছাড়া তখন ফ্রিজ ব্যাপারটা ছিল অসূর্যম্পশ্যা। কাজেই ক্যাপ্টেন বাজারের বরফ কল থেকে বরফের কুচি ছিল ভরসা। ভিমটোর বোতল ছিল ওই সেকালের সোডা

ওয়াটার বোতলের মতো। ভেতরের তরল পানীয়ের রং ছিল ফান্টা, মিরিন্ডার মতো হলদেটে। ভিমটো আজ শুধুই স্মৃতি, তাই পাঠক, ভাসমান বরফের কুচিসহ ঠান্ডা ভিমটোর স্বাদ এতকাল পরও যেন পাই। আশ্চর্য রকমভাবেই ডিএসএর ওই চৌরিঘরটি আজও কিন্তু বেঁচে আছে বর্তমান রমনা ভবনের কাছেই অনেক অট্টালিকার আড়ালে, একটি পেট্রলপাম্পের পাশে। দীর্ঘদিনের অযত্নে হতকুচ্ছিত দশা আজ এই টেন্টটির। বেওয়ারিশ এই ঘরে আজ দিনে খবরের কাগজের হকারদের আড্ডা—রাতের বেলা নিশাচর নাইট গার্ড ও নাইট বার্ডদের।

যেদিন বড় দলের খেলা হতো, খেলা শেষে মাঠে শুয়ে-বসে কিংবা ডিএসএর টেন্টের ভেতরে অনেক রাত অবধি চলত গুলতানি। অদূরের বাবুপুরা ফাঁড়ি থেকে যখন রাত এগারোটা কি বারোটার পেটা ঘন্টার আওয়াজ ভেসে আসত, RITZ রেস্তোরাঁ থেকে মাতালের দল টোয়াতে টোয়াতে এবং ব্রিটানিয়া সিনেমা হলের নাইট শোয়ের দর্শকেরা যখন বেরিয়ে আসা শুরু করত, তখন একে একে ঘুমন্ত ঢাকার রাস্তাঘাট ও রাস্তাটার নেড়িকুত্তাগুলোকে সচকিত করে দিয়ে ঘরমুখো হতো ফুটবলপাগল লোকগুলো। টুকরো কথা আর উদ্দাম হাসি কেমন রহস্যময় মনে হতো তখন।

রমণীয় রমনা

রমনার কথা বলতে গিয়ে পুরানা পল্টন এবং সেই সঙ্গে মতিঝিল ও দিলকুশার কাহিনি শোনালাম এতক্ষণ। রমনার কথা আর বলা হয়নি।

এবার সেই রমনার কথা।

কলকাতা থেকে ঢাকায় এসে খুবই মুষড়ে পড়েছিলাম। বড় শহরের কোনো উপকরণই ছিল না ঢাকায়। যেদিন মনটা কোনো কারণে বিষণ্ণ থাকত, সেদিন যে হারিয়ে যাব কোথাও—আয়তনে তেমন বড় ছিল না ঢাকা। লোকের ভিড়ে, গাড়ি-ঘোড়ার জটিল আবর্তে কিংবা পার্কের সবুজে একটু লুকোবো, না, সে সুযোগও ছিল না। ঢাকুরিয়ার মতো লেক নেই, আলিপুরের মতো চিড়িয়াখানা, মিনার্ভা, শ্রীরঙ্গম, স্টার কি ন্যাট্যভারতীর মতো থিয়েটার হল নেই, নেই কোনো এলাকার অলৌকিক কোনো ভালো লাগা, নেই মেট্রো, লাইটহাউস, গ্লোব, নিউ এম্পায়ার, এলিট প্রেক্ষাগৃহের মতো সর্বাধুনিক সুখধাম। কলেজ স্ট্রিটের বইয়ের স্বর্গের কথা না-ই বা বললাম, আর গড়ের মাঠ—আহ্! ঢাকায় থাকবে কি, এই বসুমতীর কোথাও নেই!

তাহলে ঢাকার রইল কী?

রমনা!

রমণীয় রমনা—গাছে-গাছে, ফুলে-ফুলে, ঘাসে-ঘাসে রোমান্টিক রমনা। প্রথমে এলাকার নামকরণের মধ্যে ওই রমণীয় বা রমণের একটা যোগ কল্পনা করতাম। কিন্তু শব্দটি যে ফারসি, জানা গেল *কিংবদন্তীর ঢাকা*র রচয়িতা নাজির হোসেনের কাছে। রমনা মানে লন (lawn) অর্থাৎ সবুজ ঘাসে ঢাকা উন্মুক্ত জমি বা বনানী। মোগল আমলেও এই সবুজে মোড়া জায়গার একটা অসাধারণ সৌন্দর্য ছিল, যে-কারণে এর নামকরণ হয়েছিল রমনা। গোড়ায় এই এলাকার নাম ছিল মহল্লা চিশতিয়ান ও শুজাতপুর। ১৮২৪ সালে ঢাকার কালেক্টর ডাউজ সাহেব এলাকাটির সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে বাগানের নগর করার লক্ষ্যে রমনা গ্রিনের পত্তন করেন এবং নগরবাসীর বিনোদনের জন্য স্থাপন করেন রমনা রেসকোর্স (আজকে যা সোহরাওয়ার্দী উদ্যান)। ফলে বাগ-বাগিচাশোভিত এই এলাকা ঢাকার সম্ভ্রান্ত লোকের আবাসস্থলে পরিণত হয়। এর আগে বলা হয়েছে দিলকুশা, তোপখানা রোড, পুরানা পল্টন, মতিঝিল এলাকাব্যাপী যে পুরোনো ক্যান্টনমেন্ট ছিল, তা উঠে এসেছিল এই উন্মুক্ত রমনা এবং মিরপুরসংলগ্ন বেগুনবাড়ি এলাকায়। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের ফলে ঢাকা পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের রাজধানীর মর্যাদা লাভ করলে ক্যান্টনমেন্ট তৃতীয়বারের মতো উঠে যায় বর্তমান কুর্মিটোলা এলাকায়। বিস্তীর্ণ রমনা এলাকা নির্বাচিত হয় প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসেবে। আস্তে আস্তে রমনাকে ঘিরে গড়ে উঠতে থাকে 'নিউ টাউন' তথা নতুন রাজধানী। আর এই রাজধানীর সাজনদারের ভার পড়ে প্রাতঃস্মরণীয় রবার্ট লুইস প্রাউডলকের ওপর।

হ্যাঁ, উদ্ভিদপ্রেমী, উদ্যান-স্থপতি প্রাউডলক। প্রথম রূপকার যদি ডাউজ, দ্বিতীয় রূপকার প্রাউডলক। এই প্রজন্মের কথা না-ই বা বললাম, এই ঢাকা নগরের প্রাচীনদেরই বা কজনের জানা আছে এই দুটি উজ্জ্বল নাম?

ঢাকাকে উদ্যান নগর হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কর্মকাণ্ডে প্রাউডলক ছিলেন বৃক্ষশোভিত সরণি-উদ্যান নির্মাণের দায়িত্বে। পঞ্চাশের দশকের আগেকার রমনা ও সংলগ্ন এলাকায় তরুসজ্জার সবটুকুই প্রাউডলকের সৃষ্টি। বঙ্গভঙ্গ রদ হয়ে গেলে ঢাকার রাজধানী নির্মাণের পরিকল্পনাও বাতিল হয়ে যায়। ফলে প্রাউডলকের স্বপ্ন অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এই অসম্পূর্ণ স্বপ্নকে ঘিরেই বুদ্ধদেব বসুর কী উচ্ছ্বাস: "স্থাপত্যে কোনো একঘেয়েমি নেই, সরণি ও উদ্যান রচনায় নয়াদিল্লির জ্যামিতিক দুঃস্বপ্ন স্থান পায়নি।...সর্বত্র প্রচুর স্থান, ঘেঁষাঘেঁষি ঠেলাঠেলির কোনো কথাই ওঠে না।" গাছের ফাঁকে ফাঁকে পরিত্যক্ত রাজধানীর সচিবালয়, মন্ত্রীদের জন্য নির্মিত বাগানঘেরা বিলিতি ছাঁদের দোতলা শ্রীমণ্ডিত বাড়িগুলো পড়ে পড়ে ঝিমোয়।

দেড় দশক পরে ঢাকায় যখন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হলো, তখন নবনির্মিত ও অব্যবহৃত ওই প্রাণকাড়া বাংলো বাড়িগুলো যেন প্রাণ পেল। সচিবালয় হলো বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ভবন। বাংলো বাড়িগুলো বরাদ্দ হলো অধ্যাপকদের জন্য। মেয়েদের হস্টেলের জন্য যে বাড়িটি নির্বাচিত হয়েছিল, সে তো নয়নমনোহর বাগানঘেরা 'চামেরি হাউস'। আমরা যখন ঢাকায় আসি, তখন ওটা 'চামেলি হাউস' নামেই খ্যাত ছিল। বুদ্ধদেব বসুর কালে দেখছি চামাদিয়া হাউস। এটা ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের হস্টেল। ছাত্রীরা দলবেঁধে পড়তে যেত, দলবেঁধে অধ্যাপকদের সঙ্গে ক্লাসে ঢুকত। বুদ্ধদেব বাবুদের কালে যদি এরা, মানে ছাত্রীরা মায়াময়ী ছিল, তো পঞ্চাশ-ষাটের দশকেও তার খুব একটা ব্যত্যয় ঘটেনি। আমার মতে, ঢাকার তাবৎ বাড়ির মধ্যে সবচেয়ে দৃষ্টিনন্দন বাড়ি এই চামেরি (The Chummery)। সেগুনবাগিচার মোড়ে প্রেসক্লাব ও শিক্ষা ভবনের মধ্যমণি হয়ে আজও তার পূর্বের শ্রী কিছুটা হলেও বহাল রেখে এক বিদেশি এনজিওর অফিস ভবন হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

বুদ্ধদেব বসু তাঁর *আমার যৌবন* স্মৃতিকথায় এই রমনার বিবরণ দিয়েছেন এভাবে : "রেললাইন থেকে শহরের উত্তরতম প্রান্ত পর্যন্ত এর ব্যাপ্তি, উত্তর অংশটি সরকারী কেষ্টবিষ্টুদের বাসভূমি, মধ্যিখানে আছে বিলিতি ব্যসন ঘোড়দৌড়ের মাঠ, গলফ-খেলার মাঠ; আছে ঢাকার নাগরিকদের পক্ষে অপ্রবেশ্য ঢাকা ক্লাব, যেখানে মদ্যবিলাসী বল-নৃত্যপ্রিয় শ্বেতাঙ্গ রাজপুরুষ ও নারায়ণগঞ্জের পাটকল-চালক ফিরিঙ্গিরা নৈশ আসরে মিলিত হন, আর আছে কাননবেষ্টিত উন্নতচূড়া একটি কালীমন্দির, যেখানে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি অর্ঘ্য দিতে আসেন শাহবাগের মা'কে—সেই দিব্যবিভান্বিত ব্রাহ্মণী যিনি পরবর্তী কালে 'মা আনন্দময়ী' নামে সর্বভারতে বিখ্যাত হন। কিন্তু দক্ষিণ অংশটি পুরোপুরি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকারভুক্ত, সেখানে ছাত্র এবং অধ্যাপক ছাড়া ভিড় দেখা যায় শুধু শীতে বর্ষায় শনিবারগুলোর অপরাহ্নে, যখন জুয়াড়ি এবং বেশ্যায় বোঝাই খড়খড়ি-তোলা ঘোড়ার গাড়ি ছোটে অনবরত রেসকোর্সের দিকে শান্ত রমনাকে মর্দিত করে, কলেজ-ফেরতা আমাদের চোখেমুখে কর্কশ ধুলো ছিটিয়ে দিয়ে।"

ওই যে বলেছেন রেললাইনের কথা, আমাদের কালেও ছিল তো ওই রেললাইন—ফুলবাড়িয়া স্টেশনকে কেন্দ্র করে। এখন তো সেখানে হতকুচ্ছিত আন্তজেলা বাস টার্মিনাল। পুরোনো রেললাইন এই রমনা ফুঁড়েই নীলক্ষেত পার হয়ে চলে গিয়েছিল তেজগাঁওয়ের দিকে। তখনো শহরের উত্তর প্রান্ত ছিল

এই নীলক্ষেত—এরপরেই শ্রীমাখা বিস্তীর্ণ সবুজ এলাকা আর এই সবুজ গ্রামগুলোকে গুঁড়িয়ে দিয়েই তো চোখের সামনে গড়ে উঠল একে একে নিউমার্কেট ও ধানমন্ডির আবাসিক এলাকা। এই সবুজ এলাকা ভেদ করে সরু একটি রাস্তাকে দেখেছি শুধু মিরপুরের দিকে চলে যেতে।

বাংলাদেশ জন্ম নেওয়ার পর জুয়োখেলা বন্ধের আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে বাংলাদেশের রূপকার শেখ মুজিবুর রহমান ঘোড়দৌড় বন্ধ করে দিলে এই উন্মুক্ত হরিৎভুবন সহোদরা রমনা গ্রিনের পাশে গড়ে ওঠে এক উদ্যানে হিসেবে, যার নামকরণ হয় সোহরাওয়ার্দী উদ্যান। নির্ধনের জুয়ো খেলা বন্ধ হয় বটে, তবে ধনপতির জুয়ো চলে নীরবে নিভৃতে ঢাকা ক্লাবের অন্দরে পূর্বের মতোই। আর ওই যে বুদ্ধদেব বাবু বলেছেন, ঢাকা ক্লাবকে দেশীয় নাগরিকদের জন্য অপ্রবেশ্য—এবার পট পরিবর্তনের ফলে আমলা অভিজাত ও ধনপতি নির্বিশেষে ক্লাবে প্রবেশপত্র জোগাড় করার জন্য কী না আদেখলেপনা! এখানে যে তাসের জুয়োর আড্ডা বসে সেখানে মজার এক কাণ্ড ঘটে। জনশ্রুতি আছে, এক জুয়াড়ি যুধিষ্ঠিবের মতো তার 'দ্রৌপদীকে' পর্যন্ত বিসর্জন দিতে কার্পণ্য করেনি। আরেক জুয়াড়িকে নিজের পুত্রসন্তানের মৃত্যুসংবাদও জুয়ার টেবিল থেকে টলাতে পারেনি। তবে একটা কথা, জুয়ো বলেন, বিনোদন বলেন, ঢাকায় নগরবাসীদের সাপ্তাহিক গণ-উৎসব ছিল কিন্তু ওই ঘোড়দৌড়। ঢাকার ব্যবসায়ী, আদিবাসী ঢাকাইয়া এবং কলকাতা থেকে আসা কিছুসংখ্যক পাঁড় ঘোড়দৌড়প্রেমী এবং শ্বেতাঙ্গ রাজপুরুষ ও বণিক সম্প্রদায় শনিবার এল কি ছুটবে রমনা রেসকোর্সে। আমাদের জাফর ভাই, *সমকাল*-এর সিকান্দার আবু জাফর তো সর্বপ্রথম। আমিও যেতাম, খেলতে নয়, দেখতে। শনিবারের ভোরবেলা থেকেই ঢাকা ঝেঁটিয়ে ক্রিং ক্রিং শব্দ তুলে রিকশা, ছড়্ ছড়্ টগ্‌বগ্ শব্দ তুলে ঘোড়ার গাড়ির লক্ষ্য ওই রমনা। সুদূর সাভার, টঙ্গী, মিরপুর থেকেও ঢল নামত জুয়াড়িদের। এদের বলা হতো পান্টার। ঘোড়দৌড় শুরু হওয়ার বহু আগে থেকেই, বলা চলে, ভোরবেলা থেকেই, কিছু পাঁড় পান্টারকে ঘোড়ার আস্তাবলে এসে ঘোড়ার রক্ষণাবেক্ষণকারীর কাছে সেদিনকার রেসের ঘোড়ার খবরাখবর নিতে দেখা যেত। জকিদের কাছেও টিপস সংগ্রহ চলত। এখন যেখানে মুজিব হল ও জিয়া হল, এখানে, এই সেদিনও ছিল বৃত্তাকার বিশাল আস্তাবল। ভরা যৌবনে যে এই মোগল আমলের আস্তাবলটির গা ভরে উঠেছিল, তা এর বহিরঙ্গে এবং অন্দরমহলে ঢুঁ মারলেই টের পাওয়া যেত। এই উপমহাদেশের কেতা অনুযায়ী ঐতিহ্যকে ধরে রাখা নয়, ভাঙাই রেয়াজ। তাই সরকারি কলমের খোঁচায়

গুঁড়িয়ে দেওয়া হলো দিল্লির সচিবালয়ের আদলে তৈরি ভবনটি, জায়গা করে নিল ছাত্রাবাসের পাষাণপুরী। অথচ হতে পারত এটা চিত্রশালা আরও কিছু সংযোজনের মাধ্যমে। ঘুরে ঘুরে ছবি দেখার মজাই হতো আলাদা।

তো এই মোগলাই আস্তাবল যখন ঢাকা টার্ফ ক্লাবের তাঁবে, তখনকার কথায় ফিরে যাই। যদিও নিষিদ্ধ ছিল রেসের বিধানমতে—ফাঁকফোকরে চলত কথাবার্তা—ইশারা-ইঙ্গিতেও ঘোড়ার স্বাস্থ্য এবং নতুন ঘোড়া হলে তার বংশপরিচয় নেওয়া-দেওয়া চলত। এসব ঘোড়ার নামগুলোর মধ্যে আজও কিছু নাম মনে পড়ে: ফ্লাইং কুইন, ভিক্টোরিয়া, তুফানি—এই তো। তবে কলকাতার জকিদের খুব স্মার্ট লাগত। তুলনায় ঢাকার জকিদের মনে হতো জোকার। জোকারই তো—ওদের জিন্, বুট, সেফ্টি হেলমেট, ঢলকো ম্যাড়ম্যাড়ে রঙের জ্যাকেট ও যাত্রা ঢঙের ক্যাপ—সব মিলিয়ে ওদের সাজসজ্জা, যাকে সিল্ক্স্ বা কালার বলা হতো, যাত্রার সঙের মতোই মনে হতো। যে ঘোড়ার যে মালিক, তার জকির সিল্ক্স্ হতো তারই নির্বাচিত। কলকাতাতেও দেখেছি, জকিরা হালকাপাতলা হতো। এ রহস্যের উদ্ধার করেছি ঢাকাতে এসে। ঘোড়ার ওজন বুঝে জকির ওজন—গড়ন যত হালকা হবে, ঘোড়া দৌড়ুবে সেই মতো। যে কারণে সাধারণত জকিদের ওজন ১১০ পাউন্ডের বেশি হতো না। গুলি ছুড়ে রেস শুরু হতেই সে কী উল্লাস, চিৎকার ভিআইপি গ্যালারি থেকে, সাধারণ পান্টারদের মধ্যে। এখন যেখানে পুলিশ কন্ট্রোল রুম, সেখানে ছিল ঢাকা রেসকোর্সের প্রশাসনিক ভবন ও গ্যালারি। জাদুঘরের দিকে যে সারিবদ্ধ লম্বা দালান এখনো টিকে আছে, এগুলো ছিল পান্টারদের টিকিট ঘর—ছোট ছোট ঘুলঘুলি মতো কাউন্টার। এক একটা রেস শুরু হওয়ার আগে এসব কাউন্টারে সেকি হুটোপুটি! আমার এক সম্পর্কের মামা টিকিট কাউন্টারের বুকিং ক্লার্ক ছিলেন। ডাকঘরের কাজ শেষে ফি শনিবার পার্ট টাইম করতেন আর কি! পান্টারদের মা-বাপ। তো পিস্তল থেকে গুলি ছুড়ে দৌড় শুরু হতো—এক এক ফার্লং ($^{১}/_{৮}$ মাইল) দূরত্ব পেরোয়, ঘোড়ার নম্বর মিলিয়ে পান্টারদের মধ্যে সে কী উত্তেজনা! যে জিতল টিকিট দেখিয়ে প্রাইজমানি নিয়ে, যে হারল বিরস বদনে, জেদের বশে আবার টিকিট কিনে পরবর্তী দানে যায়। এ ভাবে ১০/১২টা খেলা শেষে দিন গড়ায়, সন্ধ্যা নামে। ঘরমুখো হয় বিজিত পান্টারের দল শ্লথচরণে আগামী শনিবার জেতার শপথ নিয়ে, বারবনিতাদের নিয়ে খড়খড়ি তোলা ঘোড়ার গাড়িগুলো তাদের সাপ্তাহিক বিনোদন শেষে সাঁচিবন্দর, কান্দুপট্টি ও কুমোরটুলি ছোটে অপরের বিনোদনের সামগ্রী হতে।

এই রেসকোর্সের শেষ মাথায় রমনা গেটের অদূরে ছিল রমনার কালীবাড়ি। আর এ বাড়িতেই ছিল 'শাহবাগের মা'—'মা আনন্দময়ী'। এখানে রেসকোর্সে যাওয়ার আগে জুয়াড়ি ভক্তের দল "হেই মা কালী! জোড়া বলি দিমু মা, এইবার যেন—" বলে হত্যে দিয়ে পড়ত।

১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি বাহিনী বোমার ঘায়ে গুঁড়িয়ে ফেলে এই কালীবাড়ির মন্দির বা মঠ, আর সেই সঙ্গে রমনা গেটের ঐতিহাসিক স্তম্ভ। এখন যে স্তম্ভ দেখা যায়, সেটা তো একাত্তরের পরে নতুন তৈরি।

আমি যখনই এই মঠের পাশ দিয়ে যেতাম, দেখতাম, কমণ্ডলু হাতে সন্ন্যাসী এবং ভক্তের দল কেউ কালীবাড়ির ফটক দিয়ে বাইরে আসছে, কেউ ভেতরে ঢুকছে, কেউ সামনের পুকুরে স্নান করছে। এই মঠ বেশ প্রাচীন। কত প্রাচীন, তা জানা যায়নি। শ্রী যতীন্দ্রমোহন রায় প্রণীত *ঢাকার ইতিহাস* থেকে জানা যায়, এটা দশনামী সন্ন্যাসীদের মঠ। শঙ্করাচার্য সম্প্রদায়ের গিরি পদবিধারী উদাসীনেরা এই মঠের প্রতিষ্ঠা করেন। মঠে প্রতিষ্ঠিত ছিল বাঘছাল পরিহিত চতুর্ভুজা পাষাণময়ী কালীকাদেবী। আমরা যে কালীবাড়ি দেখেছি, সেটা খুব একটা পুরোনো ছিল না। উত্তর দিকে জঙ্গলের আড়ালে ছিল পুরোনো কালীবাড়ির ভগ্নাবশেষ। পলাশীর যুদ্ধে সিরাজউদ্দৌলার রাজ্যচ্যুতির অন্যতম নায়ক এবং বলদারনীয়া-ঢাকার জমিদার মহারাজ রাজবল্লভ সেন (১৬৯৮—১৭৬৩) এই মঠটির সংস্কার সাধন করেছিলেন। ১৮৯৭ সালে ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পের ফলে মঠের শীর্ষদেশ বিধ্বস্ত হলে ১,১০০ টাকা ব্যয়ে তা সংস্কার করা হয়। এর মধ্যে সর্বসাধারণের চাঁদা ছিল ৫০০ টাকা এবং বাকি ৬০০ টাকা ঢাকা জজকোর্টের খ্যাতনামা উকিল রজনীকান্ত গুপ্ত মশাই দান করেন। কালীবাড়ির সুমুখে যে পুকুরটি ছিল, তা তৎকালীন সরকার, মতান্তরে

রমনার কালীবাড়ি

ভাওয়ালের রানি বিলাসমণি দেবীর অর্থানুকূল্যে খনন করা হয়েছিল বলে জানা যায়। নতুন কালীবাড়ির মঠটি লোহাগড়ার জনৈক রাজা নির্মাণ করেছিলেন বলে জনশ্রুতি আছে। কালীবাড়িতে দেবীর তৃপ্তির জন্য ঘটা করে বলি দেওয়া হতো প্রতি অমাবস্যায়।

একবার কৌতূহলবশে এই মঠের প্রবেশদ্বারে গিয়ে উঁকি মেরেছিলাম। কেমন একটা অদ্ভুত গন্ধ ঝাপটা মেরে গিয়েছিল চোখেমুখে। সন্ন্যাসীদের কপালে বাহুতে অঙ্কিত চন্দনচর্চিত গন্ধ কি তা? কোনো অসাধারণ দৃশ্যই চোখে পড়েনি সেদিন, কেবল প্রাঙ্গণ মধ্যে একটা মস্ত বড় পাথরের টুকরো ছাড়া। তাও হয়তো বা দৃষ্টি এড়িয়ে যেত, যদি না দেখতাম ওই পাথরখণ্ড ঘিরে সবাইকে পুজো দিতে। কেন পুজো? এই প্রস্তর পুজোর সঙ্গে জড়িয়ে আছে হিন্দু সাধকশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মানন্দ গিরির স্মৃতিবিজড়িত এক কাহিনি। এখন সেই চিত্তাকর্ষক উপাখ্যান।

ব্রহ্মানন্দ গিরি তখনো মায়ের পেটে, এ অবস্থায় হতভাগিনী জননী ডাকাতের হাতে অপহৃত হলেন। পথে এক তিলের খেতে প্রসববেদনা উঠলে ব্রহ্মানন্দপ্রসূত হন। ডাকাতদের যা মতি ও গতি, নবকার্তিককে সেখানেই ফেলে মাকে নিয়ে পালাল তারা। সংবাদ পেয়ে ছুটে গেলেন শিশুর বাবা। সস্নেহে তুলে নিয়ে এলেন বাড়ি ক্রন্দনরত শিশু পুত্রকে। দিন যায় ব্রহ্মানন্দ বড় হতে থাকেন। যত বয়েস বাড়ে, ব্রহ্মানন্দ ততই দুর্বিনীত, ভ্রষ্টাচারী ও চরিত্রহীন হয়ে পড়েন। ওদিকে মায়ের খবরটা একটু নিতে হয়। ডাকাতদের পাল্লায় পড়ে হতভাগিনী শেষ পর্যন্ত বারাঙ্গনা বৃত্তি গ্রহণে বাধ্য হন। একদিন চরিত্রহীন ব্রহ্মানন্দ ভাগ্যদোষে তাঁর মায়ের ঘরে ঢুকে পড়েন। ব্রহ্মানন্দের কপালে ছিল এক জড়ুল চিহ্ন। এই নিদর্শন দেখামাত্র মা চিনতে পারলেন ছেলেকে। বারবিলাসিনীর পরিচয় জানতে পেরে অনুতাপে দগ্ধ হয়ে ব্রহ্মানন্দ সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে যান। নিঃসঙ্গ ব্রহ্মানন্দ ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়েন জনসমাগমশূন্য রমনার কালীবাড়ি। দশনামী সন্ন্যাসীদের সঙ্গে ভিড়ে পড়েন এবং এখানেই নাম গ্রহণ করেন ব্রহ্মানন্দ গিরি। কিন্তু মন ভরল না দশনামীদের সান্নিধ্যে—তান্ত্রিক সিদ্ধি সাধনে কৃতসংকল্প হলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে মহাশক্তির অঙ্গুলিহেলনে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তাবৎ কাজ শৃঙ্খলার সঙ্গে নিষ্পন্ন হচ্ছে, যাবতীয় দুষ্কার্যও নিশ্চয় তার দ্বারাই সম্পন্ন হচ্ছে। তাঁর ও তাঁর জননীর দুষ্কর্মের প্রেরণাদাতার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের সংকল্প নিয়ে এক প্রস্তরখণ্ডের ওপর আসীন হয়ে তান্ত্রিক সাধনা আরম্ভ করেন। ব্রহ্মানন্দের কঠোর সাধনার ফলে দেবী সন্তুষ্ট হয়ে ভক্তের ইচ্ছানুক্রমে তাঁর

আসন মাথার ওপর বহন করার ভার গ্রহণে প্রতিশ্রুত হন। উমা ও তারা—এই দুই নারীর রূপ গ্রহণ করে ব্রহ্মানন্দ যেখানে যেতেন, ওই ভক্তাসন প্রস্তরখণ্ডটি ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে চলেফিরে বেড়াচ্ছে এটুকু দৃশ্যমান হতো। এভাবে দিনের পর দিন দেবীর ওপর প্রতিশোধ নিতে থাকেন ব্রহ্মানন্দ।

কথা ছিল প্রার্থনার অন্যথাচরণ করলে দেবী অন্তর্ধান করবেন। একবার হলো কি, ঘুরতে ঘুরতে ব্রহ্মানন্দ রমনার কালীবাড়িতে উপস্থিত হয়ে প্রস্তরখণ্ডসহ মঠ প্রাঙ্গণে যাওয়াটা সমীচীন মনে না করে দেবীকে পাথর নামিয়ে দ্বারদেশে বিশ্রাম করতে বলে যেই অন্দরে প্রবেশ করতে যাবেন, দেবী বলে উঠলেন, "তোমার সঙ্গে কথা ছিল, যখন তুমি তোমার প্রার্থনার অন্যথা করবে, তখন আমি প্রস্থান করব। তুমি আমাকে তোমার প্রস্তরবাহক হয়ে তোমার সঙ্গে বিচরণ করতে বলেছিলে, এখন তা নামাতে বললে কেন? কাজেই আমি চললাম।" এই বলেই প্রস্তরখণ্ডটি প্রাঙ্গণ মধ্যে ছুড়ে ফেলে দিয়ে তিনি অন্তর্ধান করলেন।

পাথরখানার ওজন দেড় মণ তো হবেই। সত্যিমিথ্যে যা-ই হোক, এই উপলখণ্ডের ওপর বসেই যে ব্রহ্মানন্দ গিরি সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন, সে বিষয়ে কোনো কোনো ইতিহাসবিদের সায় আছে।

কিন্তু একটা ধাঁধা রয়েই গেল—কামানের গোলার ঘায়ে মঠটা গুঁড়িয়ে গেছে মানলুম, কিন্তু ওই কঠিন পাথরটা কোথায় উবে গেল? অন্তত আমি আর ওটা দেখিনি।

আমরা এতক্ষণ যে ব্রহ্মানন্দসংশ্লিষ্ট মঠের কথা বললাম, সেটাই ছিল আমার দেখা মঠের কিছু উত্তরে দশনামী সন্ন্যাসীদের ভগ্নদশা প্রাপ্ত মঠ?

কালীবাড়ি ও পুকুর পেরিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে যেখানে রেসকোর্স শেষ হয়ে গেল, রমনা গেট পেরিয়েই চোখে পড়বে পাশাপাশি দুটি মসজিদ। এই মসজিদ দুটি তিন নেতার স্মৃতিসৌধের পাশে আজও বহাল তবিয়তে আছে। এই মসজিদ আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করত এর নিরলংকার কর্কশ বহিরাবয়বের জন্য। মনে হতো যেন বা যুদ্ধরত কোনো দুর্গ। আসলে মসজিদ একটিই, দ্বিতীয়টি সমাধিমাত্র—অবয়বে মসজিদ। প্রকৃতই যেটি মসজিদ, সেটা হাজি খাজে শাহ্বাজের মসজিদ নামে পরিচিত। দ্বিতীয়টি হাজি সাহেবের সমাধিসৌধ।

শাহ্বাজ সুদূর কাশ্মীর থেকে বাণিজ্য উপলক্ষে ঢাকা নগরে আসেন। শহরতলি টঙ্গীতে তাঁর আবাস ছিল। টঙ্গীতে নির্মাণ না করে তিনি কেন রমনার এই নির্জন এলাকাকে নির্বাচন করলেন মসজিদের জন্য, তা আর আমাদের

জানার উপায় নেই। প্রস্তরফলকে দেখা যায়, ১৬৭৮ খ্রিস্টাব্দে সমচতুষ্কোণাকার এই মসজিদটি নির্মিত হয়। এর তিনটি গম্বুজ এবং ছাদের চারকোণে রয়েছে আটটি উঁচু চুড়ো। প্রাঙ্গণভূমি কালো পাথরে তৈরি। দরজার কপাটগুলো প্রস্তরময়। পূর্ব, উত্তর ও দক্ষিণ—এই তিনদিকে তিনটে দরজা। এ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বেচারাম দেউরি নিবাসী জগসা সাহেব এই মসজিদের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন—এটা জানা যায় ঢাকার ইতিহাস গ্রন্থ থেকে। শাহ্‌বাজ বেঁচে থাকতেই নিজের সমাধি নির্মাণ করে যান। মৃত্যুর পর তাঁকে এখানে সমাধিস্থ করা হয়। এই সমাধিসৌধও সমচতুষ্কোণাকার—দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে ২৬ ফুট। তবে গম্বুজ একটি এবং উঁচু চুড়ো চারটি। এই মসজিদের কাছে রমনা গেটের কাছে রেলিং ঘেঁষে দেখা যাবে এক ছোট্ট মাজার—ঘুঁটেওয়ালির মাজার নামেই সবাই জানে একে। এই সামান্যা ঘুঁটেওয়ালি ভারি পুণ্যবতী ও কামেল ছিলেন। তাই একজন মহিলা হয়েও কামেলের মর্যাদা পেয়েছিলেন।

এখন একটু আবার পেছন পানে ফেরা যাক তো। ওই যে বলেছি সচিবালয়ের কথা, যা পরে বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে গিয়েছিল—এর বহুরূপী রদবদলের কাহিনি এবার বলব। ১৯০৫ সালে ঢাকা রাতারাতি পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের রাজধানীতে উন্নীত হলে নির্মিত হয় সচিবালয় তথা সেক্রেটারিয়েট। এই ভবন নির্মাণে ড্রাফটসম্যান হিসেবে আমার ছোট দাদু খন্দকার ফজলুল করিমের একটা ছোট্ট ভূমিকা ছিল। এই দীর্ঘাকার ভবনের সামনের রাজশিরীষ *(আলবিজিয়া রিচার্বিয়ানা)* শোভিত নাতিদীর্ঘ রাস্তাটির নামকরণ হয় সংগত কারণেই সেক্রেটারিয়েট রোড। ১৯১২ সালের ১ এপ্রিল বঙ্গভঙ্গ রদ হয়ে গেলে ভবনটি দীর্ঘদিন অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকে। দেড় দশক পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে এই ভবনই হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ভবন। ১৯৪৭-এর ১৩ আগস্ট পর্যন্ত তা-ই ছিল। ১৪ আগস্ট পুনরায় বঙ্গভঙ্গ হলে ঢাকা আবার পূর্ব বাংলার রাজধানীর মর্যাদায় উন্নীত হয়। সাবেক সেক্রেটারিয়েট ভবনের ভাগ্যে নেমে আসে আরেকবার পরিবর্তনের খেলা। উত্তরাংশের একটি ব্লক বিশ্ববিদ্যালয়ের এখতিয়ারে থাকা ছাড়া পুরো ভবনটিই রূপান্তরিত হয়ে যায় মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। তবে এখানে উল্লেখ করতে হয় যে, মেডিকেল কলেজের সেশন শুরু হয়ে গিয়েছিল ১৯৪৬ সালেই। অবশ্য নতুন কলাভবন তৈরি হওয়ার পর পুরো ভবনটিই এখন হাসপাতাল।

তবে এই যে এত ভাঙাগড়ার খেলা, রাজশিরীষ শোভিত রাস্তাটির নাম কিন্তু পাল্টায়নি আজও—রয়ে গেছে সনাতন সেক্রেটারিয়েট রোড নামেই। কিন্তু কারও মুখে শুনবেন না এই নাম—সবার মুখে চানখাঁরপুল।

আমরা ঢাকা এসে রমনার শ্রীমাখা ভুবনে যে ভবনটিকে হাইকোর্ট ভবন হিসেবে জেনে এসেছি, এবার তার কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনি।

সচিবালয় ও মন্ত্রীদের বাসস্থানের কথা আগেই বলা হয়েছে, কিন্তু নতুন প্রদেশের লে. গভর্নর রাম কিলডে ফুলারের বাসভবনের কথা উল্লেখ করিনি। এখন যে হাইকোর্ট ভবন, এটাই গভর্নরের আবাসস্থল হিসেবে নির্মিত হয়েছিল। কিন্তু গভর্নরের তা পছন্দ না হওয়ায় কিছুকাল এই বাড়িটি একটি ইন্টারমিডিয়েট কলেজ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যে কারণে এই ভবনের সামনের রাস্তাটির নামকরণও কলেজ রোড।

কিন্তু গভর্নর পছন্দ করেননি কেন এই সুদৃশ্য কাননবেষ্টিত ভবনটি, তার পেছনে রয়েছে এক রোমহর্ষক জনশ্রুতি।

গভর্নর ভবনের জন্য যখন এই স্থানটি নির্বাচন করা হয়, তখন ঢাকাবাসী এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। কারণ হিসেবে তাঁরা নির্দিষ্ট করেন ওই এলাকার দুটি প্রাচীন দরগাকে। দরগার ওপর ভবন নির্মাণ তাঁরা সহ্য করবেন কেন! কিন্তু সরকার বাহাদুর কর্ণপাত করলেন না ঢাকাবাসীর প্রতিবাদের প্রতি। তবে একেবারে এড়িয়ে গেলেন বলা যাবে না, ওই দুটি দরগাকে বাঁচিয়েই গড়ে উঠল গভর্নর ভবন।

গৃহপ্রবেশ ঘটল বেশ শানশওকতের সঙ্গে। সারা দিন আনাগোনা হলো অতিথিদের। গভীর রাত পর্যন্ত চলেছিল খানাপিনা, মদ্যপান ও বলনৃত্য। একসময় সবাই বিদায় নিলে লে. গভর্নর শয্যার কোলে গা এলিয়ে দেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে গভীর ঘুমে তলিয়ে যান। হঠাৎ পাশ ফিরতে গিয়ে চমকে ওঠেন তিনি, একি, তাঁর কোমল শয্যা কোথায়! লাটভবনের সবুজ লনে পড়ে

.হাহকোঢ ভবন হিসেবে.

আছেন তিনি। ঘাস যতই নরম হোক না কেন, মোটেও আরামদায়ক মনে হলো না তাঁর।

সবাই বললে, এ হলো ওই দরগায় শয়ান বুজুর্গ পীরের প্রতিশোধ।

লে. গভর্নর মানবেন কেন তা। এটা দুষ্টুলোকের কাজ। ওই যারা এই লাটভবন নির্মাণের বিরোধিতা করেছিল, ওদেরই জ্যাঠামো এটা। নিরাপত্তাব্যবস্থা জোরদার করা হলো।

কিন্তু ভবী ভুলবার নয়। লাট বাহাদুরের ভূমিশয্যাকে কেউ আটকাতে পারল না। এবারও ওই তৃণশয্যা।

এর পরও গভর্নরের পছন্দ-অপছন্দের কথা তুললে ওঁর প্রতি অন্যায়ই করা হবে।

এটাকে আষাঢ়ে গল্পই বলুন আর যা-ই বলুন—লাটভবন যে পরিত্যক্ত হয়েছিল বঙ্গভঙ্গ রদ (১৯১২) হওয়ার আগেই, সেটা কিন্তু সত্যি।

এই লাটভবনের পেছনেই ছিল ঢাকার আরবরিকালচার উদ্যান। প্রাউডলক সাহেবের অবদান। এখন যেখানে সড়ক ভবন, এখানেই ছিল সেই অনবদ্য উদ্যানপালনসংক্রান্ত নার্সারিটি। এখানে বহু মূল্যবান গাছের সংগ্রহ ছিল। জিয়ার আমলে সব বৃক্ষপ্রেমীর অনুরোধকে উপেক্ষা করে নির্মমভাবে এই উদ্যানের গাছ নিধন করে তৈরি হয় উল্লিখিত সড়ক ভবন। কেবল বৃক্ষপ্রেমী নয়, আরবরিকালচার বিভাগের নার্সারিটি রক্ষার জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে সংবাদপত্র ও বুদ্ধিজীবী মহলের পক্ষ থেকে একটা স্মারকলিপি পেশ করা হয়েছিল। উক্ত প্রশাসন কথা দিয়েছিল, যেমন করে হোক নার্সারিটি তারা রক্ষা করবে। কার্যত তা হয়নি। কিছু কিছু গাছ সড়ক ভবনের সবুজ অঙ্গনে অতীত গৌরবের স্মৃতি বহন করে আজও নীরব সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সড়ক ভবনের বিপরীত দিকেই রমনা গ্রিন তথা রমনা পার্ক। আমরা যখন ঢাকায় আসি, তখন এটা রমনা গ্রিন নামেই পরিচিত ছিল এবং তখন এমন শ্রীময়ী ছিল না, অর্থাৎ পার্কের রূপ নেয়নি। এসব এলাকা ভারি নির্জন ছিল। রমনা গ্রিনের ওপাশে নিউ টাউনের হেয়ার রোড, মিন্টো রোড পেরোলেই চোখে পড়ত তরুরাজিসম্পন্ন বাংলার সনাতন গ্রাম—কাকরাইল, সিদ্ধেশ্বরী, শান্তিনগর, মালিবাগ। গ্রামই তো। চারদিকে ঘন গাছপালা, মাঝে মাঝে কাঁচা বাড়ি, সরু কিছু মেঠো এবং একটি পাকা পথ। জনবিরল সুনসান। ভরা দুপুরে চিলের ডাক শোনা যেত আকাশজুড়ে। আমার চারু ও কারুকলার দুই সতীর্থ কাইয়ুম চৌধুরী ও আলী রেজার বাড়ি ছিল এই সিদ্ধেশ্বরী ও শান্তিনগর গ্রামে। স্কুল ছুটির পর কোনো কোনো দিন বেড়াতে যেতাম ওদের বাড়ি। পুরানা

পল্টন ছাড়িয়ে কাকরাইলমুখো হতেই গ্রামের নির্মল পাগল হাওয়া ঝাপটা দিয়ে যেত চোখে-মুখে। একটা গাড়ি যেতে পারে, এমন সরু একটা পিচ ঢালা রাস্তা মালিবাগের মোড়ে বাঁ দিকে বাঁক নিয়ে সিধে চলে গিয়েছিল কুর্মিটোলা। শোনা যায়, এই রাস্তা নাকি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় মিত্রপক্ষের সেনাদের চলাচলের সুবিধের জন্য তৈরি করা হয়েছিল। যদি বিকেল গড়িয়ে সন্ধে নামত, সেদিন কাইয়ুম গা ছমছম করা এই পথে আমাকে কাকরাইল পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে যেত।

যা বলছিলাম। গাছপালা ঘেরা কাকরাইল ছাড়িয়ে কিছু দূর এগোলে হঠাৎ একটা একতলা পাকা বাড়ি চোখে পড়ত। কাঁচা ঘরবাড়ির মাঝে হঠাৎ পাকা বাড়ি বলে নয়, বিশেষ করে চোখে পড়ার মতো এক মস্ত আকর্ষণ ছিল এ বাড়ির। তাহলে খুলে বলি।

প্রথম যেদিন কাইয়ুমদের বাড়ি যাই, সেদিন আমি ছিলাম একা। কাকরাইলের মোড় পেরিয়ে নিবিড় তরুরাজির ছায়ায় পথ ভাঙছি, ডোবার পাশে একটা হলুদ পাকা বাড়ি চোখে পড়ল। চোখে পড়ল এবং চোখ স্থির হয়ে গেল, পা চলৎশক্তি রহিত। বাড়ির ওপরের দিকে দেয়ালের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তজুড়ে নীলচে কালো রঙে বেশ বড় বড় অক্ষরে লেখা রয়েছে 'ঠগিবাজ তৈফুর'। বাড়ির নামকরণ বহু দেখেছি—শান্তিকুঞ্জ, প্রান্তিক, সুশীলা ভবন, অমল কুটির, শান্তি কুটির, নিকুঞ্জ মন্দির, বিভূতি নিকেতন—কিন্তু ঠগিবাজ তৈফুর! গুটি গুটি পায়ে কখন বাড়ির সামনে এসে পড়েছি, খেয়াল ছিল না। হঠাৎ দারোয়ান গোছের একটি লোককে আমারই দিকে এগিয়ে আসতে দেখে সংবিৎ ফিরে পেলাম।

"কি, বুঝবার পারলেন না?"

আমি মাথা নাড়লাম। এরপর লোকটা ওই উৎকট বিদঘুটে নামের আড়ালের যে কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনি বর্ণনা করেছিল, সে কথা এখন বলব।

যাকে ঠগিবাজ বলা হচ্ছে তিনি এই শহরের একজন গণ্যমান্য সম্ভ্রান্ত পুরুষ—সৈয়দ মোহাম্মদ তৈফুর। পুরান ঢাকার সিদ্দিকবাজারে এদের বনেদি বাড়ি। শেখ ফজলুল হক সাহেবের সঙ্গে আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ। *Glimpses of Dacca* প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। দারোয়ান জানাল, তৈফুর সাহেবের এক ভাগনে বিদেশে অবস্থানকালে তাঁর কাছে টাকা পাঠান বাড়িসমেত জমি কেনার জন্য। বাড়ি কেনা হয় বটে, কিন্তু ভাগনের নামে না কিনে দলিল করেন নিজের নামে। দেশে ফিরে ঘটনা জানতে পেরে ভাগনে বাড়ির দখল নিয়ে মামাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য এই অভিনব পন্থা অবলম্বন করেন। পথচারীদের এই

নামের ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্যই যে তাকে নিয়োগ করা হয়েছে, এই কথাটা জানাতেও ভুল করল না দারোয়ান। এখন এই ভবনটিকে বিয়েবাড়ি হিসেবে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

পাঠক, পরে এই তৈফুর পরিবারের সঙ্গে আত্মীয়তাসূত্রে ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগে আমি তাঁর যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে পরিচিত হই, তাঁর সঙ্গে উপরিউক্ত কাহিনির কোনো মিল খুঁজে পাইনি। ব্যক্তিগতভাবে তিনি এ বিষয়ে আমার কাছে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। জীবিত অবস্থাতেই তিনি তাঁর পরিবারের বহু ঐতিহাসিক সামগ্রী জাতীয় জাদুঘরে দান করে যান। এর মধ্যে সুলতানি আমলের ঢাল-তলোয়ার, ঐতিহাসিক দিক থেকে মূল্যবান পারিবারিক আলোকচিত্র ইত্যাদি অন্যতম। সিদ্দিকবাজারে তিনি যে সুসজ্জিত অনুপম অট্টালিকায় বাস করতেন, তাও তিনি ধর্মীয় কাজে ব্যবহারের জন্য দান করে গেছেন। তবে দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, সুদৃশ্য এই বাড়িটি রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে আজ ভগ্নপ্রায় অবস্থা।

ঢাকা শহরের গৌরব সৈয়দ মোহাম্মদ তৈফুর বেশ কয়েক বছর হলো গত হয়েছেন। এবং সুখের বিষয়, ঢাকাবাসী তাঁকে ভুলে যায়নি—গত বছর (২০০০) তাঁর মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হলো বেশ ঘটা করেই জাতীয় জাদুঘরের উদ্যোগে।

* * *

অনেক দিন হলো ছেড়ে এসেছি পুরান ঢাকা। নিউ টাউন থেকে এবার রেলগেট পেরোনো যাক। এই যে রেলগেটের কথা বললুম, এটাই ছিল পুরোনো ও নতুন ঢাকার সীমানা। এই রেলগেট ছিল জিন্না এভিনিউ (স্বাধীনতা-উত্তরকালে যা বঙ্গবন্ধু এভিনিউ) ও নবাবপুর রোডের মোহনায়। পশ্চিম দিকে অনতিদূরেই ছিল ঢাকা তথা ফুলবাড়িয়া রেলস্টেশন। পুবে রেললাইন চলে গেছে শেষ প্রান্ত নারায়ণগঞ্জ পর্যন্ত। এখন এই রেলওয়ের ইতিকথা।

আমাদের এই উপমহাদেশে প্রথম রেলওয়ের প্রচলন শুরু হয় ১৮৫৩ সালে, কিছুদিন আগে ও পরে কলকাতা ও বোম্বাইয়ে। পুব বাংলা অর্থাৎ বাংলাদেশ নদীমাতৃক হওয়ায় এই অঞ্চল দীর্ঘ ৩২ বছর পর রেলের মুখ দেখে—১৮৮৫ সালের জানুয়ারি মাসে। এই রেলপথের দৌড় ছিল ঢাকা থেকে নারায়ণগঞ্জ। এর পর একই বছরের আগস্ট মাসে রেললাইন জয়দেবপুর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। বাংলার ছোট লাটের ময়মনসিংহ গমন

উপলক্ষে ১৮৮৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে উদ্বোধন করা হয় ঢাকা-ময়মনসিংহ রেলপথ। কিন্তু এই রেললাইনের পথ নির্বাচন সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের ত্রুটি নির্দেশ করে সেকালে অনেকেই মতামত প্রকাশ করেন। আমরা শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায় কৃত *ঢাকার ইতিহাস* থেকে এ সম্পর্কে কিছু উদ্ধৃতি দিচ্ছি : "...লাক্ষ্যা ও ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ তীরভূমি দিয়া এই লাইন চলিলে ঢাকা ও ময়মনসিংহ এই উভয় জেলারই পাট উৎপাদনোপযোগী স্থানসমূহ রেলপথের অনতিদূরে থাকিত। পক্ষান্তরে, লাক্ষ্যা [শীতলক্ষ্যা] তীরবর্তী স্থানসমূহের জলবায়ু অতি উত্তম, নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যগৌরবে এই স্থান নিম্নবঙ্গের শীর্ষস্থানীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; বহুসংখ্যক নদীনালা এই স্থান দিয়া প্রবাহিত হওয়ায় জলপথে যাতায়াতেরও খুব সুবিধা।...যৎসামান্য চেষ্টাতেই লাক্ষ্যা নদীর উভয় তীরবর্তী স্থানসমূহকে উন্নত বন্দরে এবং নিকটবর্তী তুলা ও ইক্ষুক্ষেত্রে পরিণত করা অনায়াসসাধ্য ছিল। রেল কর্তৃপক্ষ প্রকৃতির এই অযাচিত দান উপেক্ষা করিয়া মধুপুর অরণ্যানীর অন্তর্গত কর্ষণের অনুপযোগী পরিত্যক্ত ভূমি নির্ব্বাচন করিয়াছেন। সুতরাং এই রেললাইনের আয় আশানুরূপ হইতেছে না।" (পৃ. ২৯৫)।

আজ এত দিন পরও উল্লিখিত মন্তব্যের যথার্থতা বুঝতে অসুবিধা হয় না। যতীন বাবু পুব বাংলার জন্য রেলওয়ের চেয়ে জলপথের গুরুত্ব অনুধাবন করে আরও জানাচ্ছেন, "পূর্ববঙ্গের ন্যায় নদীবহুল দেশে রেলপথের আবশ্যকতা অতিসামান্য মাত্র। খালগুলোর সংস্কার সাধন এবং ক্ষীণতোয়া নদনদীর পঙ্কোদ্ধার করিলেই বাণিজ্য-ব্যবসায়ের উন্নতি সাধন হইতে পারে। এতদুদ্দেশ্যে তালতলার খাল ও হরিশকুলের খালের সংস্কার এবং প্রাচীন ইছামতী নদীর পঙ্কোদ্ধার করিলে অনেক সুবিধা হইতে পারে।" (ঐ, পৃ. ২৯৫)।

যতীন বাবুর এই মন্তব্যটিও যে যথার্থ, তা আমরা ইতিমধ্যেই হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। বাংলাদেশে রেলের গুরুত্ব কমে গিয়ে জলপথের গুরুত্ব যে বেড়েছে, তা স্থলপথে দূরগামী বাস চলাচলের কথা স্মরণে রেখেও বলা চলে। তবে খাল ও নদনদী সংস্কারের কাজটি আজও অবহেলিত।

আমরা বোধহয় আমাদের প্রসঙ্গ থেকে দূরে সরে এসেছি। কথা হচ্ছিল রেলগেট ও ফুলবাড়িয়া রেলস্টেশনের। ফুলবাড়িয়া ছিল মফস্বল জেলা শহরের স্টেশন যেমন হয় তেমনি চেটেনেটে, সাদামাটা। স্টেশনের নাম যদিও ফুলবাড়িয়া, প্লাটফর্মের দুই মাথার ফলকে নাম খোদাই ছিল কিন্তু 'ঢাকা'। ছোটখাটো হলেও পুষিয়ে নিত ফুলবাড়িয়া। রাজধানী ঢাকা তখন সবে পাখা মেলা শুরু করেছে। ভাগ্যান্বেষণে রাজধানীমুখো হওয়ার তেমন

চাড় ছিল না দেহাতি বঙ্গবাসীর। ওইটুকু স্টেশনেই কাজ হয়ে যেত। এই স্টেশন ভবনের একটি খণ্ডাংশ আজও দেখতে পাওয়া যায় অর্ধনির্মিত কুৎসিত কিছু এলোপাতাড়ি ভবনের ভিড়ে। কিন্তু ফুলবাড়িয়া নামটি কেন হলো? আমরা পর্তুগিজ পরিব্রাজক ম্যানরিক সাহেবের ১৬৪০ সালের বিবরণীতে ফুলবাড়িয়া নামের উল্লেখ দেখতে পাই। ১৭৯০ সালের কিছু কাগজপত্রেও ফুলবাড়িয়া ও ফুলমণ্ডি—এই দুটো নাম পাই। ঢাকা মহানগর বিশেষজ্ঞ নাজির হোসেনের মতে: "ফুলবাড়িয়া ও ফুলমণ্ডি গান্ধী গলির আতর প্রস্তুতকারকদের ফুল সরবরাহ দিত। সাবেক ফুলবাড়িয়া রেলস্টেশনে একটি মাজার রয়েছে। এটা নাকি ফুল সাহেবের মাজার। ফুল শাহ কখন কোন আমলে এখানে এসে তাঁর আস্তানা গেড়েছিলেন তা আজো জানা যায়নি। আমার তো মনে হয় এই ফুল শাহের নাম থেকেই ফুলবাড়িয়া নামকরণ
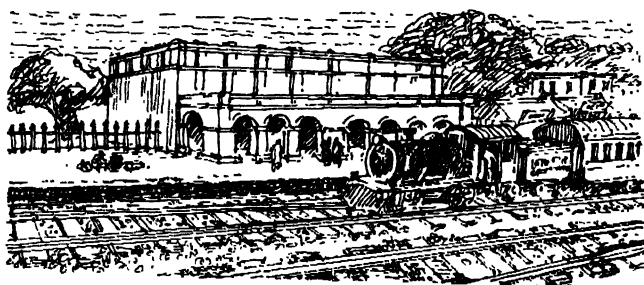
ফুলবাড়িয়ায় ছিল মফস্বল জেলা শহরের স্টেশন...

হয়েছে। তবে ফুল বিক্রেতাদের আড্ডার কারণে নামকরণ হয়নি, এমন কথাও জোর দিয়ে বলা যাবে না।"

ওপরে গান্ধী গলির নাম করেছি। না, মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর নামে এ গলির নামকরণ হয়নি। ভদ্রলোক ছিলেন পুষ্প ব্যবসায়ী। এঁর সম্বন্ধে *কিংবদন্তির ঢাকার* রচয়িতা নাজির হোসেন বলেন, "ঢাকার কোনো এক ব্যক্তি ফুলের নির্যাস সংগ্রহ করে এক বিশেষ শোধন পদ্ধতির মাধ্যমে চম্পা, বেলী, জুঁই ইত্যাদি নাম দিয়ে সুগন্ধি তৈরি করতেন। সে সময়ে এই সুগন্ধি খুব জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং বাজারে সমাদৃত হয়। তা ছাড়া বিভিন্ন গোলাপি আতর, গোলাপ পানি ইত্যাদি তৈরি করতেন। তবে তাঁর তৈরি আতর বা গোলাপ পানি নাকি ভারতের গাজীপুরে প্রস্তুত আতর বা গোলাপ পানির সমকক্ষ ছিল না বলে জনশ্রুতি আছে। যিনি এ সব সুগন্ধি তৈরি করতেন,

তিনি সবার কাছে গান্ধী নামেই পরিচিত ছিলেন। আর এই গান্ধী সাহেব যে গলিতে বাস করতেন সে গলিটিই গান্ধী গলি নামে পরিচিত।" (পৃ. ১০১, তৃতীয় সং, ১৯৯৫)।

তো ফুলবাড়িয়া স্টেশনের রাস্তাটা যেখানে এসে নবাবপুর রোডে পড়েছে, সেখানে ডন ফার্মেসি (আজও এই পঞ্চান্ন বছর পরও দেখছি দোকানটা আছে। তবে বড় শীর্ণকায়, ওষুধ গেলার আগেই মরবে বুঝিবা!) লাগোয়া ছিল 'শিয়ালদা হেয়ার কাটিং সেলুন'। দেশ ভাগের আগে ওই যখন আমাদের ডেরা ছিল কলকাতা, তখন আপার সার্কুলার রোডে ফলপট্টির কাছে শিয়ালদার অদূরে দেখেছিলাম এই সেলুনটাকে। পঞ্চাশের দাঙ্গার পর চলে আসে ঢাকায়, আস্তানা পাতে অন্য কোথাও নয়, স্টেশনের কাছে ফুলবাড়িয়ায়। স্মৃতি ঝালাইয়ের জন্য একবার চুল ছেঁটেছিলুম এই সেলুনে। কিন্তু ভারি মজা, ফুলবাড়িয়া থেকে ওই যেবার স্টেশন কমলাপুর উঠে গেল, এ সেলুনটা লাপাত্তা হয়ে গেল রাতারাতি! তাহলে কি উঠে গেল কমলাপুরে, যেখানে রেলের শিটি বাজে আর হকারের মুখে 'গরম চা'। স্টেশন-পাগল সেই সেলুন মালিকের খোঁজে গিয়েছিলুম কমলাপুর স্টেশনে। না, আশপাশে খুঁজে পাইনি 'শিয়ালদা হেয়ার কাটিং সেলুন'কে। মালিক কি তাহলে মরেছে! নাকি পালিয়েছে করাচি অথবা লাহোরে?

কিন্তু আমার কাছে ফুলবাড়িয়ার প্রধান আকর্ষণ ওর মায়াবী পেটা লোহার টুনানুং টুনানুং শব্দ নয়, কিংবা শিটির অলৌকিক আহ্বানও নয়, নতুন আনকোরা কালি ও বাঁধাইয়ের গন্ধমাখা বই আর পত্রপত্রিকার আড়ং ওই যে হুইলার বুক স্টল, ওইটে। উপমহাদেশে বড়সড় যত রেলস্টেশন কি জংশন, থাকবে তাতে থরে থরে সাজানো বইপত্রের এ বিলিতি দোকান। ব্রিটিশ রাজের গন্ধ তখনো দেশ থেকে একেবারে উড়ে যায়নি। দেশভাগের বাহ্যিক আভাসও তেমন পেতাম না। তাই তো দেখি হুইলার বুক স্টলে মজুদ বিলিতি ম্যাগাজিন—*লিলিপুট, লন্ডন ওপিনিয়ন, মেন ওনলি, পাঞ্চ, রিভিউ অব রিভিউজ, লন্ডন ইলাস্ট্রেটেড, হেলথ অ্যান্ড এফিয়েন্সি, সানবাথ* এবং রবার্ট ব্লেক অ্যান্ড স্মিথের পকেট বুক ও ইলাস্ট্রেটেড ক্লাসিকস্-এর কমিক বইয়ের পাশে *শিশুসাথী, শুকতারা, সচিত্র ভারত, বসুমতী, প্রবাসী, ভারতবর্ষ, পরিচয়, রূপমঞ্চ, নর-নারী, দেশ* থেকে শুরু করে শরৎচন্দ্র ও শশধর দত্তের মোহন সিরিজ। *হেলথ অ্যান্ড এফিশিয়েন্সি* ও *সানবাথ* ছিল প্রকৃতির বুকে নগ্নদেহে রৌদ্রস্নানবিষয়ক সচিত্র পত্রিকা। এসব পত্রিকার আড়ালে প্যারিস পোস্টকার্ডও থাকত। ওই কাঁচা বয়েসে আড়চোখে ঠারেঠোরে ওসব প্রাপ্তবয়স্কের এলাকায়

ঢুঁ মারা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। তবে একথা মানতেই হবে, পত্রপত্রিকা ও বই প্রচারের ক্ষেত্রে এ হুইলার বুক স্টলের অবদান ছিল বিশাল। এ স্টলের কাছে গেলেই মনে হতো কলকাতায় চলে গেছি। শুধু ঢাকায় নয়, আখাউড়া রেল জংশন, রাজশাহী, চট্টগ্রাম ইত্যাদি বড় স্টেশনগুলোতেও হুইলারের একচেটিয়া ব্যবসা ছিল। বোধ করি ব্যবসা মন্দ হওয়ার কারণেই এরা ব্যবসা গুটিয়ে চলে যায়। তবে মালিকানা বদলে ভারতবর্ষে এরা এখনো বহাল তবিয়তে আছে। যেখানেই গেছি, কলকাতা, দিল্লি, হায়দরাবাদ, বেঙ্গালুরু, মাদ্রাজ, বোম্বে, আগ্রা—সর্বত্র হুইলার বর্তমান।

ষাটের মধ্যপাদে এ ফুলবাড়িয়া রেলস্টেশন ছিল আমাদের সান্ধ্য আড্ডার কেন্দ্র। এই স্টেশনের বার-এ. থার্ড ক্লাস ক্যান্টিনের বেঞ্চিতে শহীদ কাদরী, মাহমুদুল হক, তাহের এবং এমনই আরও অনেক আড্ডাবাজসহ কত না মধুর সান্ধ্যবাসর কেটেছে আমাদের! একটু বেশি মালটানা হয়ে গেল কি কোনো কোনো ট্যাকখোর টুপভুজঙ্গকে দেখেছি মাতলামো করতে—কেবল একজন ছাড়া নিঃসঙ্গ, বিষণ্ন। বেশ পরিপাটি ফুল বাবুটি হয়ে সন্ধেবেলা আসতেন এবং দেয়াল ঘেঁষে এক আসনবিশিষ্ট তার নির্দিষ্ট টেবিলে বসে পেগের পর পেগ রাম কি হুইস্কি গিলতেন, অল্প অল্প করে রয়েসয়ে—শূন্য দৃষ্টি মেলে, চোখের পাতায় সান্দ্র মায়া। মাঝে মাঝে সিগারেট চলত। কারও সঙ্গে কোনো কথা নয়, হল্লা নয়। কখনো কাউকে ওঁর সঙ্গী হতে দেখিনি। বোতল শেষ হলে বেয়ারা নিঃশব্দে আরেকটি দিয়ে যেত। বিরামহীন এভাবে একটানা। তারপর রাত সাড়ে দশটা বাজল কি শেষ চুমুক দিয়ে ডিক্যান্টার নামিয়ে রুমাল দিয়ে মুখ মুছবেন, টেবিলে রাখা পিরিচে টাকা রেখে টোয়ানো নয়, হয়তো ভারি পদক্ষেপ, বেরিয়ে যেতেন নিঃশব্দে, গজেন্দ্রগমনে।

বাইরে ঢাকা শহর তখন নিদ্রামগ্ন। আমাদের সবে কলির সন্ধে।

এই ফুলবাড়িয়া স্টেশনের পোর্টিকোয় পা দিলে ডান ও বাঁ দিকে তাকালে চোখে পড়ত সারিবদ্ধ বাঁশের তৈরি আসবাবের দোকান। যে কারণে এই এলাকাটির নাম বাঁশপট্টি। আজও উচ্ছিষ্ট কিছু বাঁশ ও বেতের আসবাবের দোকান চোখে পড়ে। অথচ একসময় এই জায়গাটি ছিল কুটিরশিল্পের জন্য বিখ্যাত। এই বাঁশপট্টির পেছনেই সিদ্দিকবাজার এলাকা। এই নামকরণের পেছনে আছেন দেওয়ান পরিবারের ধর্মীয় পীর, মিয়াঁ মহম্মদ সিদ্দিক। এখানেই তাঁর মাজার অদ্যাবধি ভক্তকুলকে কম আকর্ষণ করে না। সিদ্দিকবাজারের পাশেই আলুর বাজার। এই আলুর বাজারের মালিক ছিলেন আল্লাইয়ার খান। তিনি ছিলেন আওরঙ্গজেবের একজন কর্মকর্তা, বাস করতেন

লালবাগ দুর্গে। সময়ের পথ বেয়ে আল্লাইয়ার বাজার নামটি বিকৃত হতে হতে প্রথমে আল্লুর বাজার, তারপর আলুর বাজার হয়েছে।

এই আলুর বাজারের শুরু নবাবপুর রোড থেকে, ওদিকে ফুলবাড়িয়ার স্টেশন রোড পূর্বদিকে যেখানে এসে শেষ হলো, নবাবপুরের শুরু সেখান থেকেই। এই নবাবপুরের আদি নাম ছিল উমরাপাড়া। আমরা যদি ইতিহাসের পাতা খুলি, তাহলে দেখব, মোগল আমলের সূর্যাস্তকালে এই অঞ্চলে আমির-উমরারা বাস করতেন। লোকমুখে তাই জায়গাটির নাম দাঁড়িয়ে গিয়েছিল উমরাপাড়া বা উমেরপুর। ঢাকার নবাবি আমলে শহরের এই প্রধান জনাকীর্ণ রাস্তাটির নাম দাঁড়ায় নবাবপুর।

এখন এই নবাবপুর রোড ধরে যদি এগোতে থাকি, তাহলে প্রথমেই ডান দিকে চোখে পড়বে রাস্তা থেকে বেশ উঁচু রকবিশিষ্ট ওষুধ বিপণি ডন ফার্মেসি, যার কোলঘেঁষে কিছু পত্রপত্রিকা নিয়ে বসে থাকতে দেখতাম কুচেল এক কলকাতিয়াকে। যত এগোই পাশাপাশি ঘেঁষাঘেঁষি দোকান। তখনো হিন্দু দোকানিরা আছে। ফাঁকফোকরে ঢুকে পড়েছে কিছু মুসলমান। বামাচরণ চক্রবর্তী রোডের মোড়ে এলেই চমকে উঠি আমি প্রতিবার—একটা সুন্দর ইউরোপীয় ছাঁদে তৈরি দোতলা বাড়ি—এ রাস্তার জন্য কেমন বেমানান, খাপছাড়া—কেমন রহস্যময় অলৌকিক মনে হয়, আজও। এটাই কি ছিল বুদ্ধদেব বাবুর যৌবনকালের বিলেতি মদের ঝকঝকে দোকান রায় কোম্পানি, যেখান থেকে স্কুল ছুটির পর বাড়ি ফেরার পথে তিনি তাঁর সুপ্রিয় চকলেট কিনতেন মাঝে মাঝে? আরও সামান্য পথ ভাঙলেই চোখে পড়ত এক মিষ্টান্ন ভান্ডার—মতিলাল সুইটমিট—আমিও দেখেছি বটে, পাছে ছদ্মবেশে পরিরা খেতে এসে ফিরে যায়, তাই খোলা থাকত নিশুতি রাত পর্যন্ত।

তখনো স্টুডিও ওরিয়েন্ট হয়নি, কিন্তু আছে তো ৮১ নম্বর ভবনে ১৯৩২ সালে স্থাপিত বনেদি দাস অ্যান্ড কোম্পানি—ফটো তোলা এবং ফটোর যাবতীয় সরঞ্জামের সবেধন দ্বিতীয় দোকান। প্রথম দোকানটি ভিক্টোরিয়া পার্কে—'এ সাইলেন্ট মিউজিক'—এই রোমান্টিক আত্মপরিচয় যার মদগর্বী ভূষণ। সে কথায় পরে আসছি। দাস বাবুর স্টুডিওটি চৌষট্টির দাঙ্গার আগুনে ঝলসে সম্পূর্ণ পুড়ে গিয়েছিল। ক্ষতিপূরণ পেলে পর আবার মাথা তুলে দাঁড়াতে না-দাঁড়াতে একাত্তরে আবার লুটের কবলে। মজা কি, এত ঝামেলা গেল, মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু আজও আর. দাসের দাস অ্যান্ড কোম্পানি। কিন্তু আমি কি লক্ষ্মীনারায়ণ, বলরাম ও মদনমোহন বিগ্রহ যে বাড়িতে স্থাপিত, তা পেছনে ফেলে এসেছি? না তো। দাস অ্যান্ড কোম্পানির

একটু আগেই ডান দিকে রয়েছে তো লক্ষ্মীনারায়ণ। প্রাচীন হিন্দু কাউকে বলুন, ওঁরা বলবেন, এ তো অমরাপুর।

* * *

অমরাপুর!

নাম শুনে মনে হয় না, চলে গেলাম কালিদাসের কালে—অবন্তী, উজ্জয়িনী, দেবগিরি, দশপুর, তারপরই অমরাপুর নামটা এমন কি বেমানান?

অথচ, কী মজা, এই ঢাকার নবাবপুরেই রয়েছে ওই অমরাপুর—যে নাম ঢাকার নগরবাসীরা কেন, নবাবপুরবাসীরাই কেউ জানে না। এ শতাব্দীর গোড়াতেও এই অমরাপুরের বেশ নামডাক ছিল। কিন্তু সে রামও নেই, অযোধ্যাও নেই। কথাটা যেন মিথ্যেও নয়। অর্থাৎ নবাবপুরের যে স্থানে লক্ষ্মীনারায়ণ, বলরাম ও মদনমোহনের বিগ্রহ সকল রয়েছে, তার ভক্তকুলেরা, বলা চলে, সবাই দেশত্যাগী। তবে চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকেও দেখেছি এই মন্দিরের অবশিষ্ট জাঁক। আজকাল নবাবপুরের ভিড়, অসংখ্য বিপণি ও কোলাহলের মাঝে অমরাপুর আর চোখে পড়ে না।

এই অমরাপুর ও তার বিগ্রহাদি সম্পর্কে যতীন্দ্রমোহন রায় মশায়ের *ঢাকার ইতিহাস* থেকে জানা যায়, উল্লিখিত লক্ষ্মীনারায়ণ পূর্বে বারো ভূঁইয়ার অন্যতম স্বনামখ্যাত কেদার রায় ও চাঁদ রায়ের কুলদেবতা ছিল। কেদার রায়ের অধঃপতনের পরে ৯৮২ বঙ্গাব্দে এই বিগ্রহ নবাবপুরের বসাকগণের পূর্বপুরুষ কৃষ্ণদাস মুস্ছদ্দীর হস্তগত হয়। কীভাবে, এখন সেই কথা। ওই সময় কৃষ্ণদাস অশোকাষ্টমীর স্নান উপলক্ষে ব্রহ্মতীরস্থ পঞ্চমীঘাট তীর্থে গমন করলে চক্রবাহী ব্রাহ্মণ তাঁকে লক্ষ্মীনারায়ণের শালগ্রাম শিলাটি উপহার দিতে চাইলে তিনি তা সানন্দচিত্তে গ্রহণ করেন। যেদিন থেকে লক্ষ্মীনারায়ণের ভার গ্রহণ করলেন, শোনা যায়, সেদিন থেকেই কৃষ্ণদাসের ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্ন হয়।
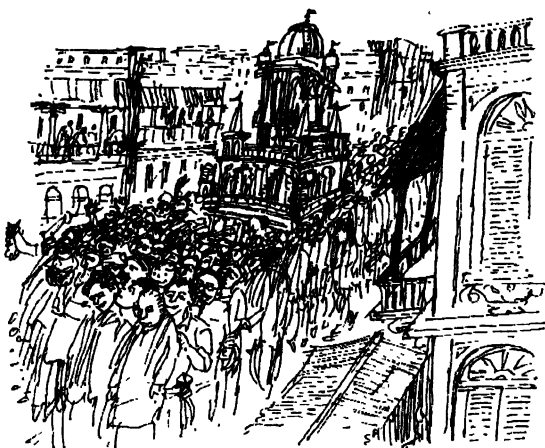
ঢাকার বিখ্যাত জন্মাষ্টমীর উপাখ্যান

বিভাগপূর্বকালে ঢাকায় যেসব উৎসব হতো, তার মধ্যে জন্মাষ্টমী এবং কৃষ্ণের জন্মযাত্রার মিছিল কিংবদন্তি হয়ে আছে। দেশভাগের পর ঢাকাতে আর তেমন মিছিল আমরা দেখিনি। এই এত দিন পর যাও বা জন্মাষ্টমীর ভাঙা মিছিল দেখলাম, সেখানেও বাগড়া দিলে কিছু সাম্প্রদায়িক দুষ্কৃতকারী। যে ভয়ে হিন্দুসম্প্রদায় এতকাল মিছিল করেনি, এবার তা করতে গিয়ে কী-ই না ধকল সইতে হলো তাদের—আন্দোৎসবটাই মাটি হলো।

সে যা-ই হোক, এই যে জন্মাষ্টমী, এর প্রবর্তক কিন্তু ওই কৃষ্ণদাস মশাই। প্রবাদে বলে, একদিন রাতে ঘুমের মাঝে বলরামের মূর্তি দেখে তার বদ্ধমূল ধারণা হয়, এটা তাঁর মূর্তি প্রতিস্থাপনের প্রত্যাদেশ বই আর কিছু নয়। তিনি অধীর হয়ে পড়লেন। সব সেরা মূর্তিনির্মাতার ডাক পড়ল। অল্প সময়ের মধ্যেই দেবদারু কাঠের মাঝে রূপলাভ করল বলরামের এক চিত্তচমৎকারা সুঠাম মূর্তি। এখানেই ক্ষান্ত হলেন না, গয়া থেকে পাথর-কোঁদা মদনমোহনের বিগ্রহ এনে এবং অষ্টধাতু দিয়ে সমুজ্জ্বল এক কিশোরী মূর্তি তৈরি করে ১০২০ বঙ্গাব্দে নিত্যানন্দপ্রভুর পুত্র বীরভদ্র গোস্বামীর নামে লক্ষ্মীনারায়ণচক্র ও

অন্যান্য বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা সম্পাদন করলেন। এবং প্রতিবছর কৃষ্ণের জন্মদিনে জন্মাষ্টমীর মিছিল বের করার প্রথা প্রবর্তন করলেন। সেকালের ঢাকাবাসী হিন্দুসম্প্রদায়ের জন্য এ এক আনন্দসংবাদ।

এর বহু বছর পর কৃষ্ণদাসের বংশধর কৃষ্ণগোবিন্দ বসাক ১২৯৪ বঙ্গাব্দে মিছিলের সঙ্গে সংযোজন করলেন রথযাত্রা। অতঃপর মিছিলে অংশগ্রহণের জন্য সেবায়েতগণের সংগৃহীত অর্থে পঞ্চায়তি বলদেবের রথ তৈরি হয়।

রথযাত্রা ও পুনর্যাত্রার (উল্টোরথ) অনুষ্ঠান ছাড়া লক্ষ্মীনারায়ণচক্র অমরাপুরের বাইরে আনা হতো না। এই রথযাত্রার সঙ্গে ক্রমান্বয়ে যুক্ত হয় পুষ্পযাত্রা, ঝুলনযাত্রা (শাঁখারীবাজারের গোলকধাঁধার এক পল্লি ঝুলনবাড়ি। এই ঝুলনযাত্রাটা শুরু হতো এখান থেকেই। ওই এলাকায় কালেভদ্রে যাতায়াত ঘটলে চোখে পড়ত বটে একটি রথ।), জন্মযাত্রা, গোবর্ধন যাত্রা, নিয়মপূর্ণা, রাসযাত্রা, দোলযাত্রা প্রভৃতি নানা উৎসব—হিন্দুসম্প্রদায়ের পুলক আর ধরে না।

প্রথম দিকে শুধু কৃষ্ণদাসের অমরাপুর থেকে জন্মাষ্টমীর মিছিল বের হতো। সময় যত বইতে থাকে, ক্রমে নবাবপুরের অন্যান্য বিত্তবান বসাক পরিবারেও মিছিল বের করার কথা সঞ্চারিত হতে থাকে। রীতিমতো প্রতিযোগিতা করে তাঁরা নিজ নিজ দেবালয় থেকে জন্মাষ্টমী উপলক্ষে সং বের করে মিছিলের কলেবর বৃদ্ধি করা আরম্ভ করেন। ক্রমান্বয়ে নবাবপুরের বাইরেও জন্মাষ্টমীর মিছিল ছড়িয়ে পড়ে। *ঢাকার ইতিহাস* থেকে আমরা জানতে পাই, উর্দু বাজারের এক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ গঙ্গারাম ঠাকুর নবাবপুরের বসাকদের অনুকরণে এক মিছিল বের করে উর্দু বাজার থেকে নবাবপুর পর্যন্ত যেতেন। এরপর আমরা দেখি বঙ্গাব্দ দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যপাদে পান্নিটোলার ধনকুবের গদাধর ও বলাইচাঁদ বসাকের উদ্যোগে ইসলামপুর থেকেও এই মিছিলের প্রবর্তন। প্রকৃতপক্ষে তাঁদের প্রবর্তিত এই মিছিলটি কৃষ্ণদাস প্রতিষ্ঠিত লক্ষ্মীনারায়ণ বিগ্রহের প্রীত্যর্থেই বের করা হতো। এঁরা মিছিলের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেই নিরস্ত হননি, নবাবপুর পর্যন্ত এদের কর্মকাণ্ড ব্যাপৃত। ফলে পল্লিতে-পল্লিতে পরিবারে-পরিবারে একটা প্রতিযোগিতার ধুমগুজারি চলত। এ সম্পর্কে চাক্ষুষ বিবরণ *ঢাকার ইতিহাস* থেকে: "ক্রমশ উভয় পক্ষে নানা পৌরাণিক আখ্যায়িকার মনোরঞ্জন চিত্র প্রভৃতি সং-এর অঙ্গীভূত হইয়া পড়িল। এই সময়েই বড় চৌকি, সোনারূপার চতুর্দ্দোল, হস্ত্যশ্বসমূহের জন্য সাচ্চার কাজ করা জরীর সাজ মিছিলের সমৃদ্ধি জ্ঞাপন করিতে লাগিল। গভর্ণমেন্টের পিলখানার হস্তীসমূহ

শোভাযাত্রার অঙ্গীভূত হইল। উভয়পক্ষ হইতে প্রভূত অর্থ ব্যয় সাধিত হইয়া বিবিধ পাদচারী ও মঞ্চ স্থাপিত সং মনোরম সাজসজ্জায় জন্মাষ্টমীর উৎসবকে জাঁকাল করিয়া তুলিল। তৎসঙ্গে ঢাকার পূর্ব্বতন শাসনকর্তা নবাবগণ যে প্রকার মিছিল সমভিব্যাহারে অতি সমারোহে নগরে বাহির হইতেন, তাহারও কতক অনুকরণ করিয়া ঐ নবাব-সোয়ারীর অংশ মিছিলের কোন কোন স্থানে সন্নিবেশিত হইয়া উহার অবয়ব বৃদ্ধি হইতে লাগিল।"

উদ্ধৃতি লম্বা করলাম এ কারণে যে, একালের ঢাকাবাসীরা জানুক তারা নাগরিক জীবনের কত বড় আনন্দযজ্ঞ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। দেশভাগের পরে জন্মাষ্টমীর জাঁকালো মিছিল বন্ধ হয়ে গেলেও হিন্দু-অধ্যুষিত পাড়ায় পাড়ায় কৃষ্ণের জন্মদিবসে কতিপয় ছোট ছোট মিছিল বের হতে দেখেছি চল্লিশের শেষ পাদেও। এরা সং সেজে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে বাড়ি বাড়ি গান গেয়ে নেচেকুঁদে কৃষ্ণনাম গাইতে গাইতে পল্লিবাসীদের আনন্দ বিতরণ করত। আজ আর তেমনটা দেখি নে।

অমরাপুর ছাড়িয়ে কিছুদূর এগোলেই হাতের বাঁয়ে পড়বে মালাকারটোলা বা মালাকার নগর। ঢাকা শহরের ঐতিহ্য অনুসারে এই এলাকার নাম, অর্থাৎ যে পেশায় যারা নিয়োজিত, তারা যে এলাকায় বাস করত, তাদের পেশার নামে সেই পল্লির নাম হতো। এই অঞ্চলের অধিবাসীরা ফুলের মালা তৈরি করতেন বলে তাদের মালাকার বলা হতো। তাই থেকে অঞ্চলের নাম। হিন্দুসম্প্রদায়ের এই মালাকারেরা তাজা ফুলের মালা বানিয়ে যেমন নাম কিনেছিলেন, তেমনি রঙিন কাগজ দিয়ে কৃত্রিম ফুল ও নানা ধরনের খেলনা প্রস্তুতেও তাদের জুড়ি মেলা ভার ছিল। অনেক পরে ওই যেবার আমার ত্রৈমাসিক পত্রিকার *বৃক্ষ সংখ্যা* বেরোয় (১৯৮৬), তখন পরিচয় হয় বন্ধুবর শিল্পী গোপেশ মালাকারের সঙ্গে। মালা হয়তো গাঁথতেন না, কিন্তু ফুল আঁকাটাই ছিল ওঁর পেশা। দ্বিজেন শর্মার *শ্যামলী নিসর্গ*তে ওঁর আঁকা ছবিতে ভরপুর। আমরা ঢাকা-বিশেষজ্ঞ নাজির হোসেনের কাছে জানতে পাই এই মালাকারগোষ্ঠী একসময় খুবই ঐক্যবদ্ধ ছিল এবং নিজেদের স্বার্থ রক্ষার লক্ষ্যে ব্রিটিশ আমলে তারা দু-দুটো ট্রেড ইউনিয়ন পর্যন্ত পরিচালনা করত! ঢাকাবাসীরা, বিশেষ করে হিন্দুসম্প্রদায় তাদের পুজোপার্বণে, বিয়ে কিংবা অন্যান্য অনুষ্ঠানে এদের কাছ থেকে মালা সংগ্রহ করত। এরা একসময় বসন্ত রোগের চিকিৎসাও করতেন। হিন্দুদের বিয়ের অনুষ্ঠানে গাওয়া একটি গীত থেকে :

অধিবাস করাইতে আসো যত নারীগণ
আশমানের শোভা করে আশমানের তারা
নারায়ণের গলায় শোভা করে
বেলফুলের মালা ॥

এমনিতেও ঢাকায় ফুলের ভারি কদর ছিল। ঢাকার মোগল আমলে নবাব ও অভিজাতশ্রেণীর মধ্যে ফুলের সমাদর কিংবদন্তির পর্যায়ে চলে গেছে। শহরের সব পল্লিতেই ছিল বাগানের ছড়াছড়ি। এই যেমন—শাহবাগ, লালবাগ, বাগে দেলখোশ (দিলকুশা গার্ডেন), হাজারীবাগ, মোমিনবাগ, শান্তিবাগ, বাগে পাদশাহি, বাগে হোসেনউদ্দিন, বাগে চান্দ খান, নবাববাগিচা, বাগে মুসা ও পরীবাগের নাম বিশেষ করে উল্লেখ করা যায়। এই সব বাগান রক্ষণাবেক্ষণ করতে সরকার, নবাব বা আমির-উমরারা এবং এগুলোর পরিচর্যার জন্য গড়ে উঠেছিল এক বিশাল মালী সমাজ। তারা যেখানে বাস করত, সেই এলাকার নামও তাদের পেশার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ত—মগবাজারসংলগ্ন মালিটোলা এবং অনতিদূরেই মালিবাগ—এই কথাই প্রমাণ করে। এই মালীরা বাগানের পরিচর্যার পাশাপাশি বাগান থেকে ফুল চয়ন করে সুদৃশ্য মালা, সেহরা, গহনা প্রভৃতি তৈরি করে বিভিন্ন বাজারে বিক্রি করত। ফুলের বাজারের মধ্যে সেরা ছিল ফুলমণ্ডি বা ফুলবাড়িয়ার বাজার। ছোট হলেও আরেকটি ফুলের বাজার বাবুবাজার ফাঁড়ির কাছে আজও দেখি টিকে আছে। এদের ক্রেতা মূলত কুমোরটুলির অভিযাত্রীরা— দেহপসারিণীদের গলার শোভা বাড়াবে বলে। বাকি মালা কি তোড়া যায় মিলাদে-বিয়েতে। বহুদিন হলো বাগান সব লুপ্ত। তাই মালীরা পৈতৃক পেশা ছেড়ে অন্যান্য কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। আবার অনেকে পৈতৃক পেশার মায়া ছাড়তে না পেরে কাগজের কৃত্রিম ফুল, ফুলের মালা তৈরি করে দুধের স্বাদ ঘোলে মিটিয়ে পেশাটাকে টিকিয়ে রেখেছে। ফুলের প্রতি মানুষের দুর্বলতার জোর এত বেশি যে, নবাবগঞ্জ এলাকায় যে আরেকটি মালিবাগ ছিল, তার জায়গায় তৎকালীন মিউনিসিপ্যাল কমিশনারের নামে ১৯২১ সালে আবদুল আজিজ লেন এবং ফুলবাড়িয়া রোডের নাম কাজী আলাউদ্দিন রোড রাখা হলেও লোকমুখে আদিনামই টিকে আছে আজও। কিন্তু পাঁচ-ছয় বছরে ঢাকার চেহারাই গেছে পাল্টে। ঢাকা এখন, বলা চলে কুসুমের ঐতিহ্যে আবার গরীয়ান। এখন পাড়ায় পাড়ায় ফুলের সেবা।

নবাবপুর রোড ধরে আরও কিছুটা এগোলে ডানে ও বাঁয়ে পড়বে টাকার হাট, মহাজনপুর, মোগলটুলি, সিক্কাটুলি—এই সব গলি তস্য গলি। এসব গলির তত্ত্বতল্লাশ নেওয়ার আগে নাজিরা বাজারের কথাটা সেরে নিই।

মোগল সুবেদারির আমলে নবাবপুর ছিল আমির-উমরাহ ও অন্যান্য অভিজাতশ্রেণীর বাস—এ-কথা তো আগেই বলেছি। তাই এই সড়কটির গুরুত্ব অন্যান্য সড়কের চেয়ে যে বেশি ছিল, সে-কথা বলাই বাহুল্য। এখানে সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের নাজিররাও বসবাস করতেন। নাজিরদের মধ্যে একজন একটি বাজার প্রতিষ্ঠা করলে কালের নিয়মে জায়গাটি নাজিরা বাজার নামে পরিচিত হয়ে ওঠে। এই এলাকাটি আলুর বাজারের অনতিদূরে অবস্থিত।

টাকার হাট আবার টাকের হাট নামেও খ্যাত। না, স্থূল অর্থে এখানে টাকার 'হাট' ছিল না বা টাকওয়ালা লোকদের সমাবেশও ঘটত না এখানে। মোগল আমলের শেষপাদে এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে এই অঞ্চলে ঋণ প্রদান ও বন্ধকি ব্যবসা এবং সোনা-রুপা টাকায় রূপান্তরের কাজকারবার চলত বলে জায়গাটার নাম লোকমুখে টাকার হাটে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। আর যেখানে ঋণ, সেখানে ঋণদাতা তথা মহাজনদের স্থান তো অবধারিত। এই মহাজনদের বাস ছিল টাকার হাটের উল্টো দিকে সাপের মতো এঁকেবেঁকে চলে যাওয়া গলিতে। যে কারণে তার নাম মহাজনপুর লেন। মহাজনপুরে আজও মহাজন আছে কি না, জানিনে; কিন্তু আমাদের তৃতীয় বিশ্বের এই দরিদ্র দেশটি যে দেশি-বিদেশি বড় বড় মহাজনের জাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে মহাজনপর্যবসিত হয়েছে, আশা করি তা খুলে বলতে হবে না।

এরপরই মোগলটুলি। গলিটার মোড়েই 'আলহামরা রেস্টুরেন্ট'—নবাবপুরের যে কটা পানশালায় আড্ডা দিয়েছি, ঠিক সেই দলে পড়ে না হয়তো, তবে একেবারে ফেলনাও ছিল না। এই গলি ভেঙেই যেতে হতো একদা বাগবান ভাইয়ের বাড়ি, যাঁর পোশাকি নাম ছিল মোহাম্মদ মোদাব্বের। দৈনিক *আজাদ* পত্রিকার *মুকুলের মহফিল*-এর পরিচালক ছিলেন। বাগবান ও মহফিলের নামকরণ করেছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। কলকাতা থেকেই জানাশোনা। *আজাদ* ও মাসিক *মোহাম্মদীর* সঙ্গে জড়িত থেকে এক বর্ণাঢ্য জীবন কাটিয়ে গেছেন। এখানে থাকাকালে কয়েক বছর *তিতাস একটি নদীর নাম* খ্যাত অদ্বৈত মল্লবর্মণ ওঁর সহকর্মী ছিলেন। *আজাদ*-এর সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে তিনি এই মোগলটুলিতেই থিতু হন এবং বের করেন অর্ধসাপ্তাহিক *পাকিস্তান।* এই পত্রিকার সঙ্গে একসময় কিছুটা জড়িয়ে পড়েছিলাম। বাড়তি কর্মচারী রাখার সামর্থ্য ছিল না তাঁর। তাই ছাপা শেষে যখন পত্রিকা বাজারে যাবে, তার আগে ওর ভাজাভুজি, প্যাকেট করা, ঠিকানা লেখা, টিকিট লাগানো—লেখালেখির বাইরে এসব কাজে ওর ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আমিও যোগ দিতুম। প্যাকেট হলো কি বাগবান ভাই ও ছড়াকার হোসনে আরা ভাবি

প্যাকেটে স্ট্যাম্প সাঁটতেন ঝপাঝপ। মজা কী, এই ভাজাভুজির কাগজটা *ঝংকার*-এর আমল থেকেই রপ্ত ছিল আমার। আমরা ভাইবোনেরা সবাই মিলে গোড়ার দিকে পত্রিকার বাঁধাইয়ের কাজটা নিজেরাই সারতুম। সে এক সোনালি দিন ছিল বটে। তাই কালেভদ্রে যখনই এই গলির পাশ দিয়ে যাই, বাগবান ভাইয়ের উপস্থিতি যেন টের পাই। বেশ প্রাচীন এর ইতিহাস। ঢাকা শহরের চেয়েও। ইসলাম খাঁর ঢাকা আগমনের আগে, ১৬০৮ সালের অনতিকাল পূর্বে পুরোনো মোগলটুলি (চকবাজার অঞ্চলে বংশী বাজারসংলগ্ন মোগলটুলি নামে আরেকটি এলাকা আছে, সে কথায় পরে আসব) এলাকায় একজন ফৌজদারের অধীনে একটি মোগল আউটপোস্ট ছিল। এখানে যেহেতু মোগল সেনা নিয়োজিত ছিল, তাই নামকরণ ওই মোগলটুলি। সঙ্গে 'পুরোনো' যোগ করা হয়েছে পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠিত উল্লিখিত বংশীবাজারসংলগ্ন আউটপোস্টের সঙ্গে গোলমাল এড়ানোর কারণে।

সেকালে কলের পানি সব বাড়িতে পৌছায়নি। বহু বাড়িতেই তাই আদ্দিকালের কুয়োই ছিল সবার ভরসা। যে বাড়িতে কল এসে গেছে, সে বাড়িতে কুয়োগুলোর ভূমিকা শেষ হলেও তা বোজানো হয়নি—এই যেমন আমাদের নারিন্দা ও চাঁদনীঘাটের বাড়িতেও সহাবস্থান ছিল তাদের। এখন যেখানে পানির কল নাস্তি, সেখানে ভিস্তিওয়ালা সহায়। দেখেছি, ছাগলের চামড়ার মশকে করে ভিস্তিওয়ালাদের এক বাড়ি থেকে আরেক বাড়ি পানি বয়ে নিয়ে যাওয়ার দৃশ্য। এ ব্যাপারটা কলকাতাতেও দেখেছি। ঢাকাতে ভিস্তিওয়ালাদের আগে 'সাক্কা' বলা হতো। এরা মোগল আমলে এবং ১৮৭৮ সালে ঢাকাতে পানির কল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে নগরবাসীদের পানি সরবরাহ করত। আধুনিক বিশ্বে শ্রমিক ইউনিয়নের ধারণার আগেই ঢাকাতে এই সাক্কাদের একটি সংস্থা ছিল, যার প্রধানকে বলা হতো 'নওয়াব ভিস্তি'। এই সাক্কা বা ভিস্তিরা ঢাকার দস্তুর অনুযায়ী যে এলাকায় বাস করত, সেই এলাকার নাম সাক্কাটুলি দাঁড়িয়ে যায়, যা পরে পর্যবসিত হয় সিক্কাটুলিতে। নাজিরাবাজারের অদূরে এই পাড়াতে ১৮৯৪-এর দিকে মুন্সি এমদাদ হোসেন নামে এক ভদ্রলোক বাস করতেন, যাঁর পেশা ছিল টুন্নিগিরি। অর্থাৎ আদালতে মামলার তদবির করাই ছিল তাঁর পেশা। এই পেশায় তিনি যথেষ্ট সুনাম ও অর্থ উপার্জন করেন। ফলে লোকমুখে এই সিক্কাটুলির একটা অংশ আজও মুন্সিপাড়া নামে খ্যাত। এই সিক্কাটুলিতে জনগণের সুবিধার জন্য যে একটি পাকা পুকুর দেখতে পাওয়া যায়, সেটা বোচা বিবি নামক এক ভদ্রমহিলা ঊনবিংশ শতাব্দীতে তাঁর বিয়ের দেনমোহরের টাকা দিয়ে তৈরি করে দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন এই এলাকার

উল্লাহ্ ওস্তাগর নামে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির স্ত্রী। ওইকালে যাঁরা সূচিকর্মে নিপুণ ছিলেন, তাঁদের ওস্তাগর বলা হতো। আজকাল অবশ্যি রাজমিস্ত্রিদেরই ওস্তাগর বলা হয়ে থাকে।

ঢাকার ইতিহাস থেকে পানির কল সম্পর্কে একটু উদ্ধৃতি : "১৮৭৪ সনের আগস্ট মাসে রাজপ্রতিনিধি লর্ড নর্থব্রুক কর্তৃক ঢাকায় জলের কলের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৭৭ খৃঃ অব্দে ১৯৫০০০/- টাকা ব্যয়ে জলের কলের কার্য্য শেষ হয়। জলের কল প্রতিষ্ঠার জন্য...স্বর্গীয় নবাব আবদুল গণি লক্ষ টাকা প্রদান করেন।...নগরবাসীদিগকে করভারে প্রপীড়িত না করা হয়, এই সর্ত্তেই নবাব বাহাদুর টাকা প্রদান করিয়াছিলেন। ...১৮৭৮ খৃ. অব্দে সহরে জলের কল খোলা হয় এবং ফিলটার না করিয়াই সহরবাসী-দিগকে কলের জল প্রদান করা হয়। পরবর্ত্তী বৎসরে সহরের কেবল মধ্যভাগে পরিষ্কার জল প্রদান করা হয়।...কিন্তু তখন পর্যন্তও অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাস্তায় জল প্রদানের বন্দোবস্ত ছিল না।...১৮৮৪ খৃঃ অব্দে ঢাকার মিউনিসিপ্যাল কমিটি ৫০০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করিয়া কলবৃদ্ধির প্রস্তাব করেন ...। নবাব স্যার আসানুল্লা বাহাদুর ১১০০০/- টাকা প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হন। ঐ অর্থে...নবাবপুর হইতে ঠাটারীবাজার এবং দেলখোসবাগ পর্য্যন্ত জলপ্রদানের বন্দোবস্ত হয়।...১৮২১ খৃঃ অব্দে গবর্ণমেন্ট হইতে ১২৫০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করিয়া ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটি সহরের সর্ব্বত্র জল প্রদানের সুবিধা করেন। ...বঙ্গবিভাগের পরে ঢাকায় প্রাদেশিক রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইলে, প্রতি বাড়িতে জলের কল প্রতিষ্ঠা করিবার সুযোগ প্রদান করা হয়। জলের কলে সহরের সাধারণ স্বাস্থ্য উন্নত করিয়াছে। পূর্ব্বে কলেরার প্রকোপ অত্যন্ত অধিক পরিলক্ষিত হইত।" (পৃ. ২৮৫-৮৬)।

...ভিস্তিওয়ালা সহায়...

আমরা রথখোলায় এসে গেছি। এই রথখোলার মোড়ের আশপাশে কেন যে এত দুধের আড়ত, মিষ্টির দোকান বা আফিমের দোকান, তা বলতে পারব না।

তবে রথখোলা নামটির পেছনে জড়িয়ে আছে ওই বসাককুল চূড়ামণি কৃষ্ণদাস মুচ্ছদ্দী। জন্মাষ্টমী উপলক্ষে ওই যে রথযাত্রা হতো—তার তিনচার তলা উঁচু বিরাট বিরাট রথগুলো যখন নবাবপুরের রাস্তা দিয়ে আনন্দোৎসবের মধ্য দিয়ে যেত, তখন নবাবপুর রথখোলায় পর্যবসিত হতো। এমনি করেই লোকমুখে নবাবপুরের রথখোলা এবং আরেকটা যে জায়গা আমলীগোলা, যেখানে রথ টানা হতো, তাও আমলীগোলার রথখোলা নামে আজও পরিচিত হয়ে আসছে।

ওই যে ওপরে আফিমের দোকানের কথা বললাম, শুনে নিশ্চয় চমকে উঠেছেন। ওঠারই কথা, যেখানে বিশ্বময় নারকোটিকসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চলছে, সেখানে প্রকাশ্য দোকানে আফিম! আফিম কিংবা হাশ্‌হিশ্‌ জাতীয় নেশাকর জিনিস তখনো বিশ্বে নেশাখোরদের মধ্যে তেমন জেঁকে বসেনি। যাঁরা নালি ঘা অর্থাৎ আলসার রোগ কিংবা যন্ত্রণাদায়ক অন্য কোনো রোগে ভুগতেন, তখন তাঁরা আফিমের বড়ি খেয়ে নেশায় বুঁদ হয়ে সাময়িক জ্বালা জুড়োতেন। প্রথমে রোগ প্রতিষেধক হিসেবে যাত্রা শুরু হলেও অভ্যেসটা ধীরে ধীরে নেশায় পরিণত হতো—রোগমুক্তি ঘটলেও আফিম থেকে মুক্তি ঘটত না। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একজন পাঁড় আফিমখোর ছিলেন। আমৃত্যু। আমার এক আত্মীয়কে দেখেছি কোনো কারণে আফিম পেতে দেরি হলে কী রকম ছটফট করতেন! সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ একদা চীন জাতিকে আফিমের অভ্যেস ধরিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিল। চীন পৃথিবীকে তার দ্বার খুলে দেয়নি, এই তার দোষ। বেনিয়া ইংরেজদের চোখে তখন চীনের চোখ-ধাঁধানো বিশাল বাজার। চীনকে ঠান্ডা করার জন্য গোপনে আফিম চালান দিতে লাগল। শুধু ইংরেজরাই নয়, ইউরোপের রাষ্ট্রগুলোও ছিল এই দলে। আফিমের পেছনে অর্থ ব্যয়ের দরুন মহাচীনের অর্থনৈতিক অবস্থা হয়ে উঠল শোচনীয়। চীন সরকার কিছুতেই ঠেকাতে পারল না আফিমের চোরাচালান। কথায় আছে, চোরের দশ দিন, সাধুর একদিন। বমাল ধরা পড়ল ১৮৩৯ সালের মার্চে ইংরেজ বণিকদের ২০,০০০ বাক্স আফিমের একটি বড়সড় চালান। আটক করলে বেধে যায় যুদ্ধ, ইতিহাসে যা 'আফিমের যুদ্ধ' নামে খ্যাত। এই যুদ্ধে ইংরেজদের কাছে হেরে যায় চীন। খেসারত দিতে হয় হংকং এবং চীনের আরও পাঁচটি বন্দরে ইংরেজদের বাণিজ্যিক সুবিধাসহ এমনই আরও অনেক অসম্মানজনক জাতীয় স্বার্থবিরোধী শর্তে ঘাট মানতে হয় চীনকে।

সেই সর্বনাশা আফিম ঢাকাতে পশরা সাজিয়ে বেচা! হ্যাঁ, পাকিস্তান আমল পর্যন্ত ছিল সেই দোকান, গন্ধবণিক পশারিদের দোকানের পাশে, তখনকার নামকরা তাজ হোটেল লাগোয়া।

দুধ ও আফিম সমাচার

সবে কাগজ-কলম গুছিয়ে বসেছি আফিমের ঘোরে যাব বলে, এমন সময় সকালের নাশতা নিয়ে ঘরে ঢুকল নিনি। সুন্দর কারুকাজ করা বারকোশটা টেবিলে রাখতেই লাণ্ডলা টি গার্ডেন যেন বা আমার পড়ার ঘরে স্বয়ং হাজির--ধূমায়িত কাপের প্রাণকাড়া ঘ্রাণ নিতে নিতে চোখ বুজেছি, নিনি বললে, এবার বুঝি আফিম নিয়ে লেখা হবে? জবাবের অপেক্ষা না করেই চেয়ারে বসতে বসতে সমুচার পিরিচটা সামনে ঠেলে দিয়ে যোগ করল, কিন্তু তুমি যে নিজেই আফিমখোর—তা তুমি মানো?

নিনির বাঘাটে উক্তি আমার রা কেড়ে নিলে।

—এই যে প্রতি কিস্তিতে এত সব তথ্য-তত্ত্ব ওগড়াচ্ছ, পণ্ডিতি ফলাচ্ছ, এগুলোর সূত্র দিচ্ছ কোথায়? বলে একটা সমুচা পিরিচ থেকে তুলে নিলে।

—নারে, আফিমের কথা লিখতে গিয়ে আফিমের নেশায় পড়িনি। মাঝেমধ্যে সূত্র দিচ্ছি তো—তোর চোখ এড়িয়েছে। কিন্তু লেখার মাঝে মাঝে ওই সূত্রগুলো যেন সতীনকাঁটার মতো বিঁধছিল। তাই ঠিক করেছি, লেখাটা শেষ করে গ্রন্থপঞ্জি একটা জুড়ে দেব।

নিনি আর কথা বাড়ায়নি। কাজেই আমার এখন আফিমে যেতে বাধা নেই। তার আগে দুধের আড়তের কথাটা একটু সেরে নিই।

দুধে পানি মিশিয়ে দুধের পরিমাণ বাড়িয়ে লাভবান হওয়া একালের মতো সেকালেও ছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সমাজে বেশ কিছু সাজো পাপাচার ঢুকে পড়েছিল—কালোবাজারি, ফোঁপর দালালি—এসবের পাশাপাশি দুধে পানি মিশেলের ব্যাপারটা এমন পর্যায়ে চলে গিয়েছিল যে দুধ, না চুনে গোলানো তরল পদার্থ—জিভে পৌঁছানোর আগে টের পাওয়াই যেত না। হাটে-বাজারে সরকার থেকে চালু হলো একটা মেশিন, তাতে গোয়ালা দুধে কিছু মিশিয়েছে কি না, ধরা পড়ত। কিন্তু রাখে হরি মারে কে! যার হাতে ওই মেশিন, সে-ই যদি রক্ষক হয়ে ভক্ষক হয়ে দাঁড়ায়, তাতে কার কী বয়ে গেল! মাঝে মেশিনটা ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে মুচকি হাসল মাত্র।

এই যে রথখোলার দুধের আড়ত, যেখানে দূর-দূরান্ত থেকে বাকেটে করে কাঁড়ি কাঁড়ি দুধ নিয়ে আসত গোয়ালারা পাইকেরদের কাছে বেচবে বলে—ওগুলোর আদ্ধেক কেঁচে গেছে ততক্ষণে। তাই তো পাইকেরের জিজ্ঞাসা, কিরে নিতাই, আইজ যেন ভরা ভরা লাগে। কয় পোহা জল দিছ?

—আইজ্ঞা, কী যে কন মুশাই। বলে গোয়ালা ততক্ষণে দুধের ওপর থেকে খেজুর পাতা সরাতে লেগেছে।

দুজনেরই চোখে-মুখে নীরব হাসি।

এই হাসির মানে ওরা দুজনই কেবল জানে।

আর জানি আমি। তাহলে খুলে বলি। একবার ভোরের লঞ্চে ঢাকায় ফিরছিলাম এমএল কাশেমের যাত্রী হয়ে। টাপেটোপে পূর্ণ লঞ্চের সামনে এক গোয়ালা চার বাকেট দুধ নিয়ে উঠল। সঙ্গে বোধকরি ওর ছেলে। লঞ্চ ছাড়ার আগে যেটুকু সময়, সেই অবসরে দেখলাম, গোয়ালা ব্যাটা মুঠো মুঠো নদীর পানি বাকেটে ছিটিয়ে চলেছে—মাছি তাড়াবার জন্য খেজুর গাছের যে ডাল দিয়ে আড়াল করা ছিল দুধ—টপ টপ করে পড়তে লাগল নদীর ওই 'বিশুদ্ধ' পানি বাকেটের আধারে। এবং সারাটা পথ সবার চোখের সামনে সদরঘাট টার্মিনালে ভেড়ার আগ পর্যন্ত চলল এই প্রক্রিয়া। যখন পৌঁছাল বাকেটের দুধ, তখন সগর্বে উপচে পড়তে চায়—দুধের নয়, পানির এমনই গুণ!

এবার আফিম। আগেই বলেছি গন্ধবণিকের দোকানের পাশেই ছিল ওই দোকান, আলাদা ভবনে। একটু উঁচু ছিল তার ভিত। বেশ কয়েক ধাপ সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতে হতো। ছোট্ট এক চিলতে দোকান। ভেতরটা আধো আলো আধো অন্ধকার। দোকানের সামনে পেতলের শিক দেওয়া কাউন্টার।

কাউন্টারের ওপর একটা ঝুলন্ত টিনের প্লেট। তাতে ইংরেজি-বাংলায় লেখা : OPIUM SHOP : আফিমের দোকান। এক কুচেল ফতুয়াধারী হিন্দু দোকানিকে কাগজে-মোড়া আফিমের বড়ি নিয়ে সকাল-বিকেল বসে থাকতে দেখতাম। পা দোলাতে দোলাতে ফোকলা-মুখে কথা বলতেন। আমি কখনো ওই দোকান ক্রেতাশূন্য দেখিনি। সব সময় দু-একজন গুলিখোরকে কাউন্টারে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতাম। কখনো বা ন-দশজনের লাইনও চোখে পড়ত। না, সবাই আফিম কিনতে পেত না। সরকার থেকে যারা পারমিট পেতেন, কেবল তারাই পেতেন, নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট পরিমাণ আফিম। মুখচেনা হয়ে যাওয়ায় দোকানি-ক্রেতার মধ্যে একটা বন্ধন গড়ে উঠত—তখন নিয়মের আগলেরও আলগা হতে বাধা ছিল না। একটা জিনিস লক্ষ করেছি, এরা প্রায় সবাই ছিলেন হিন্দুসম্প্রদায়ের এবং সবারই স্বাস্থ্য এমন মনে হতো যেন বা তখনই চার পায়াতে চাপবেন! ঢিকনো চালে এসে কাউন্টারের সামনে দাঁড়াতেই একদিন শুনলাম দোকানি বলছেন, পাল মশাই, কয়দিন ধইরা আপনে গো পাড়ার নিরঞ্জন বাবুরে দেখি না, বিষয়ডা কী?

—ক্যান, হুনেন নাই, গেল হপ্তায় তেনি দেহ রাখছেন।

—আহা! তাই তো কই, যে মানুষডা একদিন কামাই দেয় নাই—বড় ভালা মানুষ ছিলেন।

তো এই দোকানের পাশ দিয়ে হেঁটে গেলে কেমন একটা অদ্ভুত অলৌকিক গন্ধ মত্তাবস্থা ঘটাত। ঘ্রাণেই এই মত্তাবস্থা, না জানি খেলে কোন্ লোকে যায় এই গুলিখোরেরা!

এই আফিমের দোকানে গাঁজাও বিক্রি হতো। ঢাকার এই সব গুলিখোর তথা চণ্ডুখোরদের নিয়ে অনেক মজার গল্প চালু ছিল। একটা চুটকি শুনুন।

প্রথম গুলিখোর—হালায় শুনলাম কইলকাত্তায় নাকি দুই ট্যাকার বড়ি আট আনায় পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় গুলিখোর—কও কী নিত্যানন্দ! বাবু তাইলে বড়ি প্রতি দ্যাড় ট্যাকা ঠকায় আমাগো। এতো যারে কয় দিনে দুইপরে ডাহাতি। এর একটা বিহিত তো করতে হয়, না কি কও?

প্রথম গুলিখোর—হে কথা আর কইতে। তাই কইছিলাম কি, লও আমরা কইলকাত্তা যাই। সস্তায় কিনা আনমু আর বাবু হালারে দ্যাখ্যাইয়া দ্যাখাইয়া খামু—কথাডা ঠিক কইছি না নিবারণ?

দ্বিতীয় গুলিখোর—ঠিক কইছ গৌর। হায় হায় রে, বড়ি প্রতি দ্যাড়টা ট্যাহা লোকসান দিয়া আইছি অ্যাতো গুলান বছর।

দুই গুলিখোর বন্ধু অতঃপর স্টিমার-ট্রেন-হোটেল বাবদ প্রায় পঞ্চাশ টাকা খরচ করে তাদের মাস বরাদ্দ বিশটি বড়ি মাত্র দশ টাকায় কিনে ড্যাং ড্যাং করে ঢাকা ফিরে এল!

দুপুরে বাড়ি ফিরে এলে নিনির হাতে ধরিয়ে দিলাম লেখাটা। পড়া শেষ করে একটা বিচিত্র হাসি ওর টেবো গালে ফুটিয়ে বলল, দেখছি তুমিও কম বড় গুলিখোর নও।

—আবার?

—হ্যাঁ, আবার। ঠকলে বলে জীবনে ভালো ভালো চাকরিকে দুই হাতে ঠেলে তুমি সাহিত্য পত্রিকা বের করে ভাবলে খুব জেতাটা জিতেছ।

নিনি যে আমার আর্থিক অসাফল্যের প্রতি ইঙ্গিত করে কথাটা বললে বুঝতে পেরে কথা বাড়ালুম না। জানি, ওর অভিযোগের টোকফর্দটা অনেক লম্বা, যার নাগাল পাওয়া এ জন্মে আর সম্ভব নয়।

দুই গুলিখোর স্যাঙ্গাতের গপ্পো তো হলো। এবার আসুন ওই আফিমের দোকান পেরিয়ে আরেকটু এগোনো যাক। বাঁ পাশে পড়বে জোড়া মিষ্টির দোকান—সীতারাম (?) মিষ্টান্ন ভাণ্ডার ও মরণচাঁদ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার। মরণচাঁদের সাইনবোর্ডের নিচেই লেখা থাকত যাবতীয় মিষ্টান্ন ও উৎকৃষ্ট দধির আদি প্রতিষ্ঠান। একেবারে নির্ভেজাল ঘোষণা—মরণচাঁদের দই বলে কথা। সেকালে এ নামটা ছিল—আজকাল নামসর্বস্ব। মতিলাল সুইটমিটের কথা এর আগে বলেছি, আরও যে দুটি বিখ্যাত মিষ্টির দোকান ছিল সে তো ওই বাবুবাজার ফাঁড়ির কাছে, বিশেষ করে কুমোরটুলি ও অদূরের সাঁচিবন্দরের বারবনিতাদের খাই মেটাবার কালাচাঁদ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার ও সীতারাম মিষ্টান্ন ভাণ্ডার—তাদেরও টেক্কা দিত এই মরণচাঁদের দই। এখন তো শহরজুড়েই মরণচাঁদ অ্যান্ড সন্‌স্, মরণচাঁদ গ্র্যান্ড সন্‌স্, মরণচাঁদ গ্রেট গ্র্যান্ডসন্‌স্। কিন্তু কেউ পিতা-পিতামহের ঐতিহ্য আর তেমন করে ধরে রাখতে পারেনি—অন্তত আমার জিভে সেই স্বাদ আর আনন্দে নেচে ওঠে না।
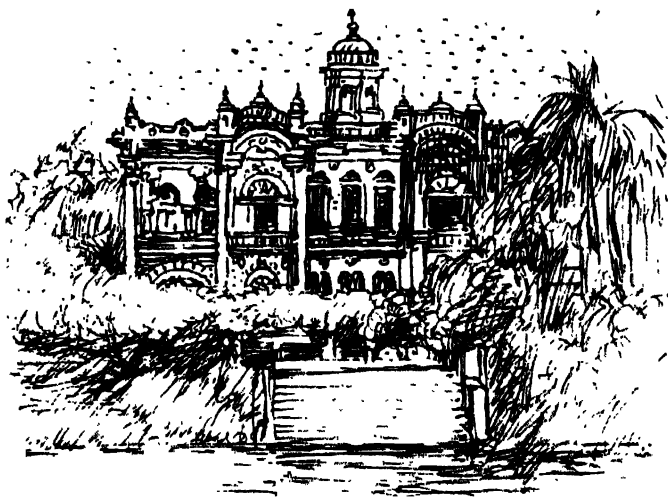
কান্দুপট্টির আলো আঁধার পেরিয়ে

এই সব অমৃতি, জিলিপি, রসগোল্লা, সন্দেশ, রাজভোগ, কালোজাম, পানতুয়া, কাঁচাগোল্লার ভুবনের উল্টো দিকেই কান্দুপট্টি। সারা নবাবপুরজুড়ে মোগল ও ব্রিটিশ আমলের মাঝামাঝি বারনারীদের যে বোলবোলাও ছিল, তার উচ্ছিষ্ট হলো গিয়ে এই পাড়া। কেন এই নামকরণ জানি নে, তবে কান্দে বটে এই পট্টির বাসিন্দারা, সারা জনম কান্দে। অন্তিমে এদের পতি বিনে গতি হয় কোথায়, ধর্ম বিনে শেষ কর্ম কোন্ বিধানমতে সম্পন্ন হয়, তাও জানা নেই। তবে একবার দেখেছি লাশ বহনকারিণী চারপায়া কাঁধে চার রমণীকে। নিঃশব্দে তাদের অনুসরণ করছিল আরও কয়েকজন রমণী, পাশে দু-তিনটি ছেলেমেয়ে। ওরা কাঁদছিল। বোধ করি ওদের মাকেই নিয়ে যাচ্ছিল বেওয়ারিশ কোনো শ্মশানঘাটে। কারণ, ভদ্রলোকদের শ্মশানঘাটে তার গতি হওয়ার নয়। তেমন পয়সা রেখে না গেলে হয়তো বারবিলাসিনীর গতি হবে মা বুড়িগঙ্গার কোলে। মজা কী, শব বহন করতে পুরুষ দালালদেরও ইজ্জতহানির আশঙ্কা! তাই তো অবলা ওই বারনারী নিজেদের বলে বহন করছিল ওই চারপায়া। তবে নিজের আনন্দটুকু খুইয়ে যত দিন বেঁচে থাকে এরা কামুক পুরুষদের

আনন্দ বিলোতে, তত দিন শরণাপন্ন হতে হয় 'ডাক্তার বাবু'দের। মানে হাতুড়ে ডাক্তার—যদিও পাস করা ডাক্তারের একটি নেমপ্লেট ঝোলানো থাকে দোকানের সামনে। প্রধানত এই পাড়ার চাহিদার কারণেই এই পল্লির আশপাশে গড়ে উঠেছে বেশ কিছু ওষুধের দোকান। একটা নাম আজও মনে পড়ে 'পদ্মনিধি মেডিক্যাল স্টোর্স'। এসব ওষুধের দোকানে যত না সাধারণ ক্রেতা—আসল আনাগোনা ওই পট্টির আঁধারে-আঁধারে বেড়ে ওঠা মলিন বাড়িগুলোর হতভাগিনীদের, ওদের ঘড়েল ভেড়ুয়া ও কুচুটি মাসি ও বাড়িউলিদের। কারও গা বমি বমি করল কিংবা চোখের আড়ালে গা-ভারি হলো কি ছোট ওই হাতুড়ে ডাক্তার বাবুর কাছে। ওরা পাস করা বড় ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায় না—ওদের টাকার বড় খাই। পুরোনো রোগী হলে পুরিয়া গছিয়ে দিতেন, প্রয়োজনে সুঁই ফোটাতেন। নতুন হলে 'কীরে মরিয়ম, এইডা নতুন আমদানি মনে হয়' বলে তত্ত্বতল্লাশ নিতেন জড়সড় চতুর্দশী কি ষোড়শীর। তেমন প্রয়োজনে রেডক্রসের ছাপ দেওয়া পর্দার আড়ালে পরীক্ষা দিতে হতো হতভাগিনীদের। আর গভীর রাতে রাস্তা যখন সুনসান, রিকশাওয়ালা শেষ সোয়ারির আশায় যাত্রীর সিটে গুটিসুটি, এদিক-ওদিক তাকিয়ে কোনো কোনো ভদ্রপুঙ্গবকে শার্টের কলার উঁচিয়ে কিংবা চোখে সানগ্লাস লাগিয়ে অন্ধকূপ থেকে সাঁত করে বেরিয়ে ডাক্তারের কাছে জোড়হস্ত হতেও দেখা যায়,—মানসম্মান বুঝি গেল ডাক্তারবাবু, এবারের মতো বাঁচান। এ ধরনের গেঁজেলদের কথা শুনে ডাক্তার অভ্যস্ত। তিনি নীরবে ইনজেকশনের সুঁচ ও ওষুধের আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। ওদিকে রোঁদে বেরোনো শান্তিরক্ষী বাহিনী বাইরে নয়, পট্টির ভেতরেও খদ্দেরদের পকেটের ওজন খালাসে কম তৎপর নয়! কিন্তু গত বছরে সাঁচিবন্দরের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে যাওয়ায় সেই কান্দুপট্টি আব নেই। চলে গেছে স্বার্থান্ধ কিছু জমি লোভাতুর পান্ডার হাতে। ফলে মরিয়মরা ঢাকা শহরটাকেই কান্দুপট্টি হিসেবে বিবেচনা করছে এখন। কান্দুপট্টি ছাড়িয়ে আমরা ইত্যবসরে আরেকটু এগোতে পারি। আমরা এবার রায়সাহেবের বাজারের পুলের সীমান্তে। নিচে বয়ে যাচ্ছে কলস্বনা ধোলাই খাল, যার শান্ত জলে বয়ে যাচ্ছে নানা পণ্যবোঝাই এক-মাল্লাই দো-মাল্লাই নৌকো—কারও বুকে মাটির কলস, হাঁড়িকুঁড়ি, মাটির খেলনা, কারও বুকে মৌসুমের কাঁঠাল, কারও গর্ভে উনুনের লাকড়ি। এই পাকা সেতুর সীমান্তের বাঁ পাশে খেলার সামগ্রীর দোকান আর ডান পাশে এক মসজিদ। মুয়াজ্জিন দিনরাতে পাঁচবার আজান দিয়ে আহ্বান করেন অনুসারীদের নামাজে যোগ দিতে—এই ডাক পাশের কান্দুপট্টির প্রতিটি বাড়ির

ঝাঁঝিধরা দেয়ালে, কামোন্মত্ত ঘরগুলোয় এই সেদিনও ঘা মেরে যেত। মাটি কামড়ে পড়ে থাকা দু-একটা ঘরে আজও যায়।

আমরা এবার সেতু পার হচ্ছি। ডানদিকে ধোলাই খালের পাড় ধরে ইংলিশ রোড। এই এঁদো গলির সারিবদ্ধ নড়বড়ে হতকুচ্ছিত কুঁজো চালাঘরসম্পন্ন রাস্তার ইংলিশ রোড নামকরণ কেন হলো—এ প্রশ্ন জাগতেই পারে। আপনার গবেষক মন চট করে রায় দিতে পারে, নিশ্চয়ই এখানে একদা ইংরেজদের আবাস ছিল। না, আপনার আন্দাজ ঠিক হলো না। ব্রিটিশ আমলে ঢাকার বিভাগীয় কমিশনার ছিলেন জনৈক মি. ইংলিশ। সেকালের রেয়াজ অনুযায়ী তাঁর সম্মানে ধোলাই খাল তীরবর্তী রাস্তার নামকরণ হয় ইংলিশ রোড। অবশ্যি তখন এই রাস্তার এবং ধোলাই খালটির পরিবেশ মনোরম ছিল।

এই রাস্তার মতো আরেকটি রাস্তার ব্যাপারে এমন ধন্ধ রয়েছে, সেটা হলো ইংলিশ রোড যেখানে শেষ হয়ে বাঁক নিয়েছে পশ্চিমে বংশালের দিকে, যাকে বলা যায় কাঠপট্টি, সেই একরত্তি ফ্রেঞ্চ রোড নিয়েও একই ভুল আমরা করে থাকি, অর্থাৎ একদা এখানে ফরাসি বসতি ছিল, এমনটা মনে হতেই পারে। কিন্তু তা তো নয়। ১৯১৮ সালে ঢাকার বিভাগীয় কমিশনার ছিলেন মি. এফসি ফ্রেঞ্চ—ওঁর নাম স্মরণীয় করে রাখার জন্যই ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটি রাস্তার নাম ফ্রেঞ্চ রোড রাখেন। এই মি. ফ্রেঞ্চই ফরাশগঞ্জ এলাকায় নর্থব্রুক হল রোডে অবস্থিত সেকালের ঢাকার গৌরব নর্থব্রুক হল লাইব্রেরি কমিটির সভাপতি ছিলেন। স্থাপত্যশিল্পের এক অপূর্ব নিদর্শন এই হলটি। আমার কাছে চারদিকে মনোরম সবুজ ঘাস ও গাছের ছায়ায় ভবনটিকে এক স্বপ্নপুরী মনে হতো তার কাছে এলে।

তো এই ফ্রেঞ্চ রোডটির দশাও ওই ইংলিশ রোডটির মতোই হতকুচ্ছিতই বলব। দাঁড়া-বেদাঁড়া কাঠের বাড়িগুলোয় যত রাজ্যের কাঠের আড়ত। যথার্থই কাঠপট্টি। কিন্তু আমরা বলছিলাম ইংলিশ রোডের কথা। এই রোডটির নাম হতে পারত চোরাবাজার। এই রাস্তাজুড়ে ছিল লোহালক্কড়ের বৈধ-অবৈধ দোকান। এসব দোকানে লোহা ও লোহাজাত যাবতীয় পুরোনো সামগ্রীই পাওয়া যেত—তালাচাবি, দা, কাঁচি থেকে শুরু করে বাড়ির জানালার শিক, গাড়ির চাকার চাকতি, পুরো গাড়ির পার্টসসহ অন্যান্য যাবতীয় খুচরো যন্ত্র—সব, সব পাওয়া যেত এখানে। তবে এখানে আপনার খোয়া যাওয়া কিছু খুচরো জিনিস পেলে নতুন করে কেনার অভিজ্ঞতা হলে অবাক হবেন না কিন্তু। এই ইংলিশ রোডেই রয়েছে

নাগরমহল সিনেমা হল, যা আজ মালিক পরিবর্তনের ফলে দাঁড়িয়েছে 'চিত্রামহল'-এ। প্রয়াত প্রযোজক-পরিচালক কাজী জহিরের ভার্যা, একদা জনপ্রিয় চিত্রাভিনেত্রী চিত্রা সিনহার নামেই এই হলের নামকরণ। আমরা যখন ১৯৪৭-এ ঢাকায় নতুন জীবন শুরু করি, তখন মোট সাতটি হল ছিল এই শহরে—মুকুল (বর্তমানে আজাদ), রূপমহল, লায়ন, তাজমহল, নিউ পিকচার হাউস (বর্তমানে শাবিস্তান), মানসী (মাঝে কয়েক বছর নিশাত) এবং অধুনালুপ্ত ইংরেজি সিনেমা হল ব্রিটানিয়া। ওয়াইজঘাটের মায়া (বর্তমানে স্টার) ও নাগরমহল তখন নির্মীয়মাণ। জানা গেছে, নির্মীয়মাণ 'মায়া' সিনেমা হলের কর্তৃত্ব নিয়ে দুই ভায়ের ঝগড়ার ফলেই ছোট ভাই নাগরমহল নির্মাণে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। উল্লেখ্য, মুকুল ও রূপমহল ছিল একই মালিকানাধীন। রূপমহলেই পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশের প্রথম চলচ্চিত্র আবদুল জব্বার পরিচালিত *মুখ ও মুখোশ* প্রদর্শিত হয়। প্রতিটি শো হাউসফুল থাকা সত্ত্বেও শর্তানুযায়ী এক সপ্তাহ পরেই ছবিটির প্রদর্শন বন্ধ করে দিতে হয়। সেকালে পূর্ব বাংলায় পশ্চিম পাকিস্তানি ও ভারতীয় হিন্দি-বাংলা ছবির ছিল জমজমাট ব্যবসা। এই সব ছবির স্থানীয় পরিবেশকদের চাপে পড়েই *মুখ ও মুখোশ* এক হপ্তার বেশি আর মুখ দেখাতে পারেনি। কিন্তু সেসব কথা বারান্তরে বলা যাবে, যখন চলচ্চিত্র জগৎ নিয়ে কিছু বলব, তখন।

এবার আমরা সেতু পার হয়ে এদিক-ওদিক না তাকিয়ে সিধে হাঁটছি। হাঁটছি জনসন রোড ধরে। এই যে জনসন, তিনি ছিলেন, আজ থেকে ঠিক এক শ বছর আগে, অর্থাৎ ১৮৯৩ সালে ঢাকা জেলার ম্যাজিস্ট্রেট লাটম্যান জনসন সাহেব। চাকরিতে যোগদানের দীর্ঘ সাত বছর পরে পদোন্নতি ঘটলে বিভাগীয় কমিশনার পদে বৃত হন (১৯০৯-১৯১০)। তাঁর ছিল ঢাকা সম্পর্কে অসীম আগ্রহ। বিভিন্ন প্রজারঞ্জক কাজের পাশাপাশি তিনি ঢাকা পৌরসভার তৎকালীন হেডক্লার্ক জে এন শীল বাবুর সহযোগিতায় ঢাকা পৌরসভার ১৮৯৩ সাল পর্যন্ত সময় এক মূল্যবান বিবরণ প্রকাশ করেন। তাঁর এই সব জনহিতকর কাজের জন্য পৌরসভা নবাবপুরের এই অংশটির নামকরণ করেন জনসন রোড। পাকিস্তান আমলে এই রাস্তাটি লিয়াকত এভিনিউ নামে পরিচিত ছিল। এই জনসন রোডে পড়তেই ডান দিকে পড়বে রায়সাহেবের বাজার। এই রায়সাহেব উপাধিধারী ভদ্রলোকটি ১৭৭৫ সালে ঢাকা কালেক্টরেটের এক দেওয়ান ছিলেন। নাম ছিল তাঁর রায় হরিরাম মল্লিক। এই দেওয়ান রায় বাবুর নামেই দুই শতাধিক বছরের পুরোনো এই

বাজারের নামকরণ রায়সাহেবের বাজার। কিন্তু একটা খটকা থেকেই গেল। এই বাজারের মালিক ছিলেন নবাবপুর এলাকার বসাক কুলের মদনমোহন বসাক বাবু। তিনি ছিলেন ঢাকা পৌরসভার একজন কমিশনার। তাঁর আনুকূল্যে নবাবপুর রোডের রথখোলার চৌমাথা থেকে জোড়পুল পর্যন্ত পানির লাইন সম্প্রসারিত হয়। তাঁর এই জনহিতকর কাজের জন্য একটি রাস্তার নাম মদনমোহন বসাক রোড রাখা হয়। পাকিস্তান আমলে ১৯৬০ সালে পৌরসভার সিদ্ধান্ত অনুসারে এই রাস্তাটির নাম পরিবর্তিত হয়ে দাঁড়ায় টিপু সুলতান রোড। কিন্তু পৌর নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন পায়নি এই নাম। তবু টিপু সুলতান নামটি টিকে যায়। বাংলাদেশ হওয়ার পর পুরোনো নামটা আবার কারও কারও মুখে উঁকিঝুঁকি মারে বটে; কিন্তু তার পূর্ব গৌরবে নয়। আমরা ১৯৬০ সালের অবৈধ এই নামকরণ রহিত করার আবেদন জানাব বর্তমান পৌর কমিটির কাছে। অন্য কোনো নতুন রাস্তার নাম টিপু সুলতান রোড রাখলে দুই কুল রক্ষা হয়। মদন বাবুর এত গুণের কথা বলা হলো, তার পরও রায়সাহেবের বাজারের নাম কী করে দেওয়ান রায় হরিরাম মল্লিকের নামে নামকরণ হয়, তাতে আমাদের ভারি ধন্ধ। আমার মনে হয় হরিরাম মল্লিকের পারিবারিক পদবি যেহেতু রায়, এবং এই রায়ই সব গোলমালের মূলে। এই রায় পদবির সঙ্গে ব্রিটিশরাজ প্রবর্তিত 'রায় সাহেব' উপাধির সম্বন্ধ বিচার করলে ভুল হবে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, অনুগত প্রজাদের ভালো কাজের পুরস্কার হিসেবে ব্রিটিশ সরকার মুসলমানদের ক্ষেত্রে 'খান সাহেব' ও 'খান বাহাদুর' এবং হিন্দুদের ক্ষেত্রে 'রায় সাহেব' ও 'রায় বাহাদুর' উপাধি প্রদান করতেন। এবং মদনবাবু জনহিতকর কাজের জন্য যে রায় সাহেব উপাধি পেয়েছিলেন, সেটার জের ধরেই রায়সাহেবের বাজার নামকরণ।

এই বাজারের পেছনেই গোয়ালনগর। ঢাকায় বহুকাল আগে থেকেই কয়েকটি এলাকা গোয়ালপাড়া, গোয়ালনগর বা গোয়ালটুলি নামে পরিচিত ছিল। এখনো এই নাম বজায় রয়েছে। অবশ্য খোদ গোয়ালাদের সংখ্যা কমে গেছে, এই যা! গোয়ালপাড়া নামটি ১৯২৮ সালে নরেন্দ্রনাথ বসাক রোডে এবং ১৮৮৪ সালে ঢাকা পৌর কমিশনার গোপীমোহন বসাকের নামে গোয়ালনগর পর্যবসিত হয় গোপীমোহন বসাক লেনে। তবে এ কথা ঠিক, এই দুটি জায়গাই তাদের পূর্ব নামেই জনগণের কাছে পরিচিত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এই গোয়ালনগরটি গোয়ালাদের বসতির আগে মোগল আমলে একটি পূর্ণাঙ্গ বাগান ছিল এবং এর নাম ছিল মির্জা বাগ।

এই গোয়ালনগরেই জন্মেছিলেন বিখ্যাত কৌতুকাভিনেতা ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় (২৬.৮.১৯২০)। ওঁর আসল নাম সাম্যময় বন্দ্যোপাধ্যায়। বাবা ছিলেন ঢাকার নবাব স্টেটের সদর মোক্তার জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। পৈতৃক বাড়ি বিক্রমপুরে। মা সুনীতি দেবী সরকারি শিক্ষা বিভাগে চাকরি করতেন। মাত্র ১২ বছর বয়সে বিপ্লবী আন্দোলনে জড়িয়ে বিপ্লবী দীনেশ গুপ্তের বাঁ হাত হয়ে পড়েন। ১৯৪০ সালে জগন্নাথ কলেজ থেকে আই এ উত্তীর্ণ হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন। বিখ্যাত বিজ্ঞানী অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর প্রিয় ছাত্র ছিলেন। কিন্তু বিপ্লবী আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ায় রাজরোষে ঢাকা থেকে কলকাতায় চলে যেতে বাধ্য হন (১৯৪১)। পড়াশোনা লাটে ওঠে, চাকরি নেন আয়রন স্টিল কন্ট্রোলে। ঘটনাচক্রে চলচ্চিত্র জগতের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। তবে অভিনয়টা ঢাকা থেকেই রপ্ত ছিল। ঢাকার কমলাপুরের মেয়ে, পরবর্তীকালের বিখ্যাত চলচ্চিত্রাভিনেত্রী সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে ঢাকাতে বহু নাটকে একত্র অভিনয়ের অভিজ্ঞতা ছিল। *পাশের বাড়ি*সহ বহু ছবিতেও এঁরা একত্রে অভিনয় করেন। দুর্ভিক্ষ ঘিরে ছবি *জাগরণ-এ* প্রথম হাতেখড়ি ১৯৪৬-এ। এরপর নাট্যজগতে প্রবেশ এবং *নতুন ইহুদিতে* অভিনয়। পরে ১৯৪৭-এ যখন *নতুন ইহুদি* চলচ্চিত্রায়িত হয়, তাতে অভিনয় করে খ্যাতির চূড়ায় ওঠেন। আর তাঁকে পেছনে তাকাতে হয়নি। ১৯৫১ সালে পেশাদারি নাট্যমঞ্চের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। প্রায় তিন শ ছবিতে অভিনয় করেন। একসময় চলচ্চিত্র জগতে উত্তমকুমারের পাশে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামটিও কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। তিনি ঢাকা ছেড়ে গেলেও অধিকাংশ ছবিতেই তিনি ঢাকা অর্থাৎ পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুরের ভাষাতেই কথা বলতেন। প্রযোজকেরা চরিত্র সৃষ্টি করতেন ওঁকে সামনে রেখেই। কলকাতায় আমি যখন বিখ্যাত সুরকার অনুপম ঘটকের বাড়িতে ওঁর দেখা পাই, তখনো সারাক্ষণ তিনি আমার সঙ্গে বিক্রমপুরের ভাষাতেই আলাপ করেছেন—এমনই ছিল তাঁর স্বদেশপ্রীতি। তাঁর আদিপুরুষ বিক্রমপুরেরই অধিবাসী ছিলেন। ভানুবাবু তাঁর কৌতুকাভিনয়ের প্রাথমিক প্রেরণা পান ঢাকার বিখ্যাত গাড়োয়ানদের কাছ থেকে। মূলত কৌতুকাভিনেতা হিসেবেই পরিচিত তাঁর নাম

ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়

এতটাই ছড়িয়ে পড়ে যে, তাঁর নিজের নামেই ছবি হওয়া শুরু হয়। এই যেমন *ভানু পেল লটারী, ভানু গোয়েন্দা জহর অ্যাসিসটেন্ট* ইত্যাদি। ১৯৮৩ সালের ৪ মার্চ কলকাতায় মারা যান। তিনি *চাটনি* নামে একটি রসরচনার বই লিখে গেছেন (১৯৫৫)। বইটি বহুকাল হলো ছাপা নেই। রণজিৎ, নবদ্বীপ প্রমুখের মতো তাঁর জনপ্রিয় বহু কমিক রেকর্ড ও ক্যাসেট আজও বহু ভানুপ্রেমীকে আনন্দ দিয়ে আসছে।

ভানু বাবুর বৃত্তান্ত গেল। এবার আবার পথ চলা। কাচারি পল্লি ভেঙে, মুকুল সিনেমা হল ছাড়িয়ে পরে রোকনপুর-কলতাবাজার এলাকা। এই এলাকায় রয়েছে কাজী আব্দুর রউফ রোড। কেন এই ভদ্রলোকের নামে রাস্তা? একে তো জনগণ তাঁর পূর্বপুরুষের পীর মুরশিদ হিসেবে সম্মান করতেন, উপরন্তু সুদীর্ঘ ঊনত্রিশ বছর ধরে মহল্লার সরদার ছিলেন, ছিলেন বিয়ের রেজিস্ট্রার ও শহর-কাজি পদে অধিষ্ঠিত। কাজেই ওঁর নামে রাস্তার নাম হতে বাধা কোথায়? ওই যে ওপরে মুকুল সিনেমা হলের কথা বললুম, তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে তৎকালীন ঢাকার সাময়িকী জগতের অনেক ইতিহাস। এই হলের পেছনে ছিল দুটি ছাপাখানা : একটি তো কামাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস (আদি নামটি মনে নেই), দ্বিতীয়টি চাবুক প্রিন্টিং প্রেস। এই চাবুক থেকে বেরোত আমার ও অগ্রজের যুগ্ম সম্পাদনা ও পরিচালনায় পূর্ব পাকিস্তানের সর্বপ্রথম কিশোর মাসিক *ঝংকার* (১৯৪৯-৫০)। চাবুক প্রেসের মালিক ছিলেন শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সাহা। ১৯৪১-এ যখন এম এ-র ছাত্র, ঝাঁপিয়ে পড়েন অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে। পড়া ছেড়ে দিয়ে ধরলেন স্বাধীন ব্যবসা। এক জমিদারের শখের প্রেস কিনে নিয়ে বের করলেন ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে কশাঘাত হানতে অর্ধসাপ্তাহিক কাগজ *চাবুক*। প্রেসের নামও রাখলেন চাবুক। বিখ্যাত ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মামলার রোমাঞ্চকর সংবাদ পরিবেশন করে *চাবুক* অসম্ভব জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এই *চাবুক* ১৯৫০ সাল পর্যন্ত ঢাকাতে ছিল। ১৯৫০-এ কলকাতার দাঙ্গার জের ঢাকায় ছড়িয়ে পড়লে ভারতে চলে যান এবং কলকাতার মির্জাপুর স্ট্রিট থেকে একই নামে প্রেস প্রতিষ্ঠিত করে *চাবুক* পত্রিকাটি চালু থাকে সম্পাদক-প্রতিষ্ঠাতার জীবিত কাল পর্যন্ত। *ঝংকার* ১৯৫০-এ বন্ধ হয়ে গেলে এই প্রেস থেকেই আমাদের দুভায়ের যুগ্ম সম্পাদনায় বেরোয় মাসিক *রূপছায়া,* যার প্রকাশকাল ১৯৬০ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই প্রেস থেকে সেকালে আরও অনেক পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হতো, যেমন, মুকুল ফৌজ আন্দোলনের মুখপত্র *মুকুল, মাসিক সিনেমা, সাপ্তাহিক গণশক্তি* এবং আরও অনেক পত্রপত্রিকা। ঢাকাতে আরও অনেক ছাপাখানা

ছিল; কিন্তু সবাই এসে ভিড় করতেন চাবুক প্রেসে। কারণ, বঙ্কিমবাবু কাউকে 'না' বলতে পারতেন না এবং বাকিতে কাজ করার সুবিধে-সহ্ বাকি ফেলে পলায়নের যথেষ্ট সুযোগ ছিল এই চাবুক প্রেসে।

* * *

আমরা ভিক্টোরিয়া পার্কের দিকে এগোচ্ছি। ডান দিকে বিশাল কাচারি এলাকা। বাঁ দিকে ফেলে এসেছি ঢাকা জেলা ভবন। আরেকটু এগোলেই পড়বে ক্যাথলিকদের গির্জা, যার মাথায় শোভা পাচ্ছে ঢাকার একমাত্র 'বিগবেন' ঘড়ি—যদিও আমি যখনকার কথা বলছি, সেই '৪৭ কি '৪৮ সালের ঢাকা তেমন ব্যস্ত শহর ছিল না, তবুও অলস পথচারীকে এবং কলকাতা ও হিল্লিদিল্লি ঝেঁটিয়ে আসা, দেশভাগের কারণে অপশন নিয়ে আসা আগন্তুকদের সময় সম্পর্কে সজাগ করে দেওয়ার এমন চমৎকার ব্যবস্থা হয় না। কিন্তু মুকুল সিনেমার (আজকের আজাদ) পাশে 'ওকে' রেস্টুরেন্টের কথা বললাম না তো! সদ্য রাজধানীতে উন্নীত ঢাকায় কোনো ভালো হোটেল কিংবা পানশালা ছিল না—জেলা শহর ঢাকার একমাত্র বনেদি যে রেস্টুরেন্ট ছিল, তা ওই 'ওকে' (OK)। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় গড়ে ওঠা এই 'ওকে'র মালিক ছিলেন রোকনপুরের অ্যাংলো পল্লির এক অ্যাংলো মহিলা। দোতলা 'ওকে'র ওপরে ছিল আবাসিক ব্যবস্থা, নিচে সর্বসাধারণের রেস্তোরাঁ। ঢাকাতে তখন যে তিন জায়গায় বারের ব্যবস্থা ছিল, তার মধ্যে 'ওকে' একটি। অপর দুটির একটি হলো ফুলবাড়িয়া রেলস্টেশন-সংলগ্ন পানশালা এবং অপরটি ব্রিটানিয়া টকিজ-সংলগ্ন রিজ (Ritz)। এখানে ভদ্র সুরাপায়ীদের আড্ডা জমত মন্দ নয়। তবে পাঁড় মাতালদের হল্লা বলতে যা বোঝায় কিংবা বওয়াটে পিলইয়ার ছোকরাদের মত্ততা, তা কখনো হতে

ক্যাথলিকদের গীর্জা...

দেখিনি এখানে। 'ওকে'র প্রবেশপথের ওপরে বাঁ-দিকে ছিল স্টিল ব্র্যাকেটের গায়ে আঁটা OK—এই দুটি ইংরেজি আদ্যাক্ষর। ডান দিকে কাচের সুদৃশ্য বড়সড় জানালা। আর ঝুল বারান্দায় পেটা লোহার কারুকাজ করা থাম। বাইরে থেকে মনে হতো ওয়েস্টার্ন ধাঁচের কোনো সেলুন বুঝিবা। বেশ লাগত, ঢাকার জন্য কেমন বেমানান। ওইটুকু জায়গা কেমন একটা ঘোরে ফেলত। মনে হতো পশ্চিমের কোনো শহর—অদূরেই বুঝি বা চোখে পড়বে পাথরের চৌবাচ্চার মুখ দেওয়া *হিচিঙ রেইলে* বাঁধা কোনো ব্ল্যাক স্ট্যালিয়নকে। দরজা ঠেলে বেরিয়ে আসবে হোলস্টারে পিস্তল গোঁজা টুপভুজঙ্গ কেউ। মেহগিনির চকচকে দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে প্রথমে ছিমছাম পরিবেশে হংসধবল চাদরে মোড়া টেবিল, চারপাশে কারুকাজ করা ভিক্টোরিয়ান চেয়ার। এটা রেস্তোঁরা। ও পাশে আরেক ঘরে বার। উর্দি পরা বেয়ারাদের নিঃশব্দ পদচারণ এবং সমবেত আসবপায়ীদের উপাংশুকথন, মৃদুমন্দ আলো—সব মিলিয়ে রোমাঞ্চকর পরিস্থিতিই বিরাজ করত। আমার বেশ মনে পড়ে, এই ওকে-তেই এক বৃষ্টিঝরা ম্লান দুপুরে আমরা কজন বন্ধু কথাশিল্পী রাবেয়া খাতুনের প্রজাপতির নির্বন্ধ রচনায় মধুর এবং পাশাপাশি অধীর মুহূর্ত কাটিয়েছি।

দোতলায় ছিল আবাসিক হোটেলের ব্যবস্থা। সেকালে যেসব গুরুত্বপূর্ণ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা ঢাকায় পা রাখতেন, তাঁদের জায়গা হতো এই ওকে-তেই।

আজ যখন এই এলাকার পাশ দিয়ে কালেভদ্রে যাতায়াত করি, তখন কান্নাই পায়—ফুল সাহেব 'ওকে' আজ কোনো কাল্লু মিঞার হাতে পড়ে হতকুচ্ছিত পান্থশালা।

'ওকে' রেস্টুরেন্ট ওকে জানিয়ে দুই পা এগোতেই চোখে পড়ত নড়বড়ে পাঁচিল ও সিংহদরজা ছাড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঠুটঠোটা প্রাচীন দোতলা এক ভবন। দেয়ালে কবে চুনকাম পড়েছিল, কেউ বলতে পারবে না। জানালাগুলো না থাকলেই ভালো ছিল। কার্নিশে বট ও অশ্বত্থগাছের বাস। এটাই ন্যাশনাল মেডিকেল ইনস্টিটিউট।

এই ইনস্টিটিউটটি ১৯২৫ সালে স্বাধীনতা আন্দোলনের মহান ব্রত নিয়ে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে অসহযোগ আন্দোলনের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বেশ কিছু চিকিৎসক সরকারি পদ ত্যাগ করে এই ইনস্টিটিউটে যোগদান করেন। সুপারিনটেনডেন্ট হিসেবে যোগদান করেন ঢাকার অবসরপ্রাপ্ত সিভিল সার্জন ডা. শশাঙ্কমোহন মুখোপাধ্যায়। গভর্নিং বডির প্রথম সভাপতি ছিলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। সহসভাপতি ছিলেন স্যার

খাজা নাজিমউদ্দিন ও ব্যারিস্টার পি কে ঘোষ। এই ইনস্টিটিউট ব্রিটিশ সরকারের অনুমোদন না পাওয়ায় পাস করা ডাক্তারদের জন্য সরকারি চাকরির পথ ছিল বন্ধ। সেকালে এখানকার পাস করা ডাক্তারদের 'ন্যাশনাল পাস ডাক্তার' বলে আখ্যায়িত করা হতো—যদিও এরা এল এম এফ ডাক্তারদের সমতুল্য ছিলেন। পরবর্তীকালে এঁদের ন্যাশনাল-পাস বলে অবজ্ঞা করতে দেখেছি। চরম দুস্থ না হলে এঁদের ডাকা হতো না। এঁদের আত্মত্যাগের কথা ভাবলে এমনটা হওয়ার কথা ছিল না। এখানে উল্লেখ করা যায় ঢাকার মতো অখণ্ড বাংলার অন্যত্রও কিছু ইনস্টিটিউট গড়ে উঠেছিল।

পাকিস্তান হওয়ার পর অধিকাংশ ডাক্তার ও শিক্ষক দেশত্যাগ করার ফলে এই ইনস্টিটিউট ও তৎসংলগ্ন হাসপাতালটি দুর্যোগের মধ্যে পড়ে। ফলে ছাত্রের সংখ্যা কমে যায় এবং এই ভবনের পেছনে হাসপাতালের প্রয়োজনে প্রায় দুই বিঘা জমির ওপর গড়ে ওঠা হাসপাতালটিতে রোগীর সংখ্যা কমে যাওয়ায় অধিকাংশ ওয়ার্ড ও বেড রোগীশূন্য হয়ে পড়ে। স্থানীয় অতি গরিব বাসিন্দারাই এই হাভাতে হাসপাতালটিকে কোনো মতে বাঁচিয়ে রেখেছিল।

শুনলে বিশ্বাস হবে না, এই হাসপাতালেরই একাংশে ১৯৪৮ সালের শেষপাদে পূর্ব বাংলার চারু ও কারুকলা ইনস্টিটিউটটি (ইংরেজিতে East Pakistan Arts and Crafts Institute) প্রতিষ্ঠিত হয়। আর আমি ছিলুম এর দ্বিতীয় ব্যাচের ছাত্র।

দেশভাগের সময় ঢাকাতে কোনো চারুকলার স্কুল ছিল না। অথচ আমার ভারি ইচ্ছে ছিল এমন একটা স্কুলে পড়ি। এ বাবদে আমি একটা চিঠি দিয়েছিলুম ঢাকাতে সেকালে কোনো দৈনিক না থাকায় কলকাতার *ইত্তেহাদ* পত্রিকায়। তাতে এই আরজি ছিল ঢাকাতে যেন লাহোরের অনুরূপ একটা স্কুল হয়। কিছুকাল পরে জানতে পেলাম, কলকাতা থেকে এসে অবধি জয়নুল আবেদিন ভিক্টোরিয়া পার্ক-সংলগ্ন নরমাল স্কুলে শিক্ষকতার পাশাপাশি পূর্ব বাংলা সরকারের কাছে একটা আর্ট স্কুলের জন্য দেনদরবার শুরু করে দিয়েছেন। খবরটা জানলুম কামরুল ভাইয়ের (কামরুল হাসানকে এ সম্বোধন ছাড়া আর কী ভাবা যায়) কাছে। তত দিনে তিনিও ঢাকায় এসে গেছেন কলকাতার আর্ট স্কুলের মায়া ছেড়ে। তিনি তো আবার আমাদের মুকুল ফৌজের সর্বাধিনায়কও বটে।

১৯৪৯-এ যখন প্রবেশিকা পাস করলুম, তখন ফার্স্ট ব্যাচের সামনেই ফাইনাল পরীক্ষা। এই ব্যাচে তখন আমিনুল ইসলাম, হামিদুর রহমান, বিজন ভট্টাচার্য প্রমুখ ছাত্র ছিলেন। কাজেই বাবা আমায় ভর্তি করিয়ে দিলেন জগন্নাথ

কলেজে। কিন্তু আমার জেদের ফলে ডিসেম্বর মাসে নাম কাটিয়ে কামরুল ভাইয়ের সুপারিশে সেশনের মধ্যপথে আর্ট স্কুলেই পাকা হলাম। সহপাঠী হিসেবে পেলাম রশিদ চৌধুরী, কাইয়ুম চৌধুরী, মুর্তজা বশীর, আবদুর রাজ্জাক, জুনাবুল ইসলাম, একরাম, আলতাফ মাহমুদ, খালেদ চৌধুরী প্রমুখকে। এই তালিকার আমরা তিনজন তিন কারণে আঁকাবুঁকিতে ইস্তফা দিয়ে তিন দিকে ছিটকে পড়ি। প্রথমে বোধকরি আলতাফ—'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি'র অমর সুরকার। যত দিন স্কুলে ছিল ওর মধ্যে আমরা ভাবী সুরকারের কোনো আঁচ পাইনি। হুট করেই বিদায় নিলে একদিন—হয়তো ওর সুন্দরীভবনে খেলে যাওয়া সুরের আকর্ষণে। খালেদ, এই এখনকার ছেলেমেয়েরা যাকে 'গুরু' বলে মানে, একাধারে বাউণ্ডুলে, খ্যাপাটে আবার দর্শনের দুর্ভেদ্য জগতের অধিবাসী। ওঁর বান্ধব বলতে সুকুমার রায়, সঞ্জীব দত্ত, যাঁরা জগৎ সম্পর্কে মানুষ সম্পর্কে একটু ভাবত। যেভাবে এসেছিল বানভাসি হয়ে চলেও গেল একদিন—ওর নিজের জগতে। আমি যখন চারুকলার ছাত্র, তখন *ঝংকার* ও *রূপছায়া*র সম্পাদনা-প্রকাশনাও চলছিল পাশাপাশি। ক্লাসে খুব মনোযোগী ছিলুম বলব না। তবে মাঝে মাঝে শিক্ষকদের কাছে আমার অমনোযোগিতা ও রঙের জ্ঞান সম্পর্কে উপহাস শুনতে হতো আমাকে। এই যেমন, বাঃ মীজান, বেশ আঁকছ তো—আকাশটা সবুজ, নদীর পানিটা হলদেটে আর গাছগুলো—ও বাবা, এ যে দেখছি নীলচে! হবে হবে তোমার হবে!

এ বড় জ্বালাময়ী বাক্যবাণ। আমি নাকি color-blind—বর্ণান্ধ। তৃতীয় বর্ষে উঠে যখন বুঝলাম পেইন্টিং আমার দ্বারা হবে না, কারণ রং না বুঝলে আবার পেইন্টিং কীসের, তখন স্থির করে ফেললুম, আর নয়: যথেষ্ট হয়েছে। সময়ের শ্রাদ্ধ। সিধে আবার জগন্নাথ কলেজের দোরগোড়ায়! সেথো *রূপছায়া* (*ঝংকার* তত দিনে গতায়ু!)। পরে, অনেক পরে, ভ্যানগঘ-এর ছবিতে নির্বিচার হলুদ রঙের প্রাধান্য এবং রবার্ট ক্লাইনের নীল প্রাধান্য আমাকে ভাবিয়ে তুলেছিল। তবে কি এঁরা শুধু বর্ণান্ধ নন, একটি রংকেই চোখে বড় করে দেখতেন? চিকিৎসাশাস্ত্র কিন্তু এঁদের পক্ষে—অধিকাংশ বর্ণান্ধই রঙের রাজ্যে হলুদ ও নীল রং দেখে থাকে। এরা লালের সঙ্গে সবুজের এবং সবুজের সঙ্গে হলুদের গোলমাল করে ফেলে। চিকিৎসাশাস্ত্রে এদের dichromatic visionযুক্ত বর্ণান্ধ বলে। আমার দাঁতভাঙা এ ব্যাপারটা ছিল, এখনো দিব্যি আছে। তা যেন হলো। কিন্তু এই চোখ নিয়েই ভ্যানগঘরা কিন্তু দিব্যি ছবি এঁকে গেলেন দাপটে। আর আমি শিল্পীর তালিকাতেই নাম ওঠাতে পারলুম

না। এ তো গেল একটা দিক। আরেকটা গূঢ় ব্যাপার রয়ে গেছে যে! সেই গোপন তথ্যটি সেই কবেই জানিয়ে গেছেন চিত্রকরদের, কবিদের রাজা বোদলেয়ার : "নিসর্গ জগতের নিজের কল্পনা বোধ নেই, একঘেয়ে সবুজ তার চারণভূমি ও গাছপালা। যিনি আধুনিক তিনি চাইবেন চারণভূমির রং হোক লাল, গাছের রং হোক ঝকঝকে নীল। ...নিসর্গের একমাত্র কাজ হলো প্ররোচিত করা, শিল্পী-সাহিত্যিকদের প্রচ্ছন্ন অন্তরজগৎকে উদ্দীপ্ত করা।..."

আবার অন্যত্র : "প্রকৃতিতে যে বস্তুর যা রং ও আকার তাকে অনুকরণ করা ভুল; চিত্রকর নিজের ইচ্ছানুযায়ী রং করবেন; ইচ্ছে হলে আকাশকে সবুজ, গাছের পাতাকে লাল, মানুষের ত্বককে নীল করবেন।...[কারণ] বাস্তববাদীরা বস্তু-তথ্যকে অতিক্রম করে আত্মিক জগৎকে উপলব্ধি করতে পারেন না।"

আমি তাহলে আকাশকে সবুজ, নদীর জলকে লাল আর গাছকে নীল ভেবে অশুদ্ধ কিছু করিনি!

কিন্তু প্রায় আড়াই বছর এই যে চারুকলায় ছিলুম, রবীন্দ্রনাথের উক্তিকে একটু ঘুরিয়ে বলতে হয়—আমরা ছিলুম স্ত্রীলোকহীন জগতে। কোনো সহপাঠিনী ছিল না, মডেল ছিল না, ছিল না কোনো শিক্ষয়িত্রী। এ কেমন স্কুল! ভাবা যায়! আমাদের এমনই দিনমানের একটি দিনের কথা শুনুন :

কামরুল ভাইয়ের ক্লাস ছিল সেদিন। আমাদের কাজ বুঝিয়ে দিয়ে তিনি নিজের কাজে মগ্ন হয়েছিলেন। নিজ কাজ মানে হয়তো কোনো লাইব্রেরির বুক ইলাস্ট্রেশনের কাজ। মাস-মাইনেতে কুলোত না, তাই বাইরের কিছু বাড়তি কাজ। তুলির পোঁচ ও কলমের আঁচড় সমান পাল্লা দিয়ে চলছিল। এদিক-ওদিক তাকানো নয়। টুঁ শব্দটিও নয়। চশমার পুরু লেন্স ভেদ করে চোখ ওঁর স্থির নিবদ্ধ।

তুলি নয়, ক্রোক্‌ল্ নিবের আঁচড়ও নয়, আমাদের চলচিত্তচরণ তখন ডঙ্কিসহ বক্রগতিতে এক-পা দু-পা করে আগুয়ান। গতিতে এক পা দু-পা করে অগ্রসরমাণ পরস্পরযুক্ত বেঞ্চি ও কাষ্ঠাসনটিও, আরোহীসহ অনড় নয়। গতি সেখানেও সঞ্চারিত। গতিমুখ পশ্চিমের সারিবদ্ধ খোলা জানালা। জানালার বাঁ দিকে কি, না নিরীহ চার্চ! ডান দিকে ন্যাশনাল মেডিকেলের মূল দ্বিতল ভবন, যা এখন ইতিহাসের গর্ভে। সুমুখে তো কাচারির অট্টালিকাশ্রেণী আর ঠিক ওপরেই পুরো প্যানোরামা জুড়ে নীল, এবং নীল এবং নিদাঘ দুপুরের ডাক দেওয়া চিল। কিন্তু আমাদের কারও চোখ যে কোনো দিকেই নয়—চোখ যে চাতকের মতো নীচেয়, ঋজু ভঙ্গিতে একই দিকে ধাবমান ও নিবিষ্ট—মরীচিকায় প্রাচীর ভেঙে বিবসনা মরূদ্যানে অবাধ বিচরণ! সতীর্থ

রশিদ, কাইয়ুম, বশীর, রাজ্জাক, জুনাবুল—ক্লাসসুদ্ধ সবাই জানালার আকর্ষণে হুমড়ি খেয়ে। মাঝেমধ্যে নাকি সুরে কামরুল ভাইয়ের যথাবিধি শাসনে ডক্কিগুলো যথাস্থানে পুনঃস্থাপিত হলেও মুহুর্মুহু স্থানচ্যুতি!

পাঠকদের ধৈর্যচ্যুতি!

পাঠকদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটছে, বুঝতে পারছি। খুলে কই। আগেই বলেছি, আমাদের 'রমণী বিনে দিন যায় বহিয়া'র কথা। অথচ আমাদের বাড়তি ষষ্ঠেন্দ্রিয়ের অত্যাচারে এবং চিত্রাঙ্কনে 'অবলা'দের অতিরিক্ত মর্যাদার কারণে অনুক্ষণ ভূতাবাস ও অন্তর্জ্বালা। এই জ্বালা জুড়োবার জন্যই ওই জানালার প্রতি অনুরাগ। নীচেয় কী?

সর্বজয়া অপেরা পার্টির কুশীলবদের স্নানপর্ব। বেশ কদিন হলো এই যাত্রা পার্টিটি আমাদের আর্ট স্কুলের নীচেয় এসে তাঁবু গেড়েছে। অভিনয়-নৃত্যগীতাদিতে নিশিযাপন শেষে দিবানিদ্রান্তে দ্বিপ্রাহরিক প্রলম্বিত স্নান চলে এদের। সহজেই বোধগম্য শিল্পী হেমেন্দ্রকুমার মজুমদারের প্রণয়িনীরাই আমাদের লক্ষ্য ছিলেন। আমাদের বৈপরীত্যের স্বাভাবিক এষণা এবং মডেলের তৃষ্ণা এভাবেই নিবারিত হয়েছিল সেদিন।

কিন্তু কথায় বলে, চোরের সাত দিন, সাধুর এক দিন। ধরা পড়ে গেলুম সিক্তবসনাদের কাছে। অপেরার অধিকারী মশাই অধ্যক্ষ মহোদয় জয়নুল

..কুশীলবদের স্নানপর্ব...

আবেদিনের কাছে নালিশ ঠুকে দিলেন। আমাদের ক্লাসসুদ্ধ সমন হলো। অধোবদনে দাঁড়ালুম বলির পাঁঠার মতো স্যারের সামনে।

—কাজটা তোমরা মোটেও ভালো কর নাই—এগো কাছে আমরা ছোট হইয়া গেলাম —একথা তো তোমরা মানো?

রাগলে ময়মনসিংহের বুলির প্রাবল্য দেখা দিত স্যারের। আমাদের নীরব দেখে পুনরায় যোগ করলেন, আর য্যান অধিকারী মশাইয়ের নালিশ শুনতে না হয় ।যাও!

ছোট্টো ওই বাজখাঁই 'যাও' শব্দের মাঝে যাবতীয় ক্রোধের নির্বাণ ঘটায় আমরা প্রথমে হকচকিত হলেও পরক্ষণে অপরাধের গুরুত্বটা যেন জগদ্দলের মতো মরমে গিয়ে পশল। আমরা একে একে ভারবহনে অক্ষমের দল স্যারের ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

* * *

আমরা এবার সদরঘাটের পাঁচ রাস্তার কেন্দ্রে এসে গেছি। এর চারদিকে ঐতিহাসিক ও বর্ণাঢ্য সব অট্টালিকা এবং বইপাড়া। বৃন্দাবন ধর অ্যান্ড সন্স, আশুতোষ লাইব্রেরি ও বাংলাবাজারের বইপাড়ার কথা তো আগেই বলেছি। বলিনি বই পাড়ার কাগজপট্টির কথা, শিল্পীদের রং-তুলির দোকানের কথা। অন্যান্যের মতো আমার লেখাপড়ার কাগজ-কলম-পেনসিল জোগাত এই বাংলাবাজার—জোগাত আমার শিশু-কিশোরদের মাসিক *ঝংকার*-এর নিউজপ্রিন্ট, আর যখন আমি চারু ও কারুকলা ইনস্টিটিউটের পড়ো, যদ্দুর মনে পড়ে, আলী রেজা স্টোর ও আলম স্টেশনারি সরবরাহ করত রিভ্স কি পেলিকান কোম্পানির চাইনিজ ইঙ্ক, তুলি, ক্রোক্‌ল নিবযুক্ত কলম, কার্টিস পেপার—এই সব। বাংলাবাজারের মোড়েই ছিল ঢাকা জিপিওর লাল মস্ত বাড়ি। পাশেই বিশাল জায়গাজুড়ে ব্যাপটিস্ট মিশন—ওদের হোস্টেল, রিডিং রুম—আনন্দ ভুবন আর কাকে বলে! তবে লুক-যোহন-মথি লিখিত সুসমাচার নয়, আমাদের আকর্ষণ করত *স্টেটস্‌ম্যান, অমৃতবাজার পত্রিকা, পাঞ্চ*—এই সব পত্রপত্রিকা। মিশনের ভেতরটা অসূর্যম্পশ্যাই থেকে গিয়েছিল। সারা রিডিং রুমে একজনই কর্মী—সাদা শার্ট ও ধুতি পরিহিত কৃশকায় এক নিরীহ ভদ্রলোক ঠায় বসে থাকতেন, চোখজোড়া ছাড়া নড়াচড়া নেই—কোনো বই বেহাত হচ্ছে কি না কিংবা পাতা ছেঁড়া হচ্ছে কি না, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি তাঁর।

শাঁখারীবাজার থেকে বেরিয়ে যে ছোট রাস্তাটা সোজা সদরঘাটের বাকল্যান্ড বাঁধে গিয়ে শেষ হয়েছে, সেটাই চিত্তরঞ্জন এভিনিউ। আজকাল এই

বামুন রাস্তাটি জগন্নাথ কলেজ কর্তৃপক্ষের বর্বর দাপটে শাঁখারীবাজারের দিকটায় প্রাচীর তোলায় বন্ধই একরকম। এই রাস্তার দুই পাশে রয়েছে স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান (যা দেশভাগের পূর্বে ছিল ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল, ব্যাংক অব ইন্ডিয়া বর্তমানে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের ছাত্রাবাস), সেন্ট্রাল ব্যাংক অব ইন্ডিয়া, পোগোজ স্কুল, জগন্নাথ কলেজ, ইম্পেরিয়াল ও ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল। এই স্কুলের পেছনেই ব্রাহ্মসমাজ মন্দির ও ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরি। এই লাইব্রেরিটি বেশ প্রাচীন। আজ থেকে ৯৭ বছর আগে ১৯০৬ খ্রি., বাংলা ১৩১৩ সনে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন স্বনামখ্যাত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী। দেশভাগের পর ব্রাহ্মসমাজের প্রধানদের অনেকেই দেশত্যাগ করলে এর পরিচালকমণ্ডলীতে সমাজের বাইরের লোকদেরও স্থানলাভ ঘটে। এমনই দুজন ব্যক্তিত্ব ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ও কাজী মোতাহার হোসেন। এর নিয়মিত পাঠকদের মধ্যে অধ্যাপক আবুল ফজল, অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই, কবি হাসান হাফিজুর রহমান, কবি শামসুর রাহমান প্রমুখ ব্যক্তিত্বের নাম করা যায়।

এই লাইব্রেরির সঙ্গে জড়িয়ে আছে বর্ণাঢ্য অতীত। 'আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে/ কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে'—এই বিখ্যাত কবিতার কবি জীবনানন্দ দাশের জননী কুসুমকুমারী দাশ (১৮৮২–১৯৪৮) চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত এই লাইব্রেরি থেকেই প্রকাশ করতেন *ব্রহ্মবাদী* পত্রিকা (পত্রিকাটির প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক ছিলেন জীবনানন্দের পিতা সত্যানন্দ দাশ)। এই কাগজে 'বর্ষ-আবাহন' নামে কবিতা লিখেছিলেন জীবনানন্দ দাশ (বৈশাখ ১৩২৬)। আর মজা কী, এই পাঠাগার প্রাঙ্গণেই ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে কুসুমকুমারী খুলনার রোহিণীকুমার গুপ্তের কন্যা লাবণ্যের সঙ্গে তাঁর ছেলে জীবনানন্দের বিয়ে সম্পন্ন করেছিলেন। এই বিয়েতে *প্রগতি* পত্রিকার বুদ্ধদেব বসু, অজিত দত্ত, পরিমল রায় প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। এই লাইব্রেরিতে আমি মাঝেমধ্যেই যেতাম। দোতলায় ছিল পাঠাগার, নিচতলায় দোকান। খুব বড় নয়, খুব বেশি বইও নয়—কিন্তু সারিবদ্ধ পুরোনো আলমারি ও শেলফে যে বই ও পত্রপত্রিকা ছিল, তা ছিল সোনার খনি। সেকালের খ্যাতনামা সবার বই তো ছিলই, উপরন্তু *ভারতী*, *বিচিত্রা*, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত *Modern Review* ও *প্রবাসী*, *ভারতবর্ষ*, *বসুমতী*, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত *সাহিত্য* প্রভৃতি বিখ্যাত পত্রিকার কপি ছাড়া বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত *বঙ্গদর্শন*-এর জীর্ণ কপি দেখার সৌভাগ্যও আমার হয়েছিল। এ ছাড়া দেখা ও পড়ার সুযোগও হয়েছিল

দেবেন্দ্রনাথ ও রামমোহন রায়ধন্য *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা*। বসুমতী সাহিত্য মন্দির প্রকাশিত বিভিন্ন রচনাবলির সিরিজের সঙ্গে এই লাইব্রেরিতেই প্রথম পরিচিত হই। পুরোনো বইয়ের অদ্ভুত মায়াময় গন্ধ এবং সংস্কারহীন গা-শীতল-করা সুনসান পরিবেশে কত না আনন্দ ভরপুর দুপুর কেটেছে আমার! আজ আফসোস হয় কুসুমকুমারী দাশকে কেউ আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়নি বলে। হয়তো তুচ্ছ করেছে বালক ভেবে। হয়তো দেখেছি তাঁকে ব্রাহ্মসমাজ মিশনের মন্দিরে রোববারের কোনো ব্রাহ্মসংগীতের আসরে। কিংবা এমন হতে পারে, দেশ ভাগের ফলে তিনি ঢাকা ত্যাগ করেছিলেন।
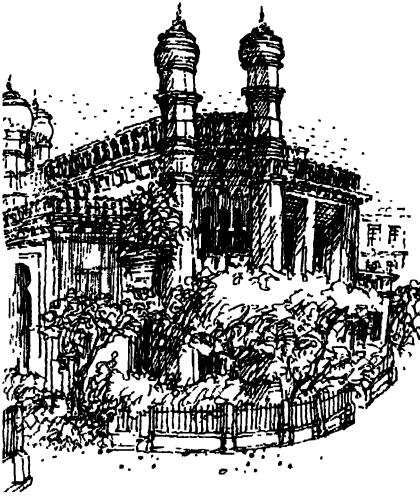
...নর্থব্রুক হল...

'আজ উপাসনা ও ব্রাহ্মসংগীত—আপনারা সকলে আমন্ত্রিত'—এমন এক উদাত্ত আহ্বানলিপি উপাসনালয়ের সবুজ অঙ্গনে শোভা পেত। কাজেই লাইব্রেরির মতো এখানেও ছিল আমার আনাগোনা। এখনো কানে বাজে সমবেত কণ্ঠের সেই সুললিত সুধাসংগীত।

কিন্তু একদিন সব শূন্যে মিলিয়ে গেল ছাই হয়ে, লুট হয়ে গেল সব। ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সময় যে-দুটি সমৃদ্ধ লাইব্রেরি লুট হয়ে যায়, তার মধ্যে একটি হলো এই রামমোহন লাইব্রেরি, অপরটি ফরাশগঞ্জের সুদৃশ্য নর্থব্রুক হল লাইব্রেরি। লাল ইটের গাঁথুনিসংবলিত এই অনুপম ভবনটির 'লালকুঠি' নামেও প্রসিদ্ধি আছে। রামমোহন ছিল মূলত বাংলা বইয়ের সমাহার, নর্থব্রুকে ইংরেজি। নর্থব্রুকে ছিল আনুমানিক ২০-২৫ হাজার বই। ইংরেজি ধ্রুপদী সাহিত্যের দামি বাঁধাই করা ভলিউমগুলো আজও চোখে ভাসে, চোখে ভাসে মেহগিনি কাঠের নির্মিত অপূর্ব কারুকাজ করা বিলিয়ার্ড টেবিলটার কথা। এসব কথায় পরে আসব। তো এ দুটো লাইব্রেরি লুট হয়ে গেল বিহারি লুটেরাদের হাতে। কিন্তু ব্যক্তিগত উদ্যোগে নিজের তাঁতীবাজারের পৈতৃক বাড়িতে তিল তিল

করে গড়ে তুলেছিলেন যে গ্রন্থাগারটি জগন্নাথ কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খণ্ডকালীন অধ্যাপক নারায়ণচন্দ্র সাহা, সেটি কিন্তু লুট হলো না, আগুনের লেলিহান শিখার থাবায় পুড়ে ছাই হয়ে পঞ্চভূতে মিশে গেল। আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল পাষণ্ড ওই বিহারি ষণ্ডেরাই।

নারায়ণ বাবু স্যার ছিলেন অকৃতদার। অধ্যাপনা ছিল তাঁর পেশা আর নেশা ছিল বই, বিশেষ করে ইতিহাসসম্পর্কিত বই। যা মাইনে পেতেন প্রায় সবটাই ঢেলে দিতেন বই কেনার পেছনে। পৃথিবীর তাবৎ বড় বড় প্রকাশনালয়ের সঙ্গে তাঁর ছিল যোগাযোগ—অর্ডার দিয়ে বই আনাতেন এদের কাছ থেকে বৈদেশিক মুদ্রার ঝক্কিঝামেলা মাথায় করে। আমাকে ও আমার দুই সহপাঠী আসাদ ও সাজাহানকে একটু বেশি ভালোবাসতেন, ইতিহাস সম্পর্কে আমাদের অনুসন্ধিৎসা দেখে। আমরা ছিলাম হরিহর আত্মা, তাই আমাদের একত্র নামকরণ করেছিলেন ট্রায়ামভাইরিট—আলাদা করে আমাকে সিজার, আসাদকে পম্পি ও সাজাহানকে ক্র্যাশাস বলে ডাকতেন। আর বলতেন, "তোমাদের আগের ব্যাচে যে ছেলেটি বেরিয়ে গেছে— আনিসুজ্জামান—দারুণ ছেলে ছিল, ব্রিলিয়ান্ট যাকে বলে। ভবিষ্যতে ওর হবে, দেখে নিও।" যাঁকে নিয়ে এত প্রশস্তি, তিনিই আজকের ইন্দিরা স্মারক পদকপ্রাপ্ত স্বনামধন্য প্রাবন্ধিক ও গবেষক ড. আনিসুজ্জামান। নারায়ণ স্যার লোক চিনতে ভুল করেননি। ঘিঞ্জি তাঁতীবাজারের যে বাড়িতে থাকতেন, সেটা ছিল মান্ধাতার আমলের বিষণ্ন এক ভবন। তারই তেতলায় বইয়ের সঙ্গে ঘর করতেন আমাদের স্যার। সবচেয়ে বড় ঘরটাতে লাইব্রেরি। অন্যান্য ঘরের চেয়ে একেবারে আলাদা—দামি ঝকঝকে শ্বেতপাথর মোড়া তার মেঝে, দেয়ালগুলো হংসধবল আর কী নিপাট সাজানো সব! আলমারিগুলো সেগুন কাঠের তো বটেই, তাইতে বার্নিশের কী জেল্লা! বইগুলোর প্রতি কী যত্ন! মনে হতো এইমাত্র দোকান থেকে কিনে আনা। গিবন, ম্যাকলে, মেইটল্যান্ড, টয়েনবি, কার্লাইল, হেরেডোটাস, ব্রাইস, স্মিথ—সবাই, সবাই আছেন মজুত। একবার গিয়েছি, সমাদর করে বসালেন। হাতে তাঁর বিলেত থেকে সদ্য আসা প্যাকেট-মুক্ত বই, প্রায় কান্নাজড়িত কণ্ঠে বললেন, "দেখেছ, পোস্ট অফিসের লোকগুলোর কী বজ্জাতি—দুমড়েমুচড়ে একশা! ওদের একটু মায়া হয় না।" বলে বইয়ের মলাটের যে অংশ একটু মুচড়ে গেছে, তার সেবায় মত্ত হয়ে পড়েন। নতুন বইয়ের প্যাকেটের মদালস গন্ধে ঘরের চারদিক আমোদিত। নারায়ণ বাবুর চোখেমুখে কী স্বর্গীয় আভা, কী প্রশান্তি!

আমি একটা ভলিউম তুলে নিলাম—উইল ডুরান্টের *The Story of Civilization*। কিন্তু সভ্যতার ইতিহাস তো অসভ্যতার ইতিকথা—এই তো আমার স্যারের এত যত্নে গড়ে তোলা, তাঁর জীবনের প্রাণের ধন লাইব্রেরিটা কত সহজেই না পুড়িয়ে দিতে পারল বর্বর ওই বিহারিরা—যেমন একদিন জ্বালিয়েছিল বাগদাদের লাইব্রেরি হালাকু খান, আলেকজান্দ্রিয়ার লাইব্রেবি জ্বলেপুড়ে খাক হয়ে গিয়েছিল জুলিয়াস সিজারের আক্রমণকালে এবং রানি ইসাবেলা ও রাজা ফার্দিনান্দের ঘৃণ্য উষ্মার কারণে ভস্মীভূত হয়েছিল আলহামরা লাইব্রেরি। ঐতিহাসিক গিবন খ্রিষ্টানদের দ্বারা আলহামরা লাইব্রেরি ধ্বংস সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছিলেন, 'সভ্যতার অগ্রগতিতে স্পেন ৫০০ বছর পিছিয়ে গেল।' সেসব কথা এখন থাক, উপস্থিত আমাদের ভাগ্য যে, বইগুলো বাঁচাতে না পারলেও নারায়ণ বাবু তাঁর মাসহ বাড়ির অন্য সবাই বিপদ বুঝে অন্যত্র সরে যাওয়ায় প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলেন বিহারিদের হাত থেকে। কিন্তু সমস্ত বাড়িটা পুড়ে গিয়েছিল আর তার সঙ্গে তাঁর প্রাণসম বইগুলো।

অনেক দিন পরে তাঁর সঙ্গে রাস্তায় দেখা হয়েছিল। নারায়ণ বাবুর চোখেমুখে হাসি, যে হাসির অনেক অর্থ করা যায়। ছোট্ট করে বললেন, "আর দেখা করতে নেই বুঝি?"

আমি কী বলব। এ প্রশ্নের জবাব নেই। বলতে পারলাম শুধু, "স্যার, ভালো?"

"এই তো...।" বলেই কেমন যেন ভূতগ্রস্তের মতো ধুতির কোঁচাটা বাঁ হাতে তুলে নিয়ে আর বাক্য ব্যয় না করে চলে গেলেন।

আমি সেদিকে তাকিয়ে ভাবলুম, একটা মানুষ কত অর্থে নিঃসঙ্গ হতে পারে! ওঁর এই নিঃসঙ্গতার জন্য কেন যেন আমার নিজেকেও দায়ী মনে হলো।

নারায়ণ বাবুরা চার ভাই। বড় বঙ্কিমচন্দ্র সাহা, ঢাকার বিখ্যাত *চাবুক* পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। সেজো গোপালচন্দ্র সাহা ছিলেন উকিল আর ছোট ভাই গৌরচন্দ্র সাহা ছিলেন চাবুক প্রিন্টিং প্রেস ও ঢাকা ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটরসের মালিক। এই প্রেসটি প্রথমে 'মুকুল' সিনেমা হলের পেছনে ছিল। পরে তাঁতীবাজারে স্থানান্তরিত হয়। এটাও আগুনের কবল থেকে বাঁচতে পারেনি। প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে সবাই একে একে কলকাতা চলে যান, বঙ্কিম বাবু তো পঞ্চাশের দাঙ্গার পরপরই। শুধু রয়ে গেলেন আমাদের নারায়ণ বাবু স্যার। একা ওই ভুতুড়ে বাড়িতে। একবার ছোট ভাই ওঁকে কলকাতায় নিয়ে গিয়েছিলেন একরকম জোর করে। থাকতে পাবেননি। এক সপ্তাহ পুরোতে না-পুরোতেই মাটির টানে ফিরে এসেছিলেন নিজ বাসভূমে। আর গড়া হয়নি

নতুন করে লাইব্রেরি। অবসর জীবনের সামান্য প্রাপ্তি সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত করেছিল তাঁকে। কালচে হয়ে যাওয়া শ্বেতপাথরের মেঝে আর দেয়ালগুলোর দিকে তাকিয়ে তাঁর হাহাকার করা দিনমান কেমন করে কেটেছে, তা ভাবতেও ভারি কষ্ট হয়। স্মৃতি সতত সুখের—এই আপ্তবাক্যটি কত মিথ্যে হয়ে গেল নারায়ণ বাবুর জীবনে! অবশেষে আত্মীয়বিহীন নিঃসঙ্গ জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে পোড়া ওই ভিটেয় ইতিহাসের নির্মম সাক্ষী হয়ে আশির দশকের দোরগোড়ায়। তাঁর বইগুলোর মতোই তাঁর মরদেহ ভস্মীভূত হয়ে মিশে গেছে পঞ্চভূতে, ছাইগুলো মিশে গেছে বুড়িগঙ্গার পবিত্র জলে। আর এই খবরটা আমায় পৌঁছে দিল *প্রভাতী* দৈনিক তার obituary কলামে।

এর আগে কাচারির কথা বলতে গিয়ে নামোল্লেখ করেছিলুম মাত্র। অথচ এই কাচারিতে আমার জীবনের একটা মজার ঘটনা ঘটে গিয়েছিল। মজার, আবার একদিক থেকে ঐতিহাসিকও বটে। আমাদের দেশে সাহিত্যে শ্লীলতা-অশ্লীলতা নিয়ে, আমার ধারণা, কখনো মামলা-মোকদ্দমা হয়নি। আমি কিন্তু জড়িয়ে পড়েছিলুম এমনই একটি মামলায়, তাও কিনা রাজসাক্ষী হিসেবে!

আমি তখন পুলিশ কো-অপারেটিভ সোসাইটি প্রকাশিত সাপ্তাহিক *ডিটেকটিভ* পত্রিকার সম্পাদনার সঙ্গে জড়িত। সেটা ১৯৬২ সাল। একদিন একজন পুলিশ কর্মকর্তা এসে বললেন, আপনাকে একটি উপন্যাসের অশ্লীলতা বিষয়ে সরকার কর্তৃক দায়ের করা মামলায় রাজসাক্ষী হতে হবে। উপন্যাসটি ছিল ফজল শাহাবুদ্দীনের। আমি উপন্যাসটি (নাম মনে নেই) পড়েছি। ওটা মোটেও অশ্লীল মনে হয়নি আমার। এ কথা জানিয়ে রাজসাক্ষী হওয়ার বিরুদ্ধে মতামত দিলে পুলিশ কর্মকর্তা তাঁর প্রস্তাবে অনড় থেকে চলে যান।

কবি শাহাবুদ্দীনকে বলতে তিনি উদ্বিগ্ন হন। আমরা দুজনে পরামর্শ করে আওয়ামী লীগের অন্যতম শীর্ষ নেতা অ্যাডভোকেট কফিল উদ্দিন চৌধুরীর দ্বারস্থ হই। তিনি ভরসা না দেওয়ায় এবার মুসলিম লীগ নেতা অ্যাডভোকেট শাহ আজিজুর রহমানের কাছে যেতে তিনি সানন্দচিত্তে গ্রহণ করেন। তবে *লেডি চ্যাটার্লিজ লাভার* গ্রন্থের মামলার নথিপত্রসংক্রান্ত গ্রন্থটি দিতে বলেন। কলকাতা থেকে সংগ্রহ করে বইটি তাঁকে দিতে সমর্থ হই।

কয়েক দিন পর সমন এসে হাজির। লেখকের সঙ্গে যোগাযোগ করে কাচারিতে যথাদিনে হাজির হলাম। অ্যাডভোকেট শাহ আজিজুর রহমানও যথাসময়ে হাজির হলেন।

মামলা উঠলে বিচারক রাজসাক্ষী হিসেবে আমাকে সাক্ষী দিতে বলেন। আমি তখন আমার বিনা অনুমতিতে আমাকে রাজসাক্ষী করার জন্য অভিযোগ

করলে আদালত গুঞ্জনমুখর হয়ে ওঠে। এরপর আমি উপন্যাসটি সামগ্রিকভাবে না পড়ে যদি অংশবিশেষ পড়া যায়, তাহলে অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট হতে পারে মন্তব্য করে বললাম, কিন্তু এ ক্ষেত্রে আংশিকভাবে পড়ার বা বিচার করার অবকাশ নেই, কারণ, রচনার পূর্ণ কাঠামো নিয়েই উপন্যাসটি গড়ে উঠেছে। যদি বিচার করতে হয়, তাহলে একাগ্রচিত্তে অনবচ্ছিন্ন অধ্যয়নই এর শ্লীল-অশ্লীল বিচারের পথ। এর কোনো বিকল্প উপায় নেই।

শাহ আজিজুর রহমান ডি এইচ লরেন্সের *লেডি চ্যাটার্লিজ লাভার* উপন্যাসটির বিখ্যাত মামলার সূত্র ধরে এবং আমার মন্তব্যের আলোকে কথিত উপন্যাসটি যে অশ্লীল নয়, তা প্রতিপন্ন করতে সফল হলেন।

মহামান্য বিচারক আমাদের অর্থাৎ লেখকের পক্ষে রায় দিয়ে তরুণ ঔপন্যাসিককে পরামর্শ দিয়েছিলেন এই বলে যে, "আপনার উপন্যাস অশ্লীল নয়, একথা মেনে নিয়েও বলব, আমাদের ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আলোকে কোনো বিষয় বর্ণনা করতে গিয়ে এমন কোনো শব্দ নির্বাচন করবেন না বা এমন কোনো বাক্য নির্মাণ করবেন না, যাতে করে পাঠক সাধারণের অন্তর্লোক বিচলিত ও বিক্ষুব্ধ হয়। আর এ কাজটা এমন কোনো দুরূহও নয়, বিশেষ করে, যেখানে সমার্থক শব্দ রয়ে গেছে।"

আজও কোনো কাজে-কর্মে কাচারি অতিক্রম করলে এই পুরোনো ঘটনাটা মনে পড়ে যায়। মনে পড়লে ভালোই লাগে।

ঢাকা নামেতেই ঢাকা, সাবর্ণ ছিল না কোনো কালে, না তার শানশওকতের ঝলমলে দিনগুলোয়, না পড়তি কালে। সদা উন্মুক্ত ছিল এর সিংহদরজা। এই অবারিত তোরণ দিয়ে মোগল, পাঠান, ইংরেজ শাসকদের যেমন আগমন ঘটেছিল, পর্তুগিজ, আর্মানি, ফরাসি ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো থেকেও তেমনি আগমন ঘটেছিল পরিব্রাজক, ধর্মপ্রচারক ও বণিকদের। এ ছাড়া মহাচীন থেকেও এসেছিলেন পরিব্রাজকের দল; বিশেষ করে, বৌদ্ধধর্মের লীলাভূমি দেখার মানসে এই শহরে, এই বঙ্গভূমিতে পদধূলি পড়েছিল তাঁদের। এভাবে ইসলাম, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধধর্মের পাশাপাশি শিখদেরও আগমন ঘটেছিল আমাদের এই ঢাকায়। মসজিদ, মন্দির, বৌদ্ধমঠ, গির্জা তো অহরহই চোখে পড়ে; কিন্তু এই ঢাকাতে যে একটা শিখ উপাসনালয়ও আছে, অনেকেই তা জানেন না। অথচ একরকম চোখের সামনেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজারো ছাত্রছাত্রীর কোলাহলের মাঝেই আত্মসমাহিত শিখ সঙ্গতটির নিঃসঙ্গ অবস্থান। এই কয়েক বছব আগে তো ঝোপঝাড়ের আড়ালে

পড়া সংস্কারহীন সঙ্গতটির অস্তিত্ব আছে কি নেই, চোখেই পড়ত না। এখন কিন্তু সংস্কারের পর শ্রী ফিরেছে। হংসধবল ভবন ও সব দেয়াল এখন পরিব্রাজকদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

পাঠক, ভাবছেন পুরোনো ঢাকার কলরব থেকে কেন নতুন ঢাকার রূপে মজলুম। প্রাচীনের এই দোষ, একটু প্রাণভরে নিঃশ্বাস ফেলার জন্য বৃক্ষহীন পাষাণপুরী ওই পুরোনো ঢাকা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য মনটা আইঢাই করছিল। তাই এই বাঁক নেওয়া। কিন্তু এই যে বললুম নতুন ঢাকার কথা—এর কথা বলতে গিয়ে বলছি কিন্তু আসলে পুরোনো ঢাকারই কথা। কথাটা প্রহেলিকার মতোই মনে হবে। কিন্তু এর আগে যা বলেছি কিংবা এখন যা বর্ণনা করতে যাচ্ছি, এ তো ঢাকার পুরোনো ইতিহাসই। এই যে নতুন ঢাকা বলছি, চোখের সামনে গত পঞ্চাশ বছরে গড়ে উঠছে অসম্ভব দ্রুতগতিতে—এটা কিন্তু ছিল পুরোনো বৃহত্তর ঢাকা মহানগরেরই অংশ। ঘনবসতি ছিল না, বাড়িঘর দূরে দূরে—কিছু গ্রাম কিছু নগর; কিন্তু সব মিলিয়ে ঢাকা মহানগরেরই অংশ ছিল। আজ সেই ফাঁকা জায়গাগুলো, সেই সবুজ গ্রামগুলো ভরাট হচ্ছে এই মাত্র। এবার আসুন আমরা ফিরে যাই অসাম্প্রদায়িক ঢাকার কোলে—ওই শিখদের সঙ্গত প্রসঙ্গে। আজ থেকে দেড় শ বছর আগে এই ঢাকার বুকে যে শিখ সম্প্রদায়ের আধিক্য ছিল, এটা বোঝা যায় টেইলার সাহেবের *Topography of Dacca* গ্রন্থ্ থেকে। এই বই থেকে জানা যায়, ১৮৪০ সালে টেইলার সাহেব নিজেই ঢাকাতে ১২টি শিখ সঙ্গত অর্থাৎ উপাসনালয় দেখেছেন। আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনসংলগ্ন সঙ্গতটি (গুরুদাওয়ারাও বলা হয়) ছাড়া অবশিষ্ট সঙ্গতগুলোর চিহ্নমাত্র নেই। সেগুলোর অবস্থান সম্বন্ধেও কেউ কিছু বলতে পারেন না।

একসময় এই এলাকাটির নাম ছিল সঙ্গতটোলা, তাও আমরা অনেকে জানি নে।

আপনারা যদি অনুমতি নিয়ে কখনো এই সঙ্গতের ভেতরে যান, তাহলে এর প্রাঙ্গণে দেখতে পাবেন বিভিন্ন সময়ে নিযুক্ত মোহন্তদের সমাধি। এই ক্ষুদ্র ভবনের একটি ছোট ঘরে গ্রন্থ্ সাহেবের পুজো হয়। সুমুখ ভাগের উঁচু বেদিতে স্থাপিত কালো পাথরে খচিত রয়েছে শিখ সম্প্রদায়ের গুরু নানকের পদচিহ্ন। সঙ্গতের বৈঠকখানাটি সেকালের স্থাপত্যরীতিতে নির্মিত—অর্থাৎ শায়েস্তাখানি রীতি অনুসরণে রচিত। প্রাঙ্গণে আছে বেশ বড়সড় একটি ইঁদারা। এটা গুরু নানকের ইঁদারা নামে পরিচিত। এই ইঁদারাকে ঘিরে একটা প্রবাদ আছে। তাতে বলে, গুরু নানক নাকি একদা এই মহানগরে পা রেখেছিলেন এবং

পথের পাশের উল্লিখিত ইঁদারার সুপেয় জল পান করে তৃষ্ণা নিবারণ করেছিলেন। গুরু নানকের জলপানের সঙ্গে জড়িত এই ইঁদারা অতঃপর নানা অলৌকিক ইতিকথার জন্ম দেয়। এর জলস্পর্শে কিংবা পান করলে নানা রোগব্যাধির নিরাময় হয় এবং বিপদ-আপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়। এমন অলৌকিক গুণের কথা ছড়িয়ে পড়লে এই বঙ্গদেশে যা হয়, তা-ই হলো। জাতি-ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে অনেকেই ভিড় করতে শুরু করে এই ইঁদারার চারপাশে। এরপরই এই সঙ্গতের প্রতিষ্ঠা—আছে এমন জনশ্রুতি। কিন্তু এই সঙ্গত ও তার প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে অন্য কথাও শোনা যায়। নানক নয়, নবম সম্রাট আওরঙ্গজেবের আমলে শিখগুরু তেগ বাহাদুরের ঢাকা আগমন ঘটেছিল এবং
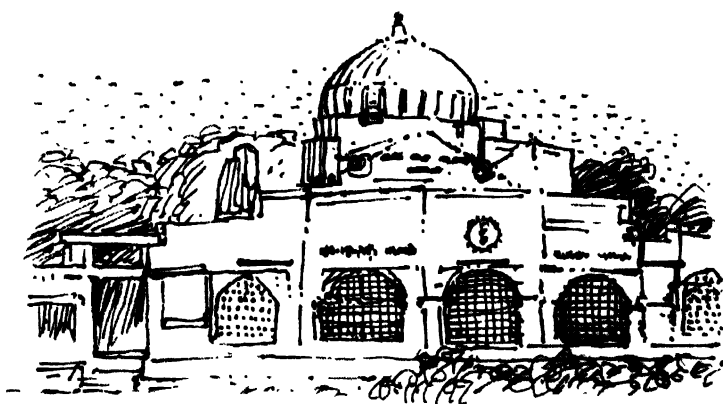
গুরুদুয়ারা

তাঁকে ঘিরে এক শিষ্যমণ্ডলী গড়ে ওঠে। পরবর্তীকালে তেগ বাহাদুরই বর্তমান শিখসঙ্গতটি প্রতিষ্ঠা করেন। নাজির হোসেন তাঁর *কিংবদন্তীর ঢাকা*তে এ সম্পর্কে আরও জানাচ্ছেন, "শিখ সঙ্গতের নাম অনুসারে সঙ্গতটোলা নামকরণ হয়েছে। অষ্টাদশ শতকের শেষাংশে গুরু তেগবাহাদুরের সময় পর্যন্ত এখানে শিখ সঙ্গতের অবস্থান ছিল। কথিত আছে, গুরু তেগবাহাদুরের কাছে শিখরা এই মর্মে আবেদন করেছিল যে, ভারতের পূর্বাঞ্চলের শিখদের পক্ষে সুদূর পাঞ্জাবে এসে গুরু দর্শন কিংবা তীর্থ করে যাওয়া সম্ভব হয় না। সেই কারণে গুরুর আদেশে ঢাকায় শিখ সঙ্গতের প্রতিষ্ঠা। কিন্তু এই সঙ্গতকে ঘিরে আছে আরও প্রবাদ। শিখদের কেউ কেউ এই উপাসনালয়কে নথা সাহেবের সঙ্গতও বলে থাকেন। ষষ্ঠগুরু হরগোবিন্দের সময় যেসব শিখ ধর্মপ্রচারক ভারতের

সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েন, তাঁদের অন্যতম হলেন নথা সাহেব। তিনি বঙ্গদেশে পা ফেলে ঢাকা মহানগরকেই বেছে নেন তাঁর ধর্মপ্রচারের স্থান হিসেবে। তাই অনেকের অভিমত, রমনার এই বিশ্ববিদ্যালয়সংলগ্ন সঙ্গতটি নথা সাহেবই প্রতিষ্ঠা করেন।"

যিনিই এই সঙ্গতের প্রতিষ্ঠাতা হোন না কেন, ঢাকা মহানগর যে এই অঞ্চলে একসময় শিখ ধর্মাবলম্বীদের লীলাভূমি ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু অবাক কাণ্ড, আজ এই সঙ্গতটি ঘিরে শিখদের কোনো উৎসাহ দেখিনে, ঢাকাতে আদৌ শিখ সম্প্রদায় আছেন কি না, সে বিষয়েও সন্দেহ। একদা যেখানে ধর্মগুরু ও তদীয় শিষ্যদের সমাগমে ধন্য ছিল এই নগর, যেখানে একটি নয় দুটি নয়, ১২টি শিখ সঙ্গত ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল, সেখানে শিখদের অস্তিত্বই নেই, এটা বিস্ময়ের বিষয় বইকি! এ নিয়ে গবেষণা হওয়া প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। তবে ব্যবসা উপলক্ষে কিংবা স্থানীয় ভারতীয় হাইকমিশনে কর্মরত অনুসন্ধিৎসু শিখ কর্মচারীদের এখানে মাঝেমাঝে পদার্পণ ঘটে বইকি!

যে ইঁদারাকে ঘিরে সঙ্গতের প্রতিষ্ঠা, তার গুরুমুখী ভাষায় লিখিত প্রস্তরফলক থেকে জানা যায়, ১৭৪৮ খ্রিষ্টাব্দে মোহন্ত প্রেমদাস এই ইঁদারাটির একবার সংস্কার সাধন করেছিলেন।

এই শিখ সঙ্গত বা গুরু দাওয়ারা ধরে সামনে এগোলে ভাইস চ্যান্সেলরের ভবন পেরিয়ে নীলক্ষেতের চৌরাস্তার মোড়ে এলেই হঠাৎ করেই শহর শেষ হয়ে গেল বলে মনে হতো ওই '৪৭-'৪৮ সালে। সুমুখে হঠাৎ আলোর ঝলকানি, অবারিত আকাশ আর দিগন্তব্যাপী নীল আর সবুজের হৃদয়কাড়া পটভূমি কী যে ঘোরে ফেলত, তা কলমের আঁচড় কেটে বোঝানো যাবে না। এখন যেখানে নিউমার্কেট, সেখানে ছিল গাছপালা আর জমিজমা—সরু একটা পাকা রাস্তা চলে গেছে মিরপুরের দিকে—দুই পাশে খোলামেলা জায়গা আর ধানমন্ডি থেকে গ্রাম তার পুরো চেহারা নিয়ে হাজির। নাজির হোসেন সাহেব তাঁর *কিংবদন্তীর ঢাকা* গ্রন্থে লিখেছেন, "ধানমণ্ডি আজকের অভিজাত আবাসিক এলাকায় পরিণত। এক সময় ধান উৎপন্ন হত বলে নয়, সম্ভবত এখানে বীজের (এবং অন্যান্য শস্যের) হাট বসতো বলেই এই নামকরণ হয়েছে।" কী কারণে নামকরণ হয়েছে, আমি বলতে পারব না, তবে ধানমন্ডিতে প্রচুর ধানি জমি আমি দেখেছি। ফাঁকে ফাঁকে ছোট ছোট পল্লি। যখন ধানমন্ডি অভিজাত এলাকার জন্য নির্বাচিত হলো এবং জমি দখলের কাজ শুরু হয়ে গেল, তখনকার করুণ ছবি আজও

আমার মনে পড়ে। এই এলাকায় আমাদের ভাগ্যেও জুটেছিল ১০ কাঠার ছোট্ট প্লট। কত যুগ-যুগান্তরের ভিটে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে, সজল চোখে তাই দেখছে হতভাগ্য কুটিরবাসী কৃষক। বেশ কিছুকাল পরে, ধানমন্ডি যখন অভিজাত এলাকায় রূপ নিয়েছে, একদিন ১৫ নম্বর রোড ধরে রিকশাযোগে যাচ্ছি, রিকশাওয়ালা বললে, "সাহেব, এই ধানমন্ডিতেই একসময় আমার বাড়ি ছিল।" বলে ডান দিকের একটি সুরম্য অট্টালিকার দিকে আঙুল দেখিয়ে পুনরায় বললে, "এই যে বাড়িটা দেখছেন, এখানেই ছিল আমার বাড়ি। আর এই যে, যে রাস্তা ধয়ে এগোচ্ছি, এর আশপাশের চার বিঘা ধানি জমি ছিল আমাদের।"

তুমি এখন কোথায় থাকো? এই যে জমি নিল সরকার, এর জন্য ক্ষতিপূরণ পাওনি? আমি অপসৃয়মাণ অট্টালিকার দিকে তাকিয়ে ন্যুজদেহ বৃদ্ধ রিকশাওয়ালার দিকে চোখ ফিরিয়ে প্রশ্ন করলাম।

"হ্যাঁ, পেয়েছিলাম। পেয়েই রিকশা কিনে ফেলি দুইটা। নিজে একটা, আরেকটা ভাড়া খাটাতে শুরু করি। খোদার ফজলে আর আপনাদের দোয়ায় আজ আমার চল্লিশটা রিকশা। কলাবাগানে ছোটোখাটো একটা জায়গাও আছে। ছেলেটা ঢাকা কলেজে বি এ পড়ে।"

এক নিঃশ্বাসে রিকশাওয়ালা তাঁর সাফল্যের ইতিহাস বলে গেল। কিছুক্ষণ আগে বৃদ্ধের মন্দভাগ্যের জন্য যে কষ্ট পাচ্ছিলাম, তা লাঘব হলো। বললাম, বাহ্, আপনি তো বেশ ভাগ্যবান, তো এখন এই বয়সে আর রিকশা চালান কেন? আপনার ভাগ্য তো ফিরে গেছে।

"হক কথা। এ কথা আমার ছেলেও বলে। ওর আবার আত্মসম্মানটা কলেজে গিয়ে চাড়া দিয়েছে বেশি। ও বলে, "বাবা আমার বন্ধুরা কী বলবে। সারা জীবন তো কষ্ট করলে। এখন একটু বিশ্রাম নাও।" বুঝলেন, মাঝে মাঝে অভিমান করে ধমকও দেয়। বড় হয়েছে ছেলে—কথা শুনতে হয়। মাঝে মাঝে রিকশা চালানো ছেড়ে দিই। কিন্তু বুঝলেন, অভ্যাস ছাড়তে পারি না। পা-টা সুড়সুড় করে। প্যাডেলে পা না পড়লে আর হ্যান্ডেলে হাত না রাখলে সারা রাত ঘুম হয় না। তাই ফাঁক পেলেই রিকশা চালাই—ছেলে যাতে বুঝতে না পারে, সেদিকে দৃষ্টি রাখি। ধরা পড়লে বলি, 'এই রাতবিরেতে কে আর আমাকে চিনবে রে ব্যাটা?' বলে হা হা করে হাসি।"

ততক্ষণে আমার গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গেছি।

আজ পয়লা পৌষ, ডিসেম্বরের ১৫, কিন্তু শীত তেমন নামেনি। যাদের গরম কাপড়ের অভাব নেই, রাতে নিরাপদ লেপের উষ্ণ সান্নিধ্য কামনায় মন-

প্রাণ উৎিপিষি, পিঠেপানার আহ্বান যাদের জিভকে আজও আকুল করে তোলে, হাড়কাঁপানো শীত তাদের আয়েশি তালিকায় আবশ্যিক বটে। কিন্তু ঢাকার পোড়াকপালে বস্তিবাসী কি ফুটপাতবাসীর জন্য বিলম্বিত শীত যে আশীর্বাদ। পিঠে তো নাস্তি, ওদের গায়ের চামড়ায় যদি ভেড়ার মতো লোম গজায়, তাহলে বোধকরি ওরা স্বস্তি পায়।

এই যে বললাম পিঠের কথা, সেকালে, ওই চল্লিশের দশকের শেষ পাদে, প্রায়-গ্রাম্য ঢাকাতে ওটা ছিল। শীত এল কি ঘরে ঘরে ভাপা, আন্দেশা, পিঠেপুলি, দুধকলি, পাটিসাপটা, বিবিখানা ও মামুলি মালপো বানানোর ধুম পড়ে যেত। শুধু কি ঘরে, বাইরেও তার ছিল ভারি চপট। রাস্তার ধারে (তখন তো বাংলাবাজার-পাটুয়াটুলির মোড় থেকে কুমিল্লা ব্যাংকের পাশ দিয়ে যে রাস্তাটি সদরঘাটের দিকে চলে গিয়েছে, তার দুই ধারের ফুটপাত ছাড়া শহরের কোথাও ফুটপাত বলে কিছু ছিল না) পিঠারিদের হাতের গরম পিঠাও কমবেশি সব পল্লিতেই পাওয়া যেত। যাদের পিঠে বানানোর সুযোগ ছিল না, তাদের জন্য এই পিঠারিওয়ালারা ছিল একমাত্র ভরসা, অবলম্বন—যা-ই বলি না কেন। গ্রাম থেকে শহরবাসী আত্মীয়ের বাড়ি পালকিতে চড়ে বেড়াতে আসা অতিথিরা খালি হাতে আসতেন না, সঙ্গে থাকত হয় পাত-ক্ষিস্‌সার পুর দেওয়া পাটিসাপটা, নয়তো ভাপা কি বিবিখানা। অবাক হবেন না, পালকি তখনো ঢাকার বুকে একেবারে অন্ত্যজ ছিল না।

সেকালে ঢাকায় শীতের আগাম বার্তা বয়ে নিয়ে আসত ঘুড়ি : কলকাতায় ঠিক তার উল্টো—গ্রীষ্ম-বর্ষা সমাগমে ঘুড়ি ওড়ানোর মৌসুম শুরু হতো। শেষ হতো ভাদ্রের শেষদিকে বিশ্বকর্মার পুজোর দিন। অর্থাৎ গ্রীষ্মের শেষাশেষি বর্ষাকালে শুরু হয়ে হেমন্তকালে সমাপ্তি। ঘুড়ি ওড়ানোর এই কালটাকে বেছে নেওয়ার যুক্তি হলো—বৃষ্টির আশঙ্কা হয়তো থাকে; কিন্তু হাওয়া অফুরন্ত মেলে, যা ঘুড়ি ওড়ানোর চালিকাশক্তি। কিন্তু ঢাকাতে শীতকালে কেন যে ঘুড়ি ওড়ানোর প্রচলন, বুঝতে পারি নে। কারণ, হাওয়ার প্রকোপহীন নিস্তেজ আকাশে ঘুড়ি উড়বে কোন শক্তিতে? তেমন ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলেই আকাশে ঘুড়ি তোলার আনন্দ পেতাম। অর্থাৎ ছাতে উঠে হাওয়ার আশায় অপেক্ষা করতে হতো বইকি। তবে একবার বায়ুস্তরের স্বাভাবিক উচ্চতায় ওঠাতে পারলে ঘুড়ি ওড়ানোর আনন্দ জুটত। আমার এখনো মনে পড়ে ঢাকাইয়া কিছু বুলি, 'ঢিলি ঢিলি সফেদা কো।' অর্থাৎ, ওহে সাদা ঘুড়িওয়ালা, সুতোয় ঢিল দাও, সুতো ছাড়ো, অতো ডরকো হলে চলে? অথবা কেউ যদি ময়ূরপঙ্খি ঘুড়ি ওড়াত,

তাহলে 'কাওয়া কাওয়া' অর্থাৎ 'কাক' বলে বিদ্রূপ করে উঠত। আমাদের পাড়ায় ছিল চান বলে একটি ছেলে। গায়েগতরে দশাশই; কিন্তু গা-পেতে ঝগড়া করতে এলে ববাবর ও আমার হাতের মুষ্ট্যাঘাতে ধরাশায়ী হতো। ঘুড়ি কাটাকুটির বেলায় ওর হাতে লাটাই যেভাবে খেলত, তাতে কিন্তু ঘাট মানতে হতো আমাকেই।

কলকাতায় যেমন শীত এলেই দেশি কি বিদেশি সার্কাস পার্টির খেলা দেখানোর ধুম পড়ে যেত, ঢাকাতে তেমনটা দেখিনি। সার্কাসই দেখিনি, কেবল একবার, ওই একবারই দক্ষিণ ভারত থেকে আসা 'কমলা সার্কাস' ছাড়া এই যে এতগুলো বছর পার করে এলুম—আর নয়।

তখন তো পুরো গুলিস্তান ও স্টেডিয়াম পাড়াই খোলামেলা মাঠ ছিল, যা পল্টন মাঠ নামেই পরিচিত ছিল। এই মাঠজুড়ে আসর জেঁকে বসল কমলা সার্কাস। মস্তো ঘেরাও। অলৌকিক জগৎ—টারজানের ভুবন যেন পল্টনের মাঠে এসে জেঁকে বসেছে—হাতি, ঘোড়া, বাঘ, সিংহ, ভালুক—সব, সব মজুদ, শুধু অবধারিত ওই শিম্পাঞ্জি, চিতা ও কুমির ছাড়া। মূল তাঁবুর পেছনে খাঁচার ভেতরে বাঘ, ভালুক ও সিংহের আস্তানা, শুয়ে-বসে ঝিমুচ্ছে। হাতি ও ঘোড়াগুলো একপাশে দাঁড়িয়ে—সাদামাঠা—উত্তেজনাবিহীন অস্তিত্ব। অথচ

শীতের আগাম বার্তা বয়ে নিয়ে আসলো ঘুড়ি...

রাতের ঝলমলে উজ্জ্বল আলোয় রিংয়ের মাঝে উল্লসিত করতালিমুখর দর্শকদের সামনে এরাই হয়ে ওঠে নায়ক ও পার্শ্বসহচর।

এসেছিল শীতটা কাটাতে, থেকে গেল আট-নয় মাস। মাতিয়ে রেখেছিল ঢাকাবাসীকে—গেঁয়ো ঢাকাকে কিছুদিনের জন্য হলেও শহুরে ছোঁয়া দিয়ে গিয়েছিল কমলা সার্কাস। দক্ষিণী মেয়েদের কালো গায়ে সাদা লেগইন ও বর্ণিল পোশাকে ট্রাপিজের দুর্ধর্ষ খেলা, চলন্ত ঘোড়ার পিঠে নৃত্যলীলা আজও চোখে ভাসে। ভাসে দড়ির ওপর দিয়ে পুলসিরাত পার হওয়ার দৃশ্য।

এরপর অনেক বছর পার হয়ে গেছে। ঢাকার গ্রাম্যতা খুব যে একটা ঘুচেছে, এমন নয়। ওই পাঁচতারকা তিনতারকা হোটেল আর আকাশমুখো তালগাছের মতো গজিয়ে ওঠা ঢ্যাঙা অট্টালিকা ছাড়া ঢাকা মেজাজে-মর্জিতে এখনো মফস্বল। তাই তো অধুনা দেখি গ্রাম থেকে আসা পুঁচকে মেঠো-সার্কাসের দল (যদি এদের সার্কাস পার্টি বলা যায়) বস্তি অঞ্চলের আশপাশে একটু খোলামেলা জায়গা পেলেই রাতারাতি খুঁটি গেড়ে সস্তা খেলা দেখাতে বসে যায়।

কিছুক্ষণের জন্য শহর ঢুঁড়ছিনে। স্মৃতির লাটাই মুক্ত—সুতো মনের আনন্দে উড়ে চলেছে কথামালার ঘুড়ি নিয়ে। ঘুড়ি একবার এ-বাঁক নেয়, আরেকবার ও-বাঁক—স্মৃতিও।

ঢাকাতে আমাদের প্রথম ডেরা ৩৬ নম্বর চাঁদনীঘাট তথা কামিনীভূষণ রুদ্র রোডে—এ কথা তো আগেই বলেছি। বাড়িটা ছিল অদ্ভুত। বাড়ির কর্তামশাই দেশের ভাগবাটোয়ারার সঙ্গে সঙ্গেই পাড়ি জমিয়েছিলেন ভারতে, বাড়ির একটা গতি না করেই। দোতলা বাড়ি, ওপরে নিচে মিলিয়ে তেরোটি ঘর। ভাবছেন, পেল্লাই অট্টালিকা। মোটেও তা নয়। ওই তেরোটি ঘরের মধ্যে মোট ছ'খানা অর্থাৎ অর্ধেকেই রান্নাঘর। অথচ বাড়ির মালিক ছিলেন একজনই। ভেতরের কথা হলো, বাড়িওয়ালা ভদ্রলোকের পরিবারে বিধবা সদস্যের সংখ্যা ছিল বেশি। সবাই সাত্ত্বিক। কাজেই প্রতিজনের জন্য একটি করে রান্নাঘর বরাদ্দ ছিল।

এই বাড়িতেই জন্ম পূর্ববাংলার প্রথম কিশোর মাসিক *ঝংকার* (১৯৪৯-৫০)-এর। কী করে আমাদের হাতে *ঝংকার* জন্ম নিল, সে কথা তো এই স্মৃতিচারণার গোড়াতেই বলা হয়ে গেছে। ১৯৭১-এর ১৪ ডিসেম্বর যেসব বুদ্ধিজীবী বর্বর বাঙালি রাজাকার ও পাকিস্তান বাহিনীর হাতে নিহত হয়েছিলেন, তাঁদের মাঝে আমার কাকাবাবু (বাবার সাক্ষাৎ মামাতো ভাই) নিজামুদ্দিন আহমদও ছিলেন। এই নিজাম কাকা আমাদের সঙ্গেই থাকতেন।

তাঁর সাংবাদিকতার হাতেখড়ি এ বাড়িতেই। তখন তিনি স্নাতকের ছাত্র। ওঁর টেবিলে, তক্তপোশে ছড়ানো থাকত নানা দৈনিক কাগজ। এসব কাগজের ভিড়ে করাচির *ডন*, লাহোরের *সিভিল অ্যান্ড মিলিটারি গ্যাজেট* ও *পাকিস্তান টাইমস*-এর তিনি ছিলেন পূর্ব বাংলার প্রতিনিধি। সারা দিন কলেজ ও সংবাদ সংগ্রহের কাজে ব্যস্ত থাকতেন। বেশ রাত করে বাড়ি ফিরতেন। আমার সঙ্গে ওঁর শেষ দেখা একাত্তরের ৭ কি ৮ ডিসেম্বর। মৃত্যুর হপ্তাখানেক আগে। দুপুরের দিকে আমাদের ধানমন্ডির বাড়ি এসেছিলেন আমরা কে কেমন আছি জানতে। ওঁকে বললুম, কাকা, আপনি এখনো রোকনপুরের বাসাতেই আছেন। এটা কিন্তু ঠিক হচ্ছে না। ঢাকাতে তো আর থাকার জায়গার অভাব নেই। একেক বাড়ি বদলে বদলে থাকুন।

—অত ভয়কাতুরে হলে সাংবাদিকতা চলে না। তোমার মতো অনেকেই বলছে বটে, অত সাহস ওদের হবে না। বিবিসি বলে কথা—।

—এতটা শিওর হচ্ছো কেন, ওরা করতে পারে না এমন কিছু নেই। নাহে, তুমি অন্য কোথাও থাকো। আমাদের এখানেও চলে আসতে পারো।

বাবা আমার প্রস্তাবে সায় দিয়ে বলেন।

—ভেবে দেখি। তবে আপনারা বেকার ভয় পাচ্ছেন।

ভাবতে ভাবতে সময় বয়ে গেল। এরপর ১৪ ডিসেম্বর নিজাম কাকাকে কীভাবে খাবার টেবিল থেকে চোখেমুখে গেঞ্জি বেঁধে ধরে নিয়ে গেল রাজাকারেরা, সে তো আপনারা সবাই জানেন। আর মারল, আমার যদ্দুর ধারণা, আমাদেরই বাড়ির পেছনে, রায়েরবাজারের কাটাসুরের ডোবাতে।

এবার একটু বাবার কথা বলি। আমাদের বাবা ছিলেন যথার্থ অর্থেই সাত্ত্বিক। সংসারে এমন সজ্জন কালেভদ্রে মেলে। অর্থকষ্টে সারাটা জীবন অতিমাত্রায় ভুগেছেন। তবু অর্থের পেছনে ছোটেননি। বোধহয় ভুল বললাম, অর্থ তাঁর পায়ে এসে গড়াগড়ি খেয়েছে। তিনি ঠেলে সরিয়ে দিয়েছেন। সারা জীবন তিনি আমাদের একটাই উপদেশ দিয়েছেন: বড় মানুষ হয়ো, 'বড়লোক' হয়ো না। তিনি যেমনটি বলতেন, নিজের জীবনে তা-ই করতেন। তিনি আমাদের কাছে যেমন মস্ত মানুষ ছিলেন, পরিচিত মহলেও হিসাব তেমনই। বিষয়বৈভবে অনাসক্তি, ভদ্র, নম্র, পরোপকারী—এসব গুণ যেন ওঁর রক্তে মিশেই ছিল। পরীক্ষা দিয়ে ওঁকে অর্জন করতে হয়নি। আসুন না, বাবার একটা গল্প শোনাই।

১৯৪৯ সাল হবে। বাবা তখন পূর্ব বাংলা সরকারের কেন্দ্রীয় মেডিকেল স্টোরের অধিকর্তা। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। হারিকেনের মৃদু আলোয় পড়াশোনা

করছি। এমন সময় সদর দরজায় টোকা। দরজা খুলে দেখি স্যুট-পরা এক ভদ্রলোক। হাতে ব্রিফকেস। বাবার সন্ধানে এসেছেন। বাবার কাছে সাধারণত আত্মীয়স্বজন ছাড়া বাইরের কোনো লোক দেখা করতে আসেন না। অফিস-সংক্রান্ত কাজে কেউ বাড়ি আসুক, এটা তাঁর অপছন্দ ছিল। এটা সবার জানা। তাই একটু অবাক হয়ে বাবাকে খবরটা পৌঁছে দিলুম।

বাবাও অবাক। নিচে নেমে ঘরে ঢুকেই বললেন, একি খান সাহেব, আপনি!

—হ্যাঁ, আমি। বলে অমায়িক হাসি ছুড়ে মারলেন ঔষধাজীব লুৎফর রহমান খান সাহেব। বাবা বিরসমুখে বসতেই আবার যোগ করলেন, আমার ওই ডিস্টিলড ওয়াটারের কেসটা—

গুমোট নিশ্চল বাবা পূর্ববৎ।

—হাড় বজ্জাত সরকার মাসের শেষে যা তুলে দেয়, তাতে নেহাত মাস-বাজারটা চলতে পারে, বাকিটা বাকির খাতায়। কিন্তু একটা মানুষ কত বাকি, কত ঋণ সইতে পারে—এর ওপর আবার আপনার বড় ছেলের ডাক্তারি পড়ার রাক্ষুসে খরচ। মেয়েদের বিয়ে—এসব বিবেচনা করলে নগদ ভালো নয় স্যার?

ঔষধিপতি খান সাহেব কথায় ও কাজে সমান তৎপর। ধাবিত হস্ত এবার ব্রিফকেসের ডালাটি সন্তর্পণে খুলে হারিকেনের মায়াবী আলোর দিকে একটু ঠেলে দেন। থরে থরে সাজানো নোট। কী তার জেল্লা! হায় রে!

—এখানে পুরো ২০ হাজার।

ঋণ-সরোবরে মহাজাল। হঠযোগ নয়, প্রাপ্তিযোগ। সারা জীবনের ঋণের কালাপাহাড়, কন্যাদায়, কন্যাধনে বিলয়।

বাবা যেন বা গাছ!

—ঠিক আছে, তাহলে মোট ওই তিরিশ, কী বলুন?

কী গাছ?

তাল। ঊর্ধ্বে যেমন আকাশ ছোঁয়ার আকুতি, নীচেয় কোনো পাতালে।

ছায়া কালো অনড় বাবার রা'টি নেই। মৃত গিরির অন্তর্দাহ ওঁকে দিশেহারা করে। নির্জনতার ক্রোধরশ্মি বিকীর্ণমান।

—প্লিজ গেট আউট, আই সে গেট আউট।

রাবণহুঙ্কারে বাবার অন্যায়ের প্রতি বিদ্বেষ ফেটে পড়লে ব্রিফকেস হস্তে নেশাগ্রস্ত ভদ্রলোক উঠে পড়েন। তিড়বিড়ে চোখে অবিশ্বাসের দৃষ্টি হেনে শেষবারের মতো বাবার দিকে তাকান। ঠোঁট নড়ে। কথা ফোটে না।

—প্লিজ। আপনি মেহমান। কুইক। বাবার তেজস্বিতা অম্লান।

পর্যুদস্ত খান সাহেব যো-সো ব্রিফকেস হাতে নির্ভুল অঙ্কের নিয়মে দরজার আড়ালে হয়ে যান।

আট নয় বছর পরের কথা।

লুৎফর রহমান খান সাহেব তখন আইয়ুব খানের কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী। পূর্ববাংলা সফরে এসে হঠাৎ আমাদের নারিন্দার ১১৩ নম্বর শরৎগুপ্ত রোডের বাড়িতে মার্সিডিজ বেঞ্জসহ পদধূলি। সকাল তখন আটটা হবে। সালাম বিনিময়, অতঃপর বপুষ্মানে মধুকৈটভে সানুরাগ বরণ।

—অনেক দিন পর। বসুন, বাবা স্বাগত জানান।

—বসব না, সময় অল্প। ঝামেলা তো আর একটা নয়।

—হক কথা। মন্ত্রিত্ব মানেই তো নানা ঝামেলা।

—তাহলেই বুঝুন।

তবু একটু নাশতা করে যাবেন তো। আপনি আমার মেহমান।

এক যুগ আগের ঘটনা চোখে কপালে গ্রীবায় আঁকা হয়ে যায়। অপিচ মেহমান শব্দটি নতুন অর্থে অর্থময়।

—ওই তো খোকন নাশতা নিয়ে এসেও গেছে।

চা পান করতে করতে মন্ত্রী মহোদয় অপাঙ্গে বাবাকে লক্ষ করে চায়ের কাপে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে বললেন, এসেছিলাম সেই দিনটার কথা মনে করে। যেদিন আপনি—। অর্ধপথে বিরতি। সংযোজনের সুযোগ না দিয়ে বাবা বলেন, আহা, থাক না কেন। বেশ তো ছিলুম এত দিন। মনে করার মতো দিন নয় যে ওটা।

—কিন্তু এই নয় বছর আমি ভুলতে পারলুম কই। সবাই, মানে ওই সাপ্লায়াররা বলেছিল আপনার সীমা নেই, আপনি অনন্ত। বিশ্বাস করিনি। সম্পূর্ণ ব্যাপারটাই ছিল আমার দিক থেকে চ্যালেঞ্জের মতো।

চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে রুমালে মুখ মুছে অনেক কাল আগের বোকা হাসিটি পুনশ্চ উপহার দিয়ে কথা শেষ করেন, আজ মুক্ত মনে ওই দিনকার চ্যালেঞ্জটা দেরি করে হলেও ফিরিয়ে নিয়ে হালকা হতে এসেছি।

বাবা অভিভূত। বাবা বৃক্ষ। বাবা ওই ক্ষণে পিপুল বৃক্ষ—সহস্র শাখা বিস্তারকারী গৌতম সখা। অতিথি আপ্যায়নে পূর্ববৎ যত্নশীল আমাকে অপরাধী করবেন না। আরেকটি বিস্কুট—।

—আপনি, উঠে দাঁড়িয়ে আলিঙ্গনাবদ্ধ, অদ্ভুত মানুষ।

বাবার চোখে জল।

—ইয়েস, আই হ্যাভ নেভার মেট নর হার্ড এ কুঈয়ার অ্যান্ড ট্রু-হার্টেড সোল লাইক ইউ।

বাবা অবিরল—বাইফোকাল বাষ্পীভূত।

চিকন অন্তর্হাস।

—ইয়েস আই মিন ইট। করমর্দন, অতঃপর, তাহলে অনুমতি করুন। বাই দি বাই, আপনারও তো আপিসে যাওয়ার সময় হয়েছে। চলুন না, আমি তো ওদিকেই যাচ্ছি।

—নো, থ্যাংক ইউ। বরং আসুন, আপনাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে আসি।

পাশাপাশি। টলস্টয়ের শিশুগণের ত্রস্ত পদক্ষেপে হরিৎ মেদিনী কাঁপিল না। আশীর্বাদ হইয়া বহির্দ্বার পর্যন্ত দম্ভ প্রকাশ করিল।

ঝংকার ও আগমনীর বন্ধন

তো নিজেব হাতে ওই কাঠের ব্লক যেমন চলত, চলত ব্রিটিশ তথ্যকেন্দ্র থেকে পাওয়া প্লাস্টিকের ব্লক, সুযোগ বুঝে কলকাতা থেকে অর্ডার দিয়ে আনা ব্লক দিয়ে সাহায্য করেছিলেন অধুনালুপ্ত দৈনিক *আজাদ* পত্রিকার জেনারেল ম্যানেজার প্রয়াত আবদুল হাকিম ও বার্তা সম্পাদক খায়রুল সাহেব। আর মনে পড়ে, খুব মনে পড়ে কলকাতার ৪২ নম্বর সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট থেকে প্রকাশিত কিশোর পরিচালিত ভারতের প্রথম কিশোর মাসিক *আগমনীর* সম্পাদক সুজিতকুমার নাগের কথা। সেও পার্সেলে পাঠিয়ে দিত ওর কাগজের কাঠের ব্লক। এক কিশোর পরিচালিত কাগজের সঙ্গে আরেক কিশোর পরিচালিত কাগজের যে রাখিবন্ধন হয়েছিল, তা ছিল খুবই পোক্ত। কাগজ বিনিময় তো হতোই, আরও কিছু চলত। আমি দিতুম আমার আঁকা ছবি *আগমনীর* জন্য, আর সুজিত, ওই যে বললুম, পাঠাত ব্লক। তারপর কত বছর পার হয়ে গেছে—হুগলি ও বুড়িগঙ্গার বুক দিয়ে কম জল গড়ায়নি। সুজিত কোথায় আছে, কেমন আছে, জানি নে, অর্ধশতাব্দীকাল হতে চলল *ঝংকার* লুপ্ত, *আগমনী* সুপ্ত, কাজেই রাখিবন্ধনের গাঁটছড়াটিও মুক্ত।

তবে কথা কী, যত দিন বেঁচে ছিল, *ঝংকার-আগমনীর* বন্ধন ডাঁটো ছিল বটে। এই যে বন্ধন, এর বাঁধনে সেদিন জড়িয়ে পড়েছিল আরও কিশোর-কিশোরী। এদের মধ্যে প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি বন্ধুবর মোস্তফা কামালের কথা মনে পড়ে যায়। কামালের সঙ্গে আমার পরোক্ষ পরিচয় কলকাতায়। ১৯৪৬ সাল হবে—ব্রিটিশরাজের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার আন্দোলন তখন তুঙ্গে। কলকাতায় মুসলমান ছাত্রদের জন্য দুটি সরকারি হস্টেল—ওয়েলেসলি-তালতলার দিকে বেকার হস্টেল আর বৈঠকখানা-মির্জাপুর এলাকার দিকে কারমাইকেল হস্টেল। এই শেষোক্ত ছাত্রাবাসে মুসলিম লীগের ছাত্র শাখার উদ্যোগে এক সভা হয়েছিল। সভাপতি ছিলেন হক সাহেব—(এ কে এম ফজলুল হক)। আদর্শগত কারণে একদা মুসলিম লীগ থেকে বহিষ্কৃত (১৯৪১) হলেও পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর আহ্বানে সাড়া দিয়ে পাকিস্তান আন্দোলনের পক্ষে লড়ছিলেন তখন। সভার কাজ শুরু হয়েছিল সেদিন আব্বাসউদদীনের উদ্বোধনী গান দিয়ে। গানের পর আয়োজনের প্রথম বক্তা হিসেবে নাম ঘোষণা করলেন মোস্তফা কামালের। ভেবেছিলাম কেউকেটা ভারিক্কি চালের কেউ হবেন। কিন্তু মঞ্চে আমার সমবয়সী এক বালককে মাইকের সামনে দাঁড়াতে দেখে অবাক মেনেছিলাম। হস্টেলের সবুজ উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ সেদিন মুখরিত হয়ে উঠেছিল মুহুর্মুহু করতালিতে। ওজস্বিনী ভাষায় ওর বক্তৃতা শুনে হক সাহেবের প্রশংসা কুড়িয়েছিল মোস্তফা কামাল, এ কথাও বেশ মনে পড়ে। সেদিনই জানতে পেরেছিলাম ওই একরত্তি ডাকাবুকো রত্নটি পল্লিগায়ক আব্বাসউদদীনের ছেলে।

পাকিস্তান হওয়ার পর মোস্তফা কামালদের ডেরা ছিল পুরান ঢাকার পাতলা খান লেনে। ওর কাছ থেকেই আমন্ত্রণ এল, *আগমনীর* সূত্র ধরে। একটু আলাদা রকমের আনন্দও হলো--যাঁর কণ্ঠসুধা বাংলার ঘরে ঘরে গ্রামোফোন-রেডিওতে রণিত হয়, সেই প্রবাদতুল্য গায়কের বাড়ি যাওয়া, তাঁর সান্নিধ্য পাওয়া, কম কথা নয়। পঞ্চাশ বছরের ধূসর কালো পাতলা খানের ওই সেকেলে বাড়িটা, তার নিরাবরণ বসবার ঘরটাকে মোটেও মলিন করতে পারেনি। চালশে চোখে আজও যেন তাঁর ঘ্রাণ পাই। দুজনে আলাপ করতুম, অনুজ মুস্তাফা জামান আব্বাসী আশপাশে ঘুরঘুর করত আর ছোট্টমণি বাটাজোড়া মুখ ফেরদৌসী মুখভরা হাসিটা নিয়ে করত এঘর-ওঘর। একদিন ঠিক হলো, *ঝংকার* ও *আগমনীর* বন্ধনকে, বরং বলব ভারত ও পূর্ব বাংলার সেতুবন্ধনকে আরও আঢ্য ও স্মরণীয় করে রাখার জন্য এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। ১৯৪৯-এর নভেম্বর কি হিমেল ডিসেম্বর

হবে। বসল সান্ধ্য আসর আমাদের বাড়ির একটুকুন অঙ্গনে। *ঝংকার*-এর সদস্য-সদস্যা ও *আগমনী*র শুভানুধ্যায়ী ছোট্ট ছেলেমেয়েদের গান, আবৃত্তি ও নাচের নূপুরধ্বনিতে সেদিনের শান্তশিষ্ট ঢাকা হঠাৎ চমকে উঠেছিল। আশপাশের পল্লির টাপেটোপে উপচে পড়া লোকের ভিড় রাজপথ পর্যন্ত গড়িয়েছিল। আমাদের বুকটা সেদিন আনন্দে ভরে গিয়েছিল।

কিন্তু পাকিস্তান সরকার আমাদের এই অনুষ্ঠানকে সুনজরে দেখেনি। অনুষ্ঠান যখন মাঝপথে, তখন ডাক পড়ল আমার, অনুষ্ঠান-অঙ্গনের বাইরে। সম্মুখীন হতে হয়েছিল গোয়েন্দা বিভাগের কর্মচারীদের। গোয়েন্দা গল্পের পাঁড় পড়ো হতে পারি; কিন্তু কখনো গোয়েন্দার মুখোমুখি হব—এ চিন্তা কস্মিনকালেও করিনি। হোমস অথবা কিরীটী রায়ের প্রশ্নবাণ সহ্য করা যায়; কিন্তু এই জ্যান্ত গোয়েন্দাদের বাকপারুষ্যে আমি হতবিহ্বল হয়ে পড়ি। ওদের চোখটা টাটাচ্ছিল লাল সালুয় লেখা *ঝংকার-আগমনী* বিচিত্রানুষ্ঠানের সাড়ম্বর বিজ্ঞপ্তির ওপর। যে ভারতের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটেছে, তাদের সঙ্গে আবার সেতুবন্ধন কেন—এইটে ওদের প্রশ্ন। আমাদের মতলব কী? সরকারের বিরুদ্ধে *ঝংকার*-এর কচি ভাইবোনদের মন বিষিয়ে তুলছি, এমন একটা সিডিশাস অভিযোগ অনুমান করি ওদের গোপনীয় ফাইলে ছিল।

আর এই অনুমানটা কোনো কথার ধাঁধা নয়। *ঝংকার*-এর সম্পাদকীয় সেই সাক্ষ্যই দেয়। তারা সেখানে লাল জুজুর সন্ধান পেয়েছিল। ১৯৪৯-এর জুন-জুলাই ঈদসংখ্যা থেকে প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি :

> "{ঈদের সাম্যবাণী বর্ণনার পর}...কিন্তু বর্তমান বিশৃঙ্খল সমাজ জীবনে ঈদের এই প্রাণোন্মাদনাকারী বার্তা কতদূর ঝংকার তুলবে সেটা ভাবনার বিষয়। গ্রামে গ্রামে আমরা কি দেখছি?...আমাদেরই গরীব ভাইবোনেরা আজো দু'বেলা পেট ভরে খেতে পাচ্ছে না, তাদের পরিধানে আজো ছিন্ন-বস্ত্র, দুয়ারে দুয়ারে ঘুরতে হোচ্ছে এক মুঠো চালের জন্যে : স্বাধীন দেশে অনাহারে মানুষের মৃত্যু-খবরও আমাদের শুনতে হয়, এর-চেয়ে মর্মান্তিক লজ্জাকর ব্যাপার আর কি হোতে পারে? তাই আকাশ-বাতাস ও ব্যথাহত মানুষের দীর্ঘশ্বাসে ভারাক্রান্ত—চতুর্দিকে শুধু অনাহারক্লিষ্টের হাহাকার ধ্বনি। স্বার্থান্ধ ধনিক শ্রেণীর হীন লোভ ও লোলুপতা, নির্মম স্বেচ্ছাচারিতা ও দায়িত্বহীনতা সমাজের এই চির অবহেলিত দরিদ্রগোষ্ঠীকে ধীরে ধীরে মৃত্যুর গহ্বরে ঠেলে দিচ্ছে।...
>
> "কিন্তু সমাজের এই সর্বহারা গোষ্ঠীর মাঝেও জাগরণ আসচে। মুষ্টিমেয় পুঁজিপতিরাই শুধু যাবতীয় সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও ঐশ্বর্য্য ভোগ করবে, গরীবের কবরের উপর রচনা করবে বিলাসের সৌধ—এদিন ফুরিয়েছে।

সকল প্রকার অত্যাচার ও অনাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার আত্মচেতনা মজলুম দেশবাসী ফিরে পাচ্ছে। তাই বুঝি এই পবিত্র দিনে পূর্ব্বাকাশের ঐ সোনালী সূর্য্যের অভ্যুদয় তাদের জানাচ্ছে সুন্দর ভবিষ্যতের ইঙ্গিত আর ঘোষণা করছে—তোমাদেরও দিন এলো।"

সদ্য পাকিস্তান হয়েছে, তার ঘোর তখনো কাটেনি—কিছু কিছু বক্তব্যে এবং জিন্নাহর প্রশস্তিমূলক রচনায় সেই গন্ধ *ঝংকার*-এর পাতায় থাকা সত্ত্বেও, যদি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকার উল্লিখিত সম্পাদকীয়তে সমাজতন্ত্রের সাম্যের বাণী প্রচারের 'অসদুদ্দেশ্য' আবিষ্কার করে বসেন, তাহলে দোষ দেওয়া যাবে না তাদের। পাঠকদের জানিয়ে দেওয়া ভালো, সে সময় কমিউনিস্ট পার্টি পাকিস্তানে অবৈধ ছিল। আরেকটি ব্যাপারও বোধহয় গোয়েন্দা বিভাগকে প্ররোচিত করতে পারে। স্বল্পকালের জন্য হলেও ১৯৪৮-এর গোড়ার দিকে আমি আর.এস.পি (রেভল্যুশনারি সোশালিস্ট পার্টি) সংগঠনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলাম। স্মৃতিভংশ যদি না ঘটে, তাহলে তখন এর কর্ণধার ছিলেন পুলিন দে। সদরঘাটের পাঁচ মাথার মোড়ে সেই যে সাধনা ঔষধালয়লাঞ্ছিত নিকেতনটি ছিল, তার নড়বড়ে তেতলায় পার্টি আপিসে একদিন নিয়ে গিয়েছিলেন পার্টি কর্মী বরিশাল জেলার আবদুল খালেক খান (সম্প্রতি প্রয়াত)। কী করে এঁর সঙ্গে যোগাযোগ হলো, সে বড় কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনি। সেকালের ঢাকা তথা পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক মেজাজ বুঝতে হলে *ঝংকার*-এর কাছে যেতেই হবে। পাকিস্তান অর্জনের লক্ষ্যে যাদের অঙ্গীকার ছিল মন্ত্রের সাধন কিংবা শারীর পাতন—ছ'মাস যেতে না যেতেই তাদের মনে চিড় ধরল কেন? তা কি কেবল ১৯৪৮-এর কার্জন হলে ছাত্র সমাবেশে জিন্নাহর সেই আত্মঘাতী উচ্চারণ, "উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা"—এই উক্তিকে অবলম্বন করে, নাকি তাতে আরও ইন্ধন ছিল? আমি তো ছিলাম সেই সমাবেশে। তখনো তিনি আমাদের চোখে কায়েদে আজম—জাতির জনক। মনে পড়ে, ওঁকে কাছে থেকে দেখার শখ মেটাতে এবং সেই সঙ্গে ওঁর অটোগ্রাফ নেওয়ার জন্য ১৯৪৬ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি কলকাতার ইস্পাহানির ৫ নম্বর হ্যারিংটন স্ট্রিটের বাড়িতে গিয়েছিলাম। তখন বিকেল পাঁচটা হবে। এরপর আমার ১৯৪৯ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারির ডায়েরি থেকে আংশিক উদ্ধৃতি: "প্রধান গেট ও গাড়ি-বারান্দা অতিক্রম করে অপূর্ব্ব প্রাকৃতিক পরিবেশে ঘেরা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন সুন্দর কোরে দূর্ব্বা কাটা এক টুকরো জমির ওপর এসে পড়লাম।...বিকেল হোয়ে এসেছিল। তাই সূর্যের শেষ রশ্মি বাঁকাভাবে আসরটার মাঝে পড়ে এক অপূর্ব

স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি কোরেছে। চারিদিকে গাছে ঘেরা এই জমিটুকু শহরের কাছ থেকে পৃথক হোয়ে আছে বলেই মনে হোলো। সবুজমাখা ঐ সুন্দর পরিবেশে...শুভ্র সৌম্য কান্তিময় এবং মাংসহীন লিকলিকে সরু দেহটাকে নিয়ে কায়েদে আজম তাঁর অতি পরিচিত একধারে কালো এবং সাদা চুল ও জুতোকে আশ্রয় করে বোসে বোসে প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিলেন। আমাকে নিয়ে গোটা কুড়ি লোক ছিল তখন। সর্ব্ব শ্রেণীর লোক ছিল সেখানে। সাংবাদিক, কুলি, মজুর, শ্রমিক, কেরানী, ছাত্রনেতা কেউই বাদ যায়নি। এতেই বোঝা যায় কায়েদে আজম কতটা জনদরদী ছিলেন।"

এই জনপ্রিয়তাকে আমি প্রত্যক্ষ করেছি ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬-এ গড়ের মাঠের বিপুল জনসমাবেশে, ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি মুসলিম ইনস্টিটিউট হলের সংবর্ধনা সভায়। অষ্টম শ্রেণীর পড়ো যখন এই প্রবাদতুল্য নেতার কাছে তার (বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া) অটোগ্রাফের খাতাটা তুলে ধরেছিল, অভীষ্ট সিদ্ধ হয়েছিল তার। সেদিন বাড়ি ফিরেছিলাম উৎফুল্ল মনে, কানে তখনো রিনি রিনি বাজছিল পাকিস্তানের আসল উদ্দেশ্য কী—জনৈক শ্রমিকের এই প্রশ্নের জবাবে জিন্নাহর উক্তি—"পাকিস্তান ধনীদের পাকিস্তান নয়। এ শুধু গরিবের পাকিস্তান হবে। সেখানে চলবে না ধনীদের অর্থশোষণ, চলবে না জমিদারদের অত্যাচার, সেখানে শুধু একটি জিনিস থাকবে, তাহলো শুধু শান্তি, শান্তি আর শান্তি।..."

কিন্তু পাকিস্তান অর্জনের পরপর কার্জন হলের উক্তি কিন্তু অশান্তি ডেকে আনল। জনপ্রিয়তা হ্রাস পেল পাকিস্তানের পূর্ব অংশে। আমরা মস্ত ঘা খেলাম। অথচ তাঁর এই অদূরদর্শী উক্তির এক দিন আগেও তিনি ছিলেন বাঙালিনির্বিশেষে সবার নয়নের মণি (তাঁর বিখ্যাত উক্তি 'আজ থেকে আমরা হিন্দু নই, মুসলমান নই, বেলুচ, সিন্ধি, পাঠান, পাঞ্জাবি বা বাঙালি নই, আমরা সবাই পাকিস্তানি', স্মর্তব্য। তাহলে তিনি কেন পাকিস্তান চেয়েছিলেন—এই প্রসঙ্গে এই ক্ষুদ্র পরিসরে কিছু বলা সম্ভব নয় বিবেচনা করে ওপথে গেলুম না)। ঢাকার পল্টন ময়দানের সবুজে আমি দেখেছিলাম কলকাতার গড়ের মাঠের মতোই আরেক বিশাল জনসমাবেশ। পূর্ব পাকিস্তানে তাঁর প্রথম আগমন উপলক্ষে বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানানোর জন্য সাত-আট মাইল সুদীর্ঘ পথ পায়ে হেঁটে (তখনো ঢাকাতে কোনো বাস সার্ভিস গড়ে ওঠেনি, রিকশা ও ঘোড়ার গাড়িরও ছিল ভারি স্বল্পতা) অগণিত জনস্রোতের কলধ্বনির কথা ভুলি কী করে! সর্বত্র একটা মহা-উৎসবের আমেজ। তেজগাঁও বিমানবন্দর পর্যন্ত রাস্তার ধারে ধারে গড়ে উঠেছিল অসংখ্য খাবারের দোকান,

পতাকা বিক্রির দোকান। মুহুর্মুহু 'কায়েদে আজম জিন্দাবাদ'-এর ধ্বনিতে ঢাকার আকাশবাতাস মুখর ছিল সেদিন।

কিন্তু এক দিন পরেই সেই ধ্বনি 'মুর্দাবাদে' পরিণত হবে—এ ধারণা ঘুণাক্ষরেও কারও মনে স্থান পায়নি। জলদগম্ভীর কণ্ঠে জিন্নাহ যখন ঘোষণা দিলেন, 'উর্দু, একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা'—মুহূর্তের নীরবতার পরই ছাত্রদের মধ্য থেকে 'নো' 'নো' ধ্বনি তাঁর সব ক্যারিশমাকে ম্লান করে দিয়েছিল। মায়ের মুখের বুলি বলে কথা।

মাত্র সাত মাস পরেই, সেপ্টেম্বরে তাঁর মৃত্যু না হলে রাষ্ট্রভাষা প্রসঙ্গে তার গাজোয়ারি মনোভাব কোন দিকে মোড় নিত, জানি নে; কিন্তু তখনকার বাঙালি শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান (নাজিমউদ্দিনকে বাঙালি বলা যায় কি? বাংলারটা খেয়ে পরে দু ছত্র বাংলা যিনি বলতে পারতেন না, তিনি তো উর্দুর জয়গান গাইবেনই!) উর্দুর পক্ষে তোষামোদী, নিদেন আরবি হরফে বাংলা লেখার উদ্ভট পরিকল্পনার কথা যখন জানতে পারি, তখন মাথা হেঁট হয়ে আসে।

এ তো গেল ভাষার কথা। কিন্তু ইত্যবসরে বুড়িগঙ্গা দিয়ে অনেক জল গড়িয়েছে। পূর্ব বাংলার লোকেরা পূর্ব পাকিস্তানের নাগরিক হয়ে দেখল রামরাজত্বের পরিবর্তে কায়েদে আজমের প্রতিশ্রুত পাকিস্তানের মাটিতে শান্তিতে বসবাস করার কোনো অধিকারই যেন তাদের নেই। মাত্র তিন বছরের মধ্যেই অনেক অভিযোগ তাদের মনে জমা। সেই সব অভিযোগ ১৯৫০ সালের জুলাই সংখ্যা *ঝংকার*-এ 'আমরা কোথায়?' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে এভাবে উঠে এসেছে:

"জিজ্ঞাসা কোরছি, পাকিস্তানের অপরাপর প্রদেশের সঙ্গে তুলনামূলক বিচারে পূর্ব্ব বাংলার স্থান কোথায়? এ প্রশ্ন যে শুধু বয়স্কদের মনেই মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে এমন নয়, ছোটরাও আজকাল পরিবর্তিত পরিবেশের মাঝে পড়ে এসব ভাবতে শিখছে। পাকিস্তান অর্জনের পর তিন বছর হোতে চলল। এই দীর্ঘ সময়ে আমরা সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বক্ষেত্রে পূর্ব্ব বাংলার অধিবাসীগণকে অবহেলিত হোতে দেখলাম। কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যবহার দেখে মনে হয় পাকিস্তান বলতে পশ্চিম পাকিস্তানকেই বোঝায়; পূর্ব্ব বাংলা কেবলমাত্র তার অমূল্য সম্পদ পাট, চামড়া, চা ইত্যাদির বিক্রয়লব্ধ আয়ে পশ্চিম পাকিস্তানকে সম্পদশালী করার জন্যই সৃষ্টি হোয়েছে। আমরা জানি কেন্দ্রীয় সরকারের অধিকাংশ আয় পূর্ব্ব বাংলা থেকে হয়। অথচ এ সমস্ত অর্থ পূর্ব বাংলার চেয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নতিমূলক কাজের জন্যেই ব্যয় হয় বেশী। আমরা পূর্ব্ব পাকিস্তানীরা, যখন আমাদের ন্যায্য দাবীদাওয়া উত্থাপন কোরেচি তখনি

প্রাদেশিকতার অজুহাতে তা এড়িয়ে গেছেন কেন্দ্রীয় সরকার। কিন্তু মিথ্যা প্রাদেশিকতার দোহাই দিয়ে কতকাল পূর্ব্ব পাকিস্তানীদের মুখ বন্ধ কোরে রাখা সম্ভব?

'আমাদের মাতৃভাষা বাংলা ধ্বংস কোরে তার পরিবর্ত্তে উর্দ্দু চালাবার ব্যবস্থা হলো নেহাৎই "ইসলামী ভ্রাতৃত্বের" ধুয়া তুলে। এখন আবার আমাদের পরম শ্রদ্ধাভাজন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় (ফজলুর রহমান) আরবী হরফে বাংলা লেখার ব্যবস্থা প্রচলন করার কাজে নেমে গেছেন। করাচীতে গিয়ে বাঙালি যে উর্দ্দুওয়ালা বনে যেতে পারে তার প্রমাণ এই প্রথম পেলাম। কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরিতে শতকরা চল্লিশজন পূর্ব্ব বাংলার অধিবাসীকে নিয়োগ করার ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও কার্যক্ষেত্রে শতকরা দশজনকেও নিয়োগ করা হয় না। পাকিস্তানের চারটি বেতার কেন্দ্রে বাঙালীদের সংখ্যা অতি নগণ্য। তাছাড়া ঢাকা কেন্দ্রের শিল্পীদের বেতনও অপর কেন্দ্রগুলোর চেয়ে কম। কেন্দ্রীয় সরকারের বৃত্তিতে যেসব ছাত্রকে উচ্চ শিক্ষার জন্যে বিদেশে পাঠানো হোতো তার মধ্যে কজন বাঙালিকে খুঁজে পাওয়া যাবে? উপযুক্ত লোক থাকা সত্ত্বেও সামরিক বিভাগে বাঙালিদের নিয়োগে সরকার ইতস্ততঃ করেন কেন? আত্মরক্ষার ব্যবস্থায় পূর্ব্ব বাংলাকে স্বাবলম্বী করার প্রয়োজন সকলেই স্বীকার কোরবে। অথচ আজ পর্যন্ত এ অঞ্চলে গোলাবারুদ প্রস্তুতের জন্য একটি অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরী তৈয়ার হলো না কেন? অভিযোগ শুনতে পাই পূর্ব পাকিস্তানীদের সামরিক শিক্ষার দিকে বিশেষ ঝোঁক নেই। আমাদের জিজ্ঞাসা, তাদের উৎসাহিত করার জন্যে সরকার কি ব্যবস্থা কোরেছেন? এ বিষয়ে অতি প্রয়োজনীয় সামরিক কলেজটি কবে স্থাপন করা হবে? ম্যালেরিয়ায় ভুগে মরে বাঙালী, অথচ ম্যালেরিয়া গবেষণাগারের প্রধান কেন্দ্র করাচীতে হয় কেন? করাচীতে বাংলা ভাষার মাধ্যমে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হয় কেন?

"এইতো গেল কেন্দ্রীয় সরকারের অকর্ম্মণ্যতার কয়েকটি মাত্র দৃষ্টান্ত। পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারণও যে পূর্ব্ব পাকিস্তানের অধিবাসীদের আমল দেন না, তারও দুএকটি উদাহরণ এ প্রসঙ্গে অবান্তর হবে না। মাত্র কয়েক মাস পূর্ব্বে করাচীতে যে পাকিস্তান সংবাদপত্র সম্পাদক সম্মেলন হোয়েছে তাতে যোগদানের জন্যে পূর্ব্ববঙ্গের একজন সম্পাদককেও দাওয়াত করা হয়নি। লাহোরে যে আর্ট কাউন্সিল প্রতিষ্ঠিত হোয়েছে তার সদস্য পদে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিল্পী জয়নুল আবেদিন, শফিউদ্দীন আহমেদ প্রমুখের নাম খুঁজে পাওয়া যায় না।

"কিন্তু আর দৃষ্টান্ত দিয়ে প্রসঙ্গ বাড়াতে চাই না। এতেই বুঝতে পারবে কেন্দ্রীয় সরকার ও পশ্চিম পাকিস্তানীরা পূর্ব্ববঙ্গবাসীদের কোণঠাসা কোরে রাখবার জন্যে কিরূপ তৎপর হোয়ে উঠেছেন এবং আমরা আজ কত নীচে নেমে এসেছি। প্রাদেশিকতার সংকীর্ণতার আশ্রয় গ্রহণ না কোরে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে জানিয়ে দিতে চাই পূর্ব্ব পাকিস্তানীদের হেয় ও অবহেলিত প্রতিপন্ন করার ঘৃণ্য প্রচেষ্টা থেকে এখনই বিরত থাকুন। অন্যথায় বিপদ আসন্ন।"

এই বিপদের বোঝাটা ঘাড়ে চেপেছিল আরও একুশ বছর ভেঙে—১৯৭১-এ।

এই যে এত লম্বা উদ্ধৃতি দিলুম, সেটা কেবল সেকালটাকে বর্তমান প্রজন্মের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্যই। পাকিস্তানের জন্মের পরপরই যে আমাদের মোহভঙ্গ ঘটেছিল, এই সম্পাদকীয় তার বড় প্রমাণ। পাকিস্তান কেন ভাঙল—এই প্রশ্নটার উত্তর যেন এই ছোট্ট সম্পাদকীর ছত্রে ছত্রে প্রকাশ পেয়েছে। শুধু বড়রা নয়, আমরা যারা ছোট ছিলাম, তাদের মনও কতটা বিগড়িয়ে উঠেছিল। কাজেই, গোয়েন্দা বিভাগের কেউ ওই কিশোর সম্পাদকের পেছনে অযথা ঝাঁপিয়ে পড়েনি, একথা আজ বলা যায়।

চকবাজার—আছে সবখানেতেই

এই বাজারের পশ্চিম দিকে এখন যে সুউচ্চ মিনারসংবলিত চারতলাবিশিষ্ট মসজিদটি ঘিঞ্জি চকের আকাশ ফুঁড়ে সদম্ভে দাঁড়িয়ে আছে, এই সেদিনও তা এত বিশাল ছিল না। আমাদের কালে, ওই আটচল্লিশের প্রথম পাদে, এটাকে দোতলাই দেখেছি—বাহার না থাকলেও প্রায় মোগল আমলের মতোই অবিকৃত ছিল। বেশ পুরোনো মসজিদ—নওয়াব শায়েস্তা খাঁ তাঁর নিজ স্থাপত্যকলা প্রয়োগ করে বাজারে আগত ক্রেতা-বিক্রেতাদের সুবিধের জন্যে ৯৪ ফুট দীর্ঘ এবং ৮০ ফুট প্রশস্ত এই মসজিদটি ১৬৭৫ খ্রিষ্টাব্দে নির্মাণ করেন। এই মসজিদে সুবেদার এবং তাঁর সভাসদগণ নামাজ পড়তেন এবং ঢাকার নওয়াব ও রাজপুরুষগণ মসজিদের ছাত থেকে মহরম ও অন্যান্য তামাশা দেখতেন। মসজিদের সামনে কয়েকটি দোকানের ব্যবস্থা ছিল, যাতে এসব দোকানের আয় থেকে মসজিদের সাংবৎসরিক ব্যয নির্বাহ হয়। মজা কী, আজও দোকানগুলো বহাল আছে। বেশির ভাগই ধর্মীয় বই-পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক এবং সংশ্লিষ্ট বই বাঁধাই, কাগজ ও বোর্ডের দোকান। আর ছিল 'কমরেড ব্যাংক' নামক

একটি দেশীয় ব্যাংক, আর ব্যাংকের নিচেই ছিল একটি বিশুদ্ধ পুস্তক বিপণি, যার কথায় পরে আসছি।

আজকের চকবাজার তথা পাদশাজি বাজারের সঙ্গে আমাদের চোখে দেখা ওই চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকের চকবাজারের আদলের সঙ্গে কোনো মিলই নেই। ওইটুকু তো চেটোনেটো পরিসর, তার মধ্যে গজিয়ে উঠেছে ছাপড়া ফুঁড়ে তালপাতার সেপাইয়ের মতো লিকলিকে সব পাঁচ-ছয়তলা ভবন। পুরোনো ঘরবাড়ি সব মন্ত্রবলে উবে গেছে। বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী—কথাটা টের পাওয়া যায় এখানে এলে। তবে পুবদিকে মুখ করা যে আজব জাহাজ বাড়িটা ছিল, দেখছি, আজও সে ছুটছে! কান পাতলে যেন প্যাডেলের জলকাটার শপ্ শপ্ শব্দও শুনতে পাই। আমার আজও এই চালশে চোখেও ভাসে, টিনের চাল দেওয়া ঝুপড়ির মতো গায়ে গা লাগানো দোকানগুলোর কথা—মনে হতো মৌচাকের মতো ঘরগুলো যেন একই ছাতের তলায় বাসা বেঁধেছে। চক মসজিদের উল্টো দিকে ছিল সারিবদ্ধ চুড়ির দোকান। রাতে ঝলমল করত দোকানগুলো, বিদ্যুতের বিচ্ছুরিত আলোয় সোনালি-রুপোলি নানা রঙের গুচ্ছের কাচের চুড়ি ঝক্‌মক্ করত। ধারেকাছের চুড়িহাট্টা পল্লি জোগান দিত এই চুড়ির। এককালে এই চুড়িহাট্টার কাচের চুড়ি; বিশেষ করে, কারুকাজ করা বেলোয়ারি চুড়ি ও বেশমি চুড়ির এই উপমহাদেশে এবং

...লীলায়িত ছন্দে

এশিয়ার সর্বত্র বিশেষ কদর ছিল—ওই মসলিন কাপড়ের মতোই। আজও এই চুড়ির পাইকারি দোকানগুলো টিকে আছে। তবে তার আগের সেই চেকনাই নেই। আগে দেখেছি সদরঘাটের অদূরে চাঁদনীঘাটের কাছে নোঙর করা বেদেদের নৌকো থেকে অপূর্ব লীলায়িত ছন্দে নিতম্ব দুলিয়ে বেদেনিরা আসত এই চকবাজারে। বাজারটা যেন জেগে উঠত। ওদের চোখ ঠারা কথা, কমলালেবুর কোয়ার মতো লাল ঠোঁটের ঠাট, গা দোলানো ঠমক—চকের দোকানে দোকানে যেন আনন্দলহরী বইয়ে দিত। আজ আধুনিক পণ্যের বাজারে বেদে-বেদেনিদের তেমন আর ভূমিকা নেই বললেই চলে। চুড়ির দোকানে ওদের আর তেমন করে দেখা মেলে না। তাই বলে চুড়ির ব্যবসা তো আর বসে নেই। দেশের চুড়ির চাহিদার একটা মোটা অংশ আজও এখান থেকেই পূরণ হয়ে থাকে। পৌরসভার খাতাপত্রে চুড়িহাট্টা চুড়িহাট্টা হলেও তার একটা গাজোয়ারি পোশাকি নাম আছে—নন্দনকুমার দত্ত রোড। কিন্তু এ নামে কেউ ডাকে না। ডাকঘরের কাছেও এ নাম অপরিবর্তিত রয়ে গেছে আজ অবধি। যান, দেখতে পাবেন বহু পুরোনো একটা মসজিদ সবাইকে যেন আজও ধরে রেখেছে। এই প্রাচীন মসজিদকে ঘিরে আছে কৌতূহলোদ্দীপক এক কাহিনি। এ কোনো বানানো গল্প নয়, কিংবদন্তিও নয়—মসজিদের গায়ে যে শিলালিপি ছিল, তাতে উৎকীর্ণ ছিল এই কাহিনি।
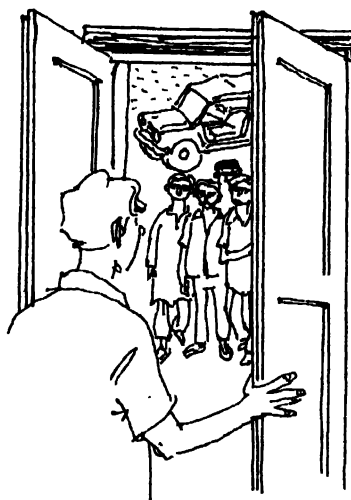
ডিসেম্বরের আমরা তিনজন

ডিসেম্বর এলেই আমার বুক তরাসে কাঁপে। মৃত্যুর এত কাছাকাছি পৌঁছেও বুঝতে পারিনি কত ভয়ংকর বীভৎস হতে পারত তা!

তখন আকাশযুদ্ধ চলছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়, ওই যখন জাপানিরা বর্মা দখল করে নাগাল্যান্ডে ঢুকে পড়েছে, রাজধানী ইম্ফলের পতন আসন্ন, তখন সীমান্ত থেকে উড়ে আসে। কলকাতার বুকে থেকে থেকে বোমা ফেলছিল বোমারু বিমান থেকে জাপানি রাক্ষুসেরা—সেসব অভিজ্ঞতা তো আগে থেকেই ছিল। পরিষ্কার নীলাকাশে রুপোলি ইলিশের মতো দেখতে বোমারু বিমানগুলো উল্টেপাল্টে ডিগবাজি খেতে খেতে যখন বোমাগুলো ফেলত, তখন বোদের তিখনি আলো জালে-ওঠা ইলিশের মতো চিকমিক করে উঠত। গড়ের মাঠে ফাঁদ পাতা অ্যান্টি এয়ারক্রাফ্‌ট গান থেকে যখন পাল্টা জবাব দিত ব্রিটিশ ও মার্কিনরা, তোয়াক্কাই করত না জাপানি হুমোগুলো। কয়েক দান বোমা ফেলেই ওরা যখন ঘাঁটিতে ফিরে যেত, তখন টমি ও মার্কিন পুঙ্গবের দল তাদের ফাইটার উড়োজাহাজ নিয়ে আকাশে উড়ত ফাঁকা আকাশে গোল দিতে!

মুক্তিযুদ্ধকালীন ঢাকার আকাশেও একই দৃশ্য। তবে এ ক্ষেত্রে ভারতীয় বোমারু বিমানগুলো, যত্রতত্র নয়, নির্দিষ্ট স্থানে বোমা ফেলছিল—তাদের লক্ষ্য কুর্মিটোলা ও ঢাকা বিমানবন্দর এবং ক্যান্টনমেন্ট এলাকা। প্রথমদিকে কিছু কিছু প্রত্যুত্তর দিত পাক অ্যান্টি এয়ারক্রাফ্‌ট গানগুলো। শেষের দিকে আর না। তার মানে ওগুলো চালকসমেত সব খতম। দু-এক দিন সেবার ফাইটার জেটকে উড়তে দেখেছি আকাশে, তারপর আর না। অর্থাৎ ওগুলো ভারতের ফাইটার বিমানের কাছে নাস্তানাবুদ। এরপর ফাঁকা আকাশে কয়েক দিন মনের সুখে খুব বোমা ফেলল ভারতীয় বিমান বাহিনী।

এমনই এক দিনে আমাদের এক কাকাবাবু ধানমন্ডির বাসায় এসে উপস্থিত—নিজামউদ্দিন আহমেদ, বাবার আপন মামাতো ভাই, বিবিসির জাঁদরেল সাংবাদিক। খোঁজখবর নিলেন আমরা কেমন আছি। ছোট ভাই মন্টুর কোনো খবর পেলাম কি না, তাও খুঁটিয়ে জানতে চাইলেন। মন্টুর পোশাকি নাম ইফতিখার আহমদ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আমলা, করাচিতে পোস্টিং তখন। মাসখানেক আগে শেষ চিঠির পর আর যোগাযোগ নেই—সবাই উৎকণ্ঠার মধ্যে আছি। অনেকেই টাকাকড়ি দিয়ে কাবুল-তেহরান পালাচ্ছে। মন্টু কী করছে আমরা জানি নে। শেষ চিঠিতে এটুকু জানা গেছে—ওরা আপিসটাপিস কিছু করছে না, নিজেদের ফ্ল্যাটে অন্তরীণ জীবন তাদের। তাদের আতঙ্ক সার্বক্ষণিক—বাঁচব কি বাঁচব না, মা-বাবা-ভাই-বোনদের সঙ্গে শেষ দেখা হবে কি হবে না!

কিন্তু উড়ো খবর আসছিল কয়েক দিন ধরেই—অনেকেই নাকি বাড়ি থেকে বেরিয়ে ফিরে আসছে না আর। আমার শ্বশুরমশাই নূরুল ইসলাম বকশিকে, আওয়ামী লীগ করতেন, ধরে নিয়ে গেছে পাকিস্তানি সেনারা। আর ফেরেননি তিনি। হঠাৎ একটা পোস্টকার্ড এল আমার নামে, জয়দেবপুর মিলিটারি ক্যাম্প থেকে। ওরা শ্বশুরমশাইয়ের জবানিতে জানিয়েছে, ভালো খাবার খেতে হলে টাকা পাঠাতে হবে ওই ক্যান্টনমেন্টের ঠিকানায়। এমনি নাকি জোটে শুকনো রুটি—মাঝে মাঝে মুখে রোচে না এমন ডাল। পাঠিয়েছিলুম দু'দুবার টাকা। বোধ করি বুড়ো বিবেচনায় ছেড়ে দিয়েছিল। ঘরে যেদিন ফিরলেন, একদম চেনা যায় না ওঁকে। গাল ভাঙা। চুল যেন কাকের বাসা। আর সারা গায়ে কালশিটে দাগ। চোখ দুটো বসে গেছে। উল্টো করে কড়িকাঠে ঝুলিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের খবর জানতে চাইত। না জানালেই জুটত বেদম প্রহার! আর ঘণ্টার পর ঘণ্টা উল্টো ঝোলার অসহনীয় যন্ত্রণা তো ছিলই। সব রক্ত যেন মাথায় এসে কোলাহল শুরু করে দিত।

কিন্তু এত যে কথা এত যে উপদেশ, নিজাম কাকা নিজের নিরাপত্তার কী করলেন! তিনি বললেন, ও নিয়ে আমি মাথা ঘামাইনে। আমি বিবিসির প্রতিনিধি। আমাকে কিছু করা বা বলার আগে ওরা দুবার ভাববে।.

আমি তাঁর কথায় সায় দিতে পারলুম না। বললাম, আবাহনী মাঠের কাছে শহরের আন্দাজ বুঝতে গিয়েছি, দেখা হয়ে গেল সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর সঙ্গে। সুনসান সাতমসজিদ রোডের মাঝপথ দিয়ে তোলবলে গায়ে মন্থরগতিতে হেঁটে আসছিলেন। মুখোমুখি হতে জিজ্ঞেস করলাম, কী ব্যাপার, এই ভরদুপুরে একাকী কোত্থেকে?

ওই ঘোর দুর্যোগকালেও হাসকুটে সিরাজুল ইসলাম বিমর্ষ মুখে দুধহাসিটুকু উপহার দিয়ে বললেন, এই তো, এক আত্মীয়ের বাড়ি থেকে। দু-তিন দিন ছিলাম। একনাগাড়ে এর বেশি কোথাও থাকাটা নিরাপদ নয়।

—কী ব্যাপার বলুন তো?

—ফেউ লেগেছে। কেন. শোনেননি, ওরা তো অনেককেই টার্গেট করেছে। আমিও আছি কিনা ওদের লিস্টিতে, কে জানে। সাবধানের মার নেই।

—ঠিক বলেছেন। এখন কোথায় যাচ্ছেন?

—দেখি, জিগাতলায় আত্মীয়ের বাসায় গিয়ে থাকব কয়েক দিন। তারপর অন্য কোথাও।

পাঠক, জেনে রাখুন, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর পাকিস্তানি দানবদের বুদ্ধিজীবী হত্যার নীলনকশায় অন্যান্যের নামের পাশাপাশি সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর নামও ছিল। এ তথ্য আমরা পাই রাও ফরমান আলীর ডায়েরিতে। এই যে গল্পটা করলাম কোনো দাগই কাটতে পারলুম না নিজাম কাকার মনে। অনুনয় করে বললুম, আপনিও কেন আত্মীয়-বন্ধুবান্ধবের বাড়ি ঘুরে ঘুরে বাড়ি বদলে থাকুন না। বিবিসিতে যেসব রগুড়ে খবর পাঠাচ্ছেন, তাতে আপনাকে টার্গেট না করেই ছাড়বে না বদমাইশের টেক্কারা।

—দাদন (নিজাম কাকার ডাকনাম), খোকন ঠিকই বলেছে। তুমি বাড়ি বদলে অন্য কোথাও থাকো তো। আমাদের এখানেও দু-এক দিন কাটিয়ে যাও, বাবার কথায় মাও সায় দিলেন।

কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা! নিজাম কাকা আমাদের আশঙ্কাকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে বিদায় নিয়েছিলেন সেদিন। তারপর মাত্রই দশ দিন পরে, এক দুপুরে কী করে দুপুরের খাওয়া ফেলে এক গেঞ্জিতে চার যুবকের সঙ্গে একটা জিপে চড়ে কোথায় গেলেন, আর ফিরে এলেন না। নিজাম কাকার এই

অন্তর্ধানের খবরটা যেদিন পেলাম, ঠিক তার আগের দিন দুপুর বারোটার দিকে আমাদের বাড়ির চারদিকে গোটা চারেক মিলিটারি গাড়ি এসে দাঁড়াল। গাড়ি থেকে দুপদাপ করে ২৫-৩০ জন সেনা আমাদের ১৯ নম্বর রোডের ৮০২ নম্বর বাড়িটাকে ঘিরে ফেলল। অর্ধনির্মিত আচাভুয়ো বাড়িটার কী আকর্ষণে এই বিপুল আয়োজন, বুঝতে পারলুম না। একটু একটু করে ভয় দানা বাঁধতে থাকে বুকের ভেতর। ভয়টা পাকাপোক্ত হলো, যখন দেখলাম, দরজার সামনে দাঁড়ানো একটা জিপ থেকে তিনজন যুবক নেমে সদর দরজার হুড়কো খুলে লন ভেঙে এগিয়ে আসছে বাড়ির দিকেই। পেছনে দুজন সশস্ত্র সেপাই।

—আপনি কি এ বাড়িতেই থাকেন, সামনের যুবকের প্রশ্ন।

দেখেশুনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বলে মনে হলো ওদের। বললাম, হ্যাঁ। কিন্তু আপনারা?

—আমরা একটা জরিপের কাজে এসেছি। এ মহল্লায় কারা থাকেন, কোন পেশায় আছেন, তাদের সুবিধে-অসুবিধে কী, তা জানতে এসেছি। আমরা ভেতরে আসতে পারি কি?

—অবশ্যি। আসুন। বসুন, আমি বাবাকে ডেকে নিয়ে আসছি। ওদের তিনজনকে বৈঠকখানায় বসিয়ে বাড়ির ভেতরে গেলাম। বাবাকে সব খুলে বলতে তিনি চিন্তিত মুখে বৈঠকখানায় গেলেন। মা, বাড়ির সবাই যেন ফাঁসির আসামি।

আমাদের সবার নামধাম, বাবা কী করতেন, এখন অবসর সময়ে কী করেন, বড় ভাই আমেরিকায় কী করেন, ছোট ভাই করাচিতে কী করে—এ জাতীয় বিস্তারিত প্রশ্নাবলির শেষে হঠাৎ হুট করে একটা প্রশ্ন করে বসে এক যুবক, আপনি কাগজ বের করতেন না?

—হ্যাঁ, করতাম। *ঝংকার, রূপছায়া,* এই কাগজ দুটো আমারই ছিল।

—লেখালেখিও করেন?

--করতাম। এখন একেবারে না।

—আমরা তো শুনেছি আপনি লেখালেখি করেন, পাশের আরেক যুবকের সান্দ্র অনুসন্ধিৎসা।

—না তো।

—ওর লেখা একটা বইও আছে—*রক্ত পিছল কাশ্মীর।* খোকন, তোর বইটা দেখা না।

হঠাৎ বাবা কাশ্মীর প্রসঙ্গ নিয়ে আসবেন, বুঝতে পারিনি। কাছের শেলফেই ১৯৬৫ সালে কাশ্মীর নিয়ে পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধের ওপর একটা

ফরমায়েশি লেখা লিখেছিলাম। কভারে পাকিস্তানি জওয়ানদের ছবি দেখে তিনজন যুবক খুবই প্রশংসা করলে বইটার, না পড়েই। পাতা উল্টেপাল্টে দেখল একজন। বলল, ভালোই তো লিখেছেন।

—ও *পাকিস্তান অবজারভার*-এ, হামিদুল হক চৌধুরীর ওখানে কাজ করে, বাবা অভয় দিলেন ছেলে তিনজনকে।

—ঠিক আছে। তবে আপনি লেখালেখি করেন না, একথা ঠিক বলেননি, গাজোয়ারি কথা বলে সুদর্শন চটপটে যুবকটি উঠে দাঁড়াল। অন্য দুজনও উঠে দাঁড়াল।

—আপনার কালেকশন তো ভালোই, সারিবদ্ধ বইয়ের আলমারি ও শেলফে চোখ বুলিয়ে বলল, তবে প্রায় সব ইন্ডিয়ান। চলো যাই, খোদা হাফেজ। আপনাদের বিরক্ত করলাম বলে কিছু মনে করবেন না।

গমনোদ্যত তিনজনকে উদ্দেশ করে বাবা বললেন, ওর কালেকশনে বিখ্যাত হিসটোরিয়ান Hector Bolitho-র *Jinnah* আছে। ছেলেকে বাঁচানোর জন্য বাবার অন্তিম উৎকোচ।

—ভালো, ভালো—বলে ওরা চলে যেতেই যেন বুক থেকে জগদ্দলের মতো চেপে বসা পাষাণভার নেমে গেল।

—এ বইগুলো দেখেই 'সব ইন্ডিয়ান' বলে রায় দিয়ে দিল। ভাগ্যিস, আমি স্বামী প্রজ্ঞানন্দের খাজুরাহো শোভিত প্রচ্ছদওয়ালা সংগীতের বইটা, রবিবাবুর বইগুলো আর উপনিষদ-টিষদগুলো আগেই সরিয়ে রেখেছিলাম। না হলে কী যে হতো! বাবার কাতরোক্তি।

এর চার দিন, মাত্র চার দিন পর, আমাদের বাড়ির পেছনে অদূরে কাটাসুরে কত লাশ! কারও হাত বাঁধা, কারও চোখ বাঁধা, কেউ গেঞ্জি পরা, কেউ খালি গায়ে, কেউ উবু হয়ে, কেউ চিৎ হয়ে, কেউ উৎক্ষিপ্ত হাতে, কেউ বিস্ফারিত নেত্রে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছে। জেনেছি, অদূরে ফিজিক্যাল ট্রেনিং ভবনে গাড়ি গাড়ি লোক এনে জড়ো করা হতো। সেখান থেকে কাটাসুরের বধ্যভূমিতে।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বেঁচে গিয়েছিলেন, কারণ, তিনি নিজামউদ্দিন আহমদের মতো ভুল করেননি। না হলে রাও ফরমান আলীর রায়ে তাঁর মৃত্যু ছিল সুনিশ্চিত। আর আমি বুদ্ধিজীবী না হয়েও, অকারণে মরতে মরতে বেঁচে গিয়েছিলাম। বোধহয় এক পিতার উপস্থিত বুদ্ধি ও কাতর আকুতির জন্য।

কোনো এক আহসানউল্লাহ্‌র কথা

২৫ মার্চের কালো রাতকে যখন লাল করে দিলে ওই পশ্চিমের হায়েনাগুলো, তখন আড়েপাতালে সবাই ছোটে গ্রামেগঞ্জে, ছোটে সীমান্তের ভ্রুকুটিকে তুচ্ছ করে ওপারে জলপথে কিংবা হাঁটাপথে, নিজেকে বাঁচাবে বলে।

২৬ মার্চের কাগজে বড় বড় হরফে পাকিস্তানি বর্বরতার খবর যেমন বেরোল, রক্তাক্ত রিকশাওয়ালার হাত-পা ছড়ানো উবুড় হওয়া লাশের ঐতিহাসিক ছবিটাও চোখে পড়ল। শিউরে উঠলাম। আমি তখন অবজারভার গোষ্ঠীতে কাজ করি। পুরান ঢাকায় আপিস। যাওয়ার পথে ডানদিকে তাকাতে নয়াবাজারকে মনে হলো পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়া একটা আস্ত শব যেন বা। জায়গায় জায়গায় তখনো ধোঁয়া উঠছিল।

ঢাকার বুকে এরপর কী কী ঘটেছিল, তার বিবরণ দেওয়ার ইচ্ছে আমার নেই। সেসব কথা ইতিহাস-সচেতন পাঠকদের সবাই জানেন। কিন্তু যার কথা কেবল অল্প কয়েকজন লোকেরই জানা, যাদের মন থেকেও ধূসর থেকে ধূসরতর হতে চলেছে যে অসামান্য লোকটি, সে তো কামরাঙ্গীরচরের আহসানউল্লাহ্‌, আমাদের বাড়ি ও আশপাশের বাড়িতে দুধ জোগানোই ছিল

যার কাজ। সাদাসিধে দোহারা। বরাবর শার্ট ও লুঙ্গি পরে আসত। হাতে বড় বাকেট। যেদিন কোনো পরব বা অনুষ্ঠানের জন্য বেশি করে দুধের প্রয়োজন হয়ে পড়ত, তোলবলে দেহে দুলকি চালে ভাঁড় কাঁধে নিয়ে আসত দুই ঘড়া দুধ। বাড়ির বউ-ঝিয়েরা মজা করত তাই নিয়ে! বলত, ঘড়া প্রতি কত কেজি পানি দিলে আহসান মিঞা?

জিভ কেটে আহসানউল্লাহ্ বলত, নাউজুবিল্লাহ্ আম্মা, হাত খইসা পড়ব আমার, যদি...।

কথা শেষ না করে ততক্ষণে সে 'পোয়া' দিয়ে দুধ ঢালতে লেগেছে। সবশেষে আঁকবাড়িতে ঢ্যারা দিয়ে 'আসি গো মা-বুইনেরা' বলে কাঁধে ভাঁড়টি তুলে চলে যেত।

হয়তো আজও, এত কাল পরও দুধ জুগিয়ে যেত আহসানউল্লাহ্, যদি না একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধ ওর জীবনকে তচনচ করে দিত।

ঢাকার মহাপ্রলয়ের কথা সারা দেশে, দেশের বাইরে ছড়িয়ে পড়তে দেরি হয়নি। প্রত্যেকের এক প্রশ্ন : আমরা নিরাপদ তো? আমাদের নিবাস ধানমন্ডির ১৯ নম্বর সড়কে। যারা নিরাপদ মনে করলেন না, বাড়িগুলো দারোয়ানদের হাতে সঁপে দিয়ে একে একে চলে গেলেন আর সবার মতো, গাঁয়ের ঠিকানায়। ঢাকা শহরের অন্যান্য পল্লির মতো আমাদের ১৯ নম্বরও প্রায় খালি হয়ে গেল। সুনসান ফাঁকা রাস্তাগুলোয় হঠাৎ হঠাৎ গাড়িঘোড়ার শব্দে চমকে উঠতাম। মাঝে মাঝে খবর চাউর হতো মোহাম্মদপুর থেকে বিহারিরা এল বলে—লুটেপুটে নেবে সব। কারও দেহে মাথাটি থাকবে না। রক্তে স্নান করে পবিত্র হবে ওরা।

—ও খোকন, বলে কী এরা সব? একটা ব্যবস্থা দেখ্ না বাবা। রুবিদের বাবাকে বলে দেখ্ না—ওদের তিনতলাটা আমাদের একতলার চেয়ে অনেক ভালো।

আমাদের বাড়িটা ছিল আসলে ঝাঁজিধরা পাংশু। তাইতে পাঁচিলহীন উদোম। যে কেউ সহজেই অন্দরমহলের খবর নিতে পারত। আর তাই তো মায়ের এই আকুতি।

মা যেন জন্মেছিলেন তরাসের গর্ভে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় কলকাতার বুকে থেকে থেকে যখন জাপানিদের বোমাবাজি চলছিল, সন্তানদের বুকে আগলে ওঁর সেকি শঙ্কা আর চোখের জল! আর কলকাতার মহাদাঙ্গায় গড়পারের গুন্ডাদের মুহুর্মুহু আক্রমণে কম্পমান আমাদের বাড়ি। বাড়ির কর্ত্রী অসহায়া মা আমার প্রতিক্ষণে একবার করে মরেন!

আমার সেই মায়ের আকুতি।

রুবিদের তেতলায় কিংবা পড়শি আর কারও বাড়ির নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যাওয়ার আকুতি। এভাবেই তরাসে-জীবন কাটে আমাদের।

এই যখন আমাদের দিনমান, তখন একদিন দুধ দিতে এসে আহসানউল্লাহ বললে, আপনারা কেন আমার বাড়িতে চলেন না। কেউ কিছু করতে পারব না।

আমরা তেমন গা করলাম না। একজন সামান্য দুধওয়ালা আমাদের ভার বইতে পারবে কেন! এভাবে আরও কয়েক দিন চলে। আমরা মানসিকভাবে বিধ্বস্ত। সুযোগটা নিলে আহসানউল্লাহ। নাছোড়বান্দার মতো বললে, আমি আপনে গো কোনো কথাই শুনুম না। আপনেরা তো একলা না, এই পাড়ার খন্দকার সাব, দবির সাব, ওই যাগো যাগো বাড়ি দুধ দেই, সকলেই রাজি হইছে। আপনেরা না কইরেন না। কাইল বৈকালে আসুম, তৈরি থাইকেন।

আমরা যেন তৈরিই ছিলাম, রাজি হয়ে গেলাম। অবশ্যি এর একটা তাৎক্ষণিক কারণও রয়েছে। সেদিনই আমাদের বাড়ির কাছেই একটা দোতলা খালি বাড়িতে জাঁকিয়ে বসেছিল এক আর্মি অফিসার। খেলার মাঠে (বর্তমান ক্রিকেট স্টেডিয়াম, তথা আবাহনী মাঠ) তাঁবু পড়েছে পশ্চিমা সেনাদের। সারা দিন ঘরে বসে থেকে থেকে গা-হাত-পা শিটে মেরে গিয়েছিল। তাই সন্ধেবেলা একটু পায়চারি করছি, সঙ্গী আমাদের বড় জামাইবাবু এবং পাড়ার অবশিষ্ট দু-একজন প্রতিবেশী। বোধকরি ওই আর্মি ক্যাপ্টেনের বাড়ির কাছেই এসে থাকব, হঠাৎ কৃষ্ণচূড়ার অন্ধকারের আড়াল ফুঁড়ে চৌগোপ্পা এক আর্মি অফিসার আমাদের সামনে এসে উর্দুভাষায় 'শান্তি বর্ষিত হোক' বলে শান্তি ভঙ্গ করল। আমরা প্রত্যভিবাদন জানালে প্রথমেই জিগ্যেস করল, ইধার কোই ইন্দু হ্যায়? কোই মুক্তি?

আমরা যখন জানালাম যে, না, এখানে কোনো হিন্দু বা মুক্তিযোদ্ধা নেই, তখন অফিসারটি লম্বা একটা বক্তিমের পর উপদেশ দিয়ে উপসংহার টানলে এই বলে যে, চারো তরফ ইস লোগো নে ক্যামুফ্লাঝ্ করকে ঘুমতা ফিরতা। আগর প্যায়ছান লিয়া তো হামারা পাস এত্তেলা দে দেনা, ঠিক হ্যায়?

সবাইকে ওরা বিভীষণ ভাবে—এ না হলে পাঞ্জাবি বুদ্ধি! আমাদের মাথায় তখন কামরাঙ্গীরচর। একটু নিরাপদ আস্তানা।

পরদিন পাশের বাড়ির দারোয়ানের হাতে বাড়িটা সঁপে দিয়ে বাবা-মা ভাই-বোন ও জামাইবাবু মিলে বারো সদস্যের দলটি রাস্তায় পা ফেললুম আহসানউল্লাহ্‌র পদাঙ্ক অনুসরণ করে, ওর উপদেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়লুম,

যেন আর্মি অফিসারটি টের না পায় আমরা কী উদ্দেশ্যে, কাদের ভয়ে পালাচ্ছি। আমাদের চোখেমুখে একই ভাষা : কাতলা পড়েছে, জাল গুটোও! রায়েরবাজারের গোড়েন ভেঙে বুড়িগঙ্গার শুকনো বুকে পা ফেলেছি, ও বাবা, এ যে মস্ত মিছিল! ওই তো খন্দকার সাহেব, তাঁর গিন্নি, ছেলে দুটো, রুবি, রুবির বুড়ো বাবা-মা, ভাইয়েরা—আরও, আরও কত চেনা-অচেনা আহসানউল্লাহ্‌র 'গাহেক'দের মিছিল—প্রায় শখানেক তো হবেই। পাগল আর কাকে বলে!

যখন পৌঁছালাম ওর বাড়ি, তখন বিকেল পাঁচটা হবে। ফুটবল মাঠের মতো পেল্লায় উঠোন। গোবরে নিকোনো। প্রথমেই বাংলাঘর—বুড়ো ও মেয়েরা বসলেন সেখানে, অন্যেরা পাশের একটি ছোটো দোচালা আধো খোলা ঘরে, কেউ কেউ গাছের ছায়ায়। আর ছেলেমেয়েরা উঠোনের অমন স্নেহসঙ্গ এড়ায় কী করে—ওদের উদ্দাম ছোটাছুটি আর হাসি রাশি রাশি তখনকার গুরুতর পরিবেশকে কিছুটা হলেও হালকা করে দিল।

উঠোনের ডান পাশে সারিবদ্ধ বাথান—নীরবে জাবর কেটে চলেছে নাদুসনুদুস গাভি সব। উচক্কা এতগুলো লোকের উপস্থিতি তাদের খাওয়ায় কোনো বাদ সেধেছে বলে মনে হলো না। উঠোনের শেষ প্রান্তে কয়েকটি চৌচালা ঘর—আহসানউল্লাহ্‌দের বসতবাড়ি।

এমন সময় আহসানউল্লাহ্ বাকেট নিয়ে হাজির। এরপর নানা আকারের গেলাসে ডাবরিতে ভাণ্ডিতে দুধ ঢেলে এক একজনের হাতে তুলে দিয়ে বলে, গরিবের বাড়ি আইছেন, এর বেশি কিছু দিয়া খুশি করতে পারলাম না। মাফ কইরা দিয়েন। আমরা বিব্রত বোধ করি। সকলে এককাট্টা হয়ে আমরা বলি, একি, তুমি যে দুধ সব বিলিয়ে দিচ্ছ! এ কিছুতেই হতে পারে না। এ বাবদ টাকা তোমায় নিতেই হবে।

--সাহেব, আমরা গরিব হইতে পারি; কিন্তু সবকিছু আমরা ট্যাকা দিয়া মাপি না। আল্লায় আমারে যা দিছে, আপনেগো খেদমত করলে তা ফুরাইয়া যাইবো না। খান, খাইয়া আমার পরানডারে এট্টু শান্তি দেন।

এরপর আর কথা চলে না। দেখতে দেখতে সন্ধে গড়িয়ে ঝিঁঝি পোকার ডাক জানিয়ে দিয়ে গেল, রাত এসে গেছে। খুব আস্তে করে কান পেতে কেউ কেউ বিবিসি ও আকাশবাণীর সংবাদ শুনছে, তাদের ঘিরে আরও সবাই। দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সবাই যেমন উদ্বিগ্ন, নিজেদের আশু নিরাপত্তার ব্যাপারেও কম উৎকণ্ঠিত নয়। যদি খবর পেয়ে আর্মিরা আহসানউল্লাহ্‌র বাড়ি চড়াও হয়? যদি প্রশ্ন তোলে, আপনারা এখানে দলবদ্ধ হয়ে কী করছেন?

আপনারা মুক্তিযোদ্ধা নন, তার প্রমাণ কী? কী জবাব দেবে তারা? শেষ পর্যন্ত স্থির হয়, কাল সকালেই আমরা ফিরে যাব যার যার ডেরায়। তা ছাড়া একটা লোকের ওপর এ বড় জুলুম হয়ে যাচ্ছে। খাওয়া-দাওয়া, থাকা-শোয়া, টয়লেট, স্নানাদি—সব ক্ষেত্রেই সসেমিরা দশা। এতটা ভেবে দেখেনি কেউ। সবাই আহসানউল্লাহ্‌র আবেগের দ্বারা বশীভূত হয়ে গিয়েছিল।

রাতে খিচুড়ি পরিবেশন করল আহসানউল্লাহ্ একাই। ও বাড়ির অন্য পুরুষ সদস্যরা কেউ পাশে এসে দাঁড়ায়নি সেদিন। আর্মিকে সবার বড় ভয়। পরিস্থিতির উত্তেজনায় সবাই খিদের কথা ভুলে ছিলাম। এখন গরম গরম খিচুড়ি পেয়ে সবাই যেন একটু বেশিই খেয়ে ফেললাম। আহসানউল্লাহ্‌র যিশুর ভাঁড়ারে কমতি পড়েনি একটু।

কিন্তু আহসানউল্লাহ্, অন্দরমহলের গিন্নিবান্নিরা, রান্নাবান্নার এই মহা আয়োজন কীভাবে সম্পন্ন করল, করতে পারল, সে কথা ভেবে সেদিন কেবল অবাকই হয়েছিলাম মাত্র। কিন্তু আজ মনে হয় আহসানউল্লাহ্ ও তার পরিবার সেদিন সারা দেশের অসহায় লোকগুলোর মুখেই যেন খাবার তুলে ধরেছিল।

পরদিন সকালবেলা আমাদের চলে যাওয়ার আয়োজন দেখে আহসানউল্লাহ্ অপরাধীর কাঠগড়ায় দাঁড়ানোর মতো ভঙ্গি করে বলল, আপনাদের অনেক কষ্ট হইতাছে বুঝতে পারতাছি, তবু আরও কয়েকটা দিন হাবভাব বুইঝা গেলে ভালা হইত না?

শেষ পর্যন্ত আমাদের দৃঢ় সংকল্প দেখে আহসানউল্লাহ্ বললো, সহালে কারো বাড়ি থিকা না খাইয়া গেলে সেই বাড়ির অমঙ্গল হয়। যাইবেনই যখন, তখন দুইডা মুড়ি খাইয়া যান।

গুড়মুড়ি খেয়ে তৃপ্ত মনে আমরা যখন রওনা দিলাম নতুন স্বপ্নের খোঁজে, তখন বেলা নটা। কাউকে বলতে হলো না। আমরা নিজেরাই ১৪৪ ধারা জারি করে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে এগোতে লাগলাম—কারও সন্দেহ যেন তাড়া না করে ফেরে আমাদের।

এরপর বহুদিন আর দেখা নেই আহসানউল্লাহ্‌র। দুধ দেওয়া বন্ধ। নানা আশঙ্কা উঁকিঝুঁকি মারে আমাদের মনে। বিশেষ করে রাতে ওর কথা মনে পড়ে যায়। খাওয়াদাওয়ার পর নিদেন এক কাপ দুধ পান আমার বহুকালের অভ্যাস। তা থেকে বঞ্চিত আমি। লোকটার কী হলো? কী হতে পারে? সব জল্পনা-কল্পনার অবসান হলো একদিন। ওই এলাকার কে একজন বললে, আমরা যেদিন আহসানউল্লাহ্‌র বাড়ি থেকে ফিরে আসি, সেদিনই ওর বাড়ি ঘেরাও করে ফেলেছিল পাকিস্তানি সেনারা। আহসানউল্লাহ্ বুদ্ধি করে সরে

পড়েছিল। বাড়ির গিন্নিবান্নিদের ওপর বেশ ধকল যায়, তচনচ করে ফেলে যত ঘরের আসবাবপত্তর, আর যাবার সময় বাথান থেকে নিয়ে গেছে বাছা বাছা কয়েকটি দুধেল গাই।

আর কিছু জানা গেল না। আমরা এতই স্বার্থপর যে ওর ওই দুঃসময়ে একটু খবর নেব সে সময় আমাদের কারও মনে হলো না। আমরা যে যার নিরাপত্তার কথাই ভাবতে পারলুম কেবল। অথচ আমাদের নিরাপত্তার কথা ভেবে সে সরল মনে যে কাণ্ডটি করল, তারই খেসারত এখন তাকে গুনতে হচ্ছে।

বিজয় লাভের পর ডিসেম্বরের শেষে নাকি জানুয়ারির দিকে, হঠাৎ একদিন আহসানউল্লাহ্র উদয়! গায়েগতরে বেশ উসকেছে। কেমন ঢ্যাঙা টিনটিনে লাগছিল। গায়ের মলিন শার্টটা ঢলকো ঠেকছিল। চুলগুলো ঝোড়ো কাক বুঝি বা! তবে চোখ দুটোতে ফুল্ল সান্দ্র মায়া।

—যুদ্ধ কইরা আইলাম ভাইসাব, বিজয়ীর হাসি সারা চোখে-মুখে।

—সব খুলে বল। শুনলাম, পাকিস্তানি আর্মি নাকি তোমাদের বাড়ি হামলা করেছিল?

—ঠিকই শুনছেন। আপনেরাও গেলেন, সেই দিনই বিকেলে হামড়ি খাইয়া পড়ছিল হারামজাদা কুত্তারা। আমি জানি, আমার শত্তুর আছে। তাই আন্দাজ বুইঝা কাইটা পড়ছিলাম। ফিরা আইসা যখন দেখলাম দুই-একটা গাভি ছাড়া সব কয়ডা শুয়ারগো প্যাটে গেছে, সেই দিনই ঠিক করলাম, এর বদলা নিমু। আর দেরি করি নাই।

—তা এখন যখন পাকিস্তানি সেনারা খতম, দুধ দেওয়াটা শুরু করো। পেট তো চালাতে হবে, নাকি বলো?

—তা তো ঠিক। কিন্তু গাই তো বেবাক শ্যাষ। সরকার থিকা সাহায্য না করলে কী কইরা কী করুম, বুঝবার পারতাছি না। আমি যাওনের পর বাকি যে দুই-তিনডা গাভি আছিল, সে কয়ড়া আর ঘরের থালাবাসন বিক্রিবাট্টা কইরা, চাইয়া-চিন্তা নয়টা মাস কাটাইছে পরিবার। এখন তো দুই চোখে আন্ধার ঠ্যাকে।

কথা শেষ করে আহসানউল্লাহ্ আমার দিকে তাকায়। একটা অভয়বাণী চায় সে।

—সরকার একটা কিছু করবে নিশ্চয়ই। নানা দেশের সরকার সাহায্যের হাত বাড়িয়েই আছে। দেখো, শেখ সাহেব ফিরে এলেই মুশকিল আসান হবে।

—আরেকটা কথা শুনি, সরকার নাকি অস্ত্র জমা দিতে কয়? আহসানউল্লাহ্‌র চোখে-মুখে যেন নতুন সাজো অশুভ ছায়া দেখতে পাই।

—যুদ্ধ শেষ, নেংটো পাকিস্তানি সেনারা এখন ভারতীয় সেনাদের জিম্মায়। এখন তো আমরা স্বাধীন। এই স্বাধীনতাকে বাঁচাবে এখন আমাদের সেনাবাহিনী, তাদেরই এখন অস্ত্র মানায় ভালো। আর আমাদের হাতই এখন অস্ত্র। দেশ গড়ার কাজে এই হাত দুটো যে কত বড় অস্ত্র, তার পরীক্ষা দেওয়ার সময় এসে গেছে।

আমার সব কথা বুঝল কি না জানি নে, কিন্তু খুব উত্তেজিত দেখাল ওর চোখ-মুখ। বলল, কিন্তু যুদ্দ কি শ্যাষ হইয়া গেছে ভাইসাব? আমার তো মনে লয় না।

—কেন, এ কথা বলছ কেন, আমি বিস্ময় মানি।

—আমি মুকখু-সুকখু মানুষ, দ্যাশের ভাবসাব আমার ভালো ঠেকতাছে না। মনে হয় অরা ঘাপটি মাইরা রইছে, সময় হইলে সাপের লাহান ছোবল মারব। তখন অস্ত্র পামু কই?

ওর প্রশ্নে আমি একটু বোকাই হয়ে গেলাম। একেবারে মিথ্যে নয় আহসানউল্লাহ্‌র আশঙ্কা। দেশে তখন যুদ্ধোত্তর চরম বিশৃঙ্খলা। খান-সেনারা বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কিংবা মুক্তিবাহিনীর হাতে যুদ্ধবন্দী নয়, বন্দী ভারতীয় সেনাবাহিনীর অধীনে। তারা, ওই নব্বই হাজার খানসেনার দলটি ভারতীয় পাঞ্জাব রেজিমেন্টের তাঁবে বেশ বহাল তবিয়তেই আছে। টেলিভিশনে তেমনটাই দেখি। যারা এ দেশের তিরিশ লাখ (এই সংখ্যাটা এক রুশি কূটনৈতিকের, এ কথা বেশ মনে পড়ে) নাগরিকের হত্যাকারী, অযুত নারীর নির্যাতনকারী, তাদের বিনা বিচারেই ছেড়ে দেওয়া হবে, এমন একটা কানাঘুষোও বাতাসে ভাসছিল। রাজাকার, আলবদর, আলশামসের সদস্যেরা আত্মগোপন করেছে—হয় বিদেশে পালিয়েছে, না-হয় আত্মীয়দের নিরাপদ আশ্রয়ে রয়েছে, বাকিরা কারাগারে। কিছুই সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে না এদের ব্যাপারে। পাকিস্তানি বাহিনীর অস্ত্রশস্ত্র, সামরিক যানবাহন ভারতীয়দের জিম্মায় থাকায় গুজব পাখা মেলেছে, ওগুলো ক্ষতিপূরণ হিসেবে ভারতেই যাবে।

আমাকে চুপ থাকতে দেখে আহসানউল্লাহ্‌ই আবার মুখ খুললে, আমার ক্যান যেন মনে হয়, অস্ত্র-গুলি আমাগো আবার লাগব। এর পরও আপনে জমা দিতে কন?

—দেখো আহসানউল্লাহ্‌, আমরা এখন একটা স্বাধীন দেশের নাগরিক। সরকার অস্ত্র জমা দিতে বলেছে, দেবে। আইনটা মানতে হবে তো!

—দেখি ভাইবা।

আহসানউল্লাহ্ চলে গেল। ওর ঋজু দেহটার দিকে তাকিয়ে ভাবতে থাকি : মুশকিল আসানের পরে আহসানউল্লাহ্র মনে বিজয়ের আঙিনায় দাঁড়িয়ে এমন দৃঢ় আশঙ্কা কেন?

মাসখানেক পর আহসানউল্লাহ্ এসে হাজির। তত দিনে বঙ্গবন্ধু বাড়ি ফিরেছেন। তাঁর মুখেও একই কথা। বললেন, 'অস্ত্র জমা দাও।' আর যাদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আছে, তাদের ছাড়া বাকি সব রাজাকার-আলবদর-আলশামসকে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে দিলেন। ৯০ হাজার পাকিস্তানি সেনার ব্যাপারে তখনো কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। সিদ্ধান্ত হয়নি ভারতীয় সেনারা কত দিন বাংলাদেশে অবস্থান করবে, আর পাকিস্তানি সেনাদের ফেলে যাওয়া অস্ত্রশস্ত্র ও গাড়িবহরের ভবিষ্যৎ কী হবে, সে ব্যাপারেও চলছিল দোদুল্যমানতা। অথচ চোখের সামনে দিয়ে প্রতিদিনের সমরযান ও অস্ত্রশস্ত্র বাংলাদেশের সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে পাচার হয়ে যাচ্ছিল। আমরা তখন অসহায় দর্শক মাত্র। মেজর জলিলদের মতো কেউ কেউ প্রতিবাদ করছিল বটে; কিন্তু তখনকার যুদ্ধোত্তর রাজনৈতিক জটিল আবর্তে পড়ে সে আলোড়ন তেমন দানা বাঁধতে পারেনি।

আহসানউল্লাহ্কে বেশ বিষণ্ন দেখাল। ওর বসার ভঙ্গির মধ্যে যেন অনেক দুঃখ জমা ছিল। অনেক অভিযোগ।

আমি বললাম, আমাদের দুধ দেবে কবে থেকে আহসান? কিছু হলো?

—কই, কেউ তো আগাইয়া আসে না। দ্যাশ স্বাধীন হইল, কিন্তু আমি যে ফকির হইয়া গেলাম। আমার এতগুলি গাই, আমার সংসার, সব কোথা দিয়া কী হইয়া গেল! একটু থেমে আবার যোগ করল, যাউক গা, যা হইবার হইব। তয় আপনেগো কথা আমি রাখছি—শ্যাখ সাহেবের ঘোষণার ইজ্জত দিছি। আইজ অস্ত্র জমা দিয়ে আপনের এখানে আইলাম—তিনডা রাইফেল আর একটা এসএলআর। তয় ঠিক কাম করলাম কি না জানি না!

—কেন, একথা বলছ কেন?

—রাজাকারগুলিরে ছাইড়া দিল। পাক সেনাগুলিরও শুনতাছি বিচার হইব না, বেবাকটিরে ছাইড়া দিব। এই হারামজাদা খুনি আর লোচ্চাগুলিরে বিনা বিচারে মুক্তি দিয়া কি ভালা কাম হইল?

—তুমি ঠিকই শুনেছ, বড় কিছু শক্তির চাপে পড়েই সরকার এ কাজটা করতে বাধ্য হয়েছে। তবে আমার কথা যদি বলো, এই খুনে, আর মা-বোনদের ইজ্জত লুটেরাদের যারা হোতা, তাদের বিচার হওয়া উচিত ছিল।

—যাউক গা, ওই লোচ্চাগুলি দ্যাশ থেইকা গেলে বাঁচি। কিন্তু ভাই সাহেব, আমার যত ডর এই ঘরের বাঘগুলিনরে। এরা যখন খাঁচা থিকা ছাড়া পাইব, কেমন কইরা ঝাঁপাইয়া পড়ব, দেইখেন। আরো কত রক্ত যে দিতে হইবো, আল্লাই মালুম! আমি যে ক্যান অস্ত্র জমা দিতে চাই নাই, ভাই সাহেব, একদিন বুঝবেন।

আহসানউল্লাহ্ আরও অনেক কথা বলেছিল সেদিন—একজন জ্যোতিষীর মতো। শুভাশুভ বিচার বিদ্যায় আমার কোনো আস্থা নেই। কাজেই আহসানউল্লাহ্‌র আশঙ্কার প্রতি আমি কোনো গুরুত্ব দিইনি সেদিন। আজ এত দিন পর অশিক্ষিত আহসানউল্লাহ্‌র রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদৃষ্টির কথা ভেবে অবাক মানি।

—আইজ আসি, সালামালাইকুম—বলে আহসান বিদায় নিল। ওর গমন পথের দিকে তাকিয়ে ওকে কেন যেন ভগ্নদূত বলে মনে হলো। যে একদিন তার নিরাপত্তার কথা না ভেবে, সামর্থ্য আছে কি নেই বিবেচনায় না এনে, অকৃত্রিম ভালোবাসা দিয়ে আমাদের তার বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছিল, সেই সর্বস্বান্ত লোকটার এখন কেমন দিনমান কাটে, তার ভার্যা, সন্তান ও পরিবারের অন্য সদস্যদের দু বেলা আহার জোটে কি না, কই কামরাঙ্গীরচরে গিয়ে একটু কষ্ট স্বীকার করে এই সামান্য খোঁজ খবরটুকুও তো নিই না! ধিক্!

আহসানউল্লাহ্‌র সঙ্গে ওটাই আমার শেষ দেখা। মাঝেমধ্যে মনে পড়ত ওকে। বিকল্প দুধওয়ালা এসে যাওয়ায় এবং ক্রমে *ডানো, মিল্ক ভিটা* দুধের জায়গাটা দখল করে নেওয়ায় ভুলেই গিয়েছিলাম ওর কথা। প্রায় ১২-১৩ বছর পর ১৯৮৫ সালে একবার এসেছিল আমাদের বাড়ি। সেদিন আমরা কেউ বাসায় ছিলুম না। বাড়িতে ফিরলে ছোটো ভাইয়ের নবপরিণীতা স্ত্রী বললে, আহসানউল্লাহ্ নামে একজন লোক এসেছিল। ও নাকি আগে আপনাদের দুধ দিত।

সঙ্গে সঙ্গে জ্যোৎস্নার আলোয় নাওয়া কামরাঙ্গীরচরের শ্রীমন্ত আঙিনা তার সব রূপরসশব্দগন্ধ নিয়ে হাজির।

তারপর ধূসর থেকে ধূসরতর হয়ে যাওয়ার আগেই আহসানউল্লাহ্ আবার হাজির। হাজির হবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা যত দিন জাগরূক থাকবে, তত দিন।

সিদ্দিকবাজার থেকে নবাবপুর

ফুলবাড়িয়া স্টেশনের পোর্টিকোয় পা দিলে প্রথমেই চোখে পড়ত রাস্তার ওপারে সারিবদ্ধ বাঁশের তৈরি আসবাবের দোকান। যে-কারণে এলাকাটির নাম বাঁশপট্টি। উচ্ছিষ্ট কিছু বাঁশ ও বেতের আসবাবের দোকান কিছুকাল আগেও চোখে পড়ত। ইদানীং ওপাড়ায় যাওয়া হয়ে ওঠে না, তাই বলা যাবে না ওগুলো আছে কি নেই। অথচ একসময় এটাই ছিল কুটিরশিল্পের আস্তানা। এখন তো শহরের নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে, বিশেষ করে গ্রিন রোড ও পান্থপথে বেতের কাজের রমরমা ব্যবসা। হৃতগৌরব বাঁশপট্টির পেছনেই সিদ্দিকবাজার এলাকা। এই নামকরণের পেছনে আছে দেওয়ান পরিবারের পীর, মিঞা মহম্মদ সিদ্দিক। এখানেই তাঁর মাজার, আজও ভক্তকুলকে কম আকর্ষণ করে না। এখানেই থাকতেন ঢাকা শহরের গণ্যমান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিত্ব সৈয়দ মোহাম্মদ তৈফুর। এঁর সম্বন্ধে আগেই বলা হয়ে গেছে।

সিদ্দিকবাজারের পাশেই আলুরবাজার। মোগল আমল থেকেই আছে। এটার মালিক ছিলেন আল্লাইয়ার খান। আওরঙ্গজেবের একজন কর্মকর্তা ছিলেন। বাস করতেন লালবাগ দুর্গে। সময়ের পথ বেয়ে আল্লাইয়ার বাজার

নামটি জিভের ডগায় বিকৃত হতে হতে প্রথমে হয়েছে আল্লুর বাজার। তারপর আলুর বাজারে গিয়ে পৌঁছেছে। অথচ এ বাজারে আলু ছাড়া অন্য সওদাপাতিও লোকে করত বা করে থাকে।

এখন এই নবাবপুর রোড ধরে যদি এগোতে থাকি, তাহলে প্রথমেই ডান দিকে চোখে পড়ত রাস্তা থেকে উঁচুতে ওষুধ বিপণি—ডন ফার্মেসি, যার কথা এর আগে বলেছি। এই দোকানের কোল ঘেঁষে কিছু পত্রপত্রিকা নিয়ে বসে থাকতে দেখতাম কুচেল এক কলকাতিয়াকে, যাদের চেহারা দেখলেই আমায় চট করে কলকাতার কলেজ স্ট্রিটের প্রেসিডেন্সি কলেজের ফুটপাতের পুরোনো বইয়ের পশারিদের কথা মনে করিয়ে দেয়। এর সঙ্গে গল্প করতে গিয়ে জানা হলে গেল ওই পাড়ারই লোক সে। স্বাধীনতার একেবারে গোড়ায়, মেডিকেল কলেজের সামনে, মানসী সিনেমার অনতিদূরে, সদরঘাটের ব্যাপটিস্ট মিশনের দোরগোড়ায় আর চকবাজারের গোলচক্করে যে কটা বুক স্টল ছিল, সবটাতেই এই কলকাতিয়াদের একচেটে অধিকার ছিল। তো এই স্টলের পাশ কাটিয়ে যত এগোই পাশাপাশি ঘেঁষাঘেঁষি দোকানপাট। তখনো হিন্দু দোকানিরা আছে—পাট তুলে নেয়নি। ফাঁকেফোকরে ঢুকে পড়েছে কিছু অবাঙালি মুসলমান। বামাচরণ চক্রবর্তী রোডের মোড়ে এলেই চমকে উঠতাম প্রতিবার—একটা সুন্দর ইউরোপীয় ছাঁদে তৈরি দোতলা বাড়ি—শহরে যেন বা হঠাৎ আলোর ঝলকানি! কেমন বেমানান মনে হতো, আজও মনে হয়। এটাই কি ছিল বুদ্ধদেব বাবুর যৌবনকালের বিলিতি মদের ঝকঝকে দোকান রায় কোম্পানি, যেখান থেকে স্কুল ছুটির পর বাড়ি ফেরার পথে তিনি তাঁর সুপ্রিয় চকলেট কিনতেন মাঝেমাঝে? না, বুদ্ধদেব বাবুর প্রসাধনহীন অ্যালবার্ট লাইব্রেরি যেমন দেখা হয়নি, ওঁর অর্ধদগ্ধ চুরুট মুখে বসে ঢাকা শ্মশ্রুমান সমর্থ বৃদ্ধকেও না। তবে ওই যে যখন তিনি বলেন, 'রায় কোম্পানির মুখোমুখি একটি মিষ্টান্ন ভাণ্ডার যা খোলা থাকে নিশুতি রাত'—সেই 'মতিলাল সুইটমিট'—এই সেদিনও আমার চোখে পড়ত—এত কাল ভেঙেও 'পাছে ছদ্মবেশে পরিরা খেতে এসে ফিরে যায়'—তাই খোলা থাকত নিশুতি রাত পর্যন্তই।

তখনো স্টুডিও ওরিয়েন্ট হয়নি, কিন্তু আছে তো ৮১ নম্বর সদনে ১৯৩২ সনে স্থাপিত বনেদি দাস অ্যান্ড কোম্পানি (DOSS & Co.)—ফটো তোলা এবং ফটোর যাবতীয় সরঞ্জামের দোকান। সেকালে ফটো তোলার আরেকটি যে দোকান ছিল, সে তো ভিক্টোরিয়া পার্কে : ঢাকা মিউজিক্যাল মার্ট—A Silent Music—এই রোমান্টিক আত্মপরিচয় যার মদগর্বী ভূষণ। সে কথায় পরে

আসছি। তো কথা আমাদের দাস কোম্পানি নিয়ে। এর সঙ্গে বোধকরি অগ্নিদেবের একটা যোগ আছে। চৌষট্টির সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় আগুনে ঝলসে সম্পূর্ণ পুড়ে গিয়েছিল দোকানটা। তার আগে লুটপাট তো হয়েছেই। আইয়ুবি আমলের কী সুমতি হলো, ক্ষতিপূরণ দিলে, বোধকরি, আন্তর্জাতিক চাপে মান বাঁচানোর তাগিদে। কিন্তু মাথা তুলে দাঁড়াতে না-দাঁড়াতে একাত্তরে আবার লুটের কবলে! মজা কী, এত যে ঝুটঝামেলা গেল, দাস কোম্পানি কিন্তু আজও মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে—মাথা নুইয়ে পালায়নি কোথাও।

আরেকটু এগোলেই একটা বইয়ের দোকান। নামহীন। হঠাৎ চোখে পড়ত না। নানা সাইনবোর্ডে আকীর্ণ সেকেলে ঝাঁজি-ধরা বাড়িটার কোথায় শুরু, কোথায় শেষ, ধরার উপায় ছিল না। দুই আড়াই হাত চওড়া সরু এক চিলতে গোলকধাঁধা—সুড়ঙ্গের মতো কোথায় যে শেষ, ধরার উপায় ছিল না। কলকাতিয়া কাঁচি উর্দুওয়ালার দোকান। কিছু হালকা বাংলা ইংরেজি পত্রপত্রিকা ছাড়া সিংহভাগ জুড়েই ছিল উর্দু পত্রপত্রিকা ও গল্প-উপন্যাসে ঠাসা। পত্রিকার ভিড়ে *শামা* তো অবধারিত ছিল। দিল্লি ও করাচি থেকে বেরোত। বহু বছর ভারতবর্ষে আঞ্চলিক ভাষায় মুদ্রিত পত্রিকার মধ্যে কাটতির দিক থেকে ছিল প্রথম। এখনো বোধ করি জায়গাটা বেহাত হয়নি। এরপর গল্প-উপন্যাসের রাজ্যে যিনি সবচেয়ে জনপ্রিয় ছিলেন আমাদের শরৎবাবুর মতো, তিনি সাদৎ হাসান মান্টো। কৃষণ চন্দর, ইসমত চুগতাই, খাজা আহমদ আব্বাস, গোলাম আব্বাস প্রমুখও কম জনপ্রিয় ছিলেন না। তবে যে বইয়ের বেশি কাটতি ছিল, যারা লঘু লেখা পছন্দ করেন, পৃথিবীর আর সব পাঠকের মতোই, সে তো জাসুসি দুনিয়া; অর্থাৎ গোয়েন্দাদের ভুবন। *জাসুসি দুনিয়া* নামেই একটা পত্রিকা ছিল, যার জনপ্রিয়তা ঈর্ষা করার মতো। এসব বই, পত্র-পত্রিকা লাহোর, করাচি, দিল্লি থেকে আসা মাত্র বিক্রি হয়ে যেত, আমাদের বাংলা বইয়ের মতো বছর গুনতে হতো না। সবারই তো ক্রয়ক্ষমতা থাকত না বা সংগ্রহ করার বাতিকও ছিল না। তাদের বেলায় ছিল lending library-র সুব্যবস্থা। এখনো 'মানসী' সিনেমা হলের কাছে একটা বইয়ের দোকান আছে, যার মালিক বাঙালি, কিন্তু ব্যবসা অধিকাংশ উর্দু বই ও পত্রিকার, জামানত ও কিছু অর্থের বিনিময়ে বই-পত্রিকা ধার নিয়ে পড়া যায়। সন্ধে হলেই এই দোকানে ঘরমুখো উর্দু-পাঠকের ভিড় দেখে মনে শ্রদ্ধা জাগে। নিজের ভাষার প্রতি এদের কী সান্দ্র মায়া! কথায় কথায় জানতে পারি, এই ব্যবসা করে কুমিল্লার ভদ্রলোক জুরাইনে জায়গা কিনেছেন, বাড়ি করেছেন, ছেলেমেয়েদের বিয়েশাদি সবকিছু সাঙ্গ করেছেন।

আর নূরু মিঞার দোকান সম্পর্কে না বললে অনেকটাই অবলা থেকে যাবে এ সম্পর্কে। গুলিস্তানের পেছনে ওই যেখানে ফুচকার দোকানগুলো ছিল, তার পাশেই ছিল নূরু মিঞার দোকান। কে বলবে এ বিহারি নয়, নোয়াখালীর লোক! যৌবনে পালিয়ে কলকাতায় গিয়েছিল ভাগ্যান্বেষণে ওই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালে। প্রথমে সহকারী হিসেবে, পরে নিজেই ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের ফুটপাতে পত্রপত্রিকার দোকান খুলে বসে। কমিক স্ট্রিপ, হলদে ম্যাগাজিন ও প্যারিস কার্ডের রমরমা ব্যবসা গড়ে ওঠে ওর। জি আই ব্লু ও টমিদের ক্রেতা হিসেবে পেয়ে আহ্লাদ আর ধরে না! কিন্তু সুদিন ফুরিয়ে আসে যুদ্ধ শেষে, যখন একে একে সৈনিকেরা বাড়িমুখো হয়। এক জি আই যুবা বাড়ি যাওয়ার আগে ওর সঞ্চিত সব বইপত্র এবং এক 'থলে' টাকা দিয়ে যায় নূরু মিঞাকে। এক গাল হেসে কেলেকিষ্টি নূরু মিঞা ওর কলকাতাই বুলিতে বলে ওঠে, মেরা সর্ ঘুমা গায়া আওর সাদি কর লিয়া!

আবুল বরকত

সফিউর

'আমি কি ভুলিতে পারি'

সুরারোপিত কালজয়ী গানটির গীতিকার কবি আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী 'আমি কি ভুলিতে পারি'র জন্মের ইতিহাসটা এভাবে বর্ণনা করেছেন : 'এ গান আমি লিখলেও এটি শুধু আমার গান নয়, এটি এখন জনগণসংগীতে পরিণত হয়েছে। ১৯৫২ সালে আমি ছিলাম ঢাকা কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র। ১৪৪ ধারা ভাঙার সিদ্ধান্ত নেওয়ার বৈঠকে আমি ছিলাম শেষের দিকে। গুলির পরে শুনি মেডিকেল কলেজেব আউটডোরে একটি লাশ পড়ে আছে। গিয়ে দেখি, সেটি আবুল বরকতের লাশ। সেখানে সবাই তখন কাঁদছিলেন। সেই লাশের সামনে দাঁড়িয়ে কবিতার একটি লাইন 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো' আমার মনে আসে।

"ঘটনার পর ঢাকা কলেজ বন্ধ করে দেওয়া হয়। আমি প্রথমে বংশালে দাউদ খান মজলিসের বাসায়, পরে দুজন মিলে শফিক রেহমানের [এখন *যায়যায়দিন*-এর সম্পাদক] বাসায় আশ্রয় নিই। অনেক পরে আহমদ হোসেন [এখন জাতিসংঘ সমিতির সাধারণ সম্পাদক] এসে আমাকে একটি ইশতেহারে ছাপা এবং অনুষ্ঠানে পড়ার জন্য কবিতাটি শেষ করে দিতে বলেন। তাঁকে পাঠিয়েছিলেন আবদুল্লাহ আলমুতী শরফুদ্দীন। শেষ পর্যন্ত সে অনুরোধেই শফিক রেহমানের বাসায় বসে পুরো কবিতাটি লিখে ফেলি। পরে কবিতা লেখার জন্য আমাকে ঢাকা কলেজ থেকে আরও এগারো জনের সঙ্গে

বহিষ্কার করা হয়। পরে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী বিবৃতি দেন বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহারের জন্য। এক মাস ২৩ দিন পর আমাদের ওপর থেকে বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করা হয়।

"শিল্পী আবদুল লতিফ প্রথম গানটির সুর করেন। পরে '৫৩ সালে আলতাফ মাহমুদ প্রথম সুরকার আবদুল লতিফের অনুমতিক্রমে নতুন করে সুর করেন। সেই সুরে গানটি অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা লাভ করে। এখনো সে সুরেই গানটি গাওয়া হয়। ..."

এখানে উল্লেখ্য, গানটির স্বরলিপি রচনা করেন উপমহাদেশের স্বনামখ্যত সুরকার কমল দাশগুপ্ত। এই একুশেকে ঘিরে আরেক কবি হাসান হাফিজুর রহমান অস্থির হয়ে গেলেন একটা কিছু করতে। ছোটাছুটি করে সংগ্রহ করলেন কবি-সাহিত্যিক-শিল্পীদের কাছ থেকে কিছু সাজো লেখা আর ছবি, জন্ম নিল এক অপূর্ব সংকলন—*একুশে ফেব্রুয়ারী*। মায়ের গহনা বিক্রি করে, ধার করে, চাঁদা তুলে এবং এমনই আরও বিচিত্র উপায়ে এই সংকলনের খরচ মেটাতে হয়েছিল হাসানকে। শুধু তা-ই নয়, নিজেও লিখলেন কবিতা, কোনো কবির কলমে প্রথম উচ্চারিত হলো একুশের শহীদদের নাম :

> আবুল বরকত নেই; সেই অস্বাভাবিক বেড়ে ওঠা
> বিশাল শরীর বালক, মধুর স্টলের ছাদ ছুঁয়ে
> হাঁটতো যে তাঁকে ডেকো না; ...
> সালাম, রফিক উদ্দিন, জব্বার কি বিষণ্ন থোকা থোকা নাম;
> এই এক সারি নাম বর্শার তীক্ষ্ণ ফলার মতো এখন
> হৃদয়কে হানে; ...
> যাঁদের হারালাম তাঁরা আমাদেরকে বিস্তৃত করে
> দিয়ে গেল দেশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে কণা
> কণা করে ছড়িয়ে দিয়ে গেল দেশের প্রাণের
> দীপ্তির ভেতরে মৃত্যুর অন্ধকারে ডুবে যেতে যেতে।
> আবুল বরকত, সালাম, রফিক উদ্দিন, জব্বার
> কী আশ্চর্য, কী বিষণ্ন! একসার জ্বলন্ত নাম॥

এই সংকলনের প্রচ্ছদ ও অন্যান্য ছবি আমার আরেক সতীর্থ মুর্তজা বশীরের। সংকলনের এই কাহিনি আমরা সবাই কমবেশি জানি; কিন্তু ওপার বাংলায় এই রক্তঝরা ভাষা আন্দোলনের মহান ঘটনাটি কেমন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল, তা বোধ করি, অনেকেরই অজানা।

সেদিন আমার পুরোনো বইপত্রের মহারণ্য থেকে আমার হাতে তুলে দিয়ে মেজো ছেলে তারেক বললে, এই নাও বাবা, তোমার কাজে লাগতে পারে।

পারে মানে, এযে ধুলি-কুড়োনো রক্তমাখা অর্ঘ্য-ডালা : *ওরা প্রাণ দিল।* হাসান হাফিজুর রহমানকে যে জ্বালা তাড়িয়ে ফিরেছে, একই কালে ওপারেও ঘটেছিল তা-ই। জন্ম নিয়েছিল প্রায় একই সময়ে একুশের এক সংকলন : *ওরা প্রাণ দিল,* বাংলা ১৩৫৯ সনের আশ্বিনে (১৯৫৩, সেপ্টেম্বর)। প্রকাশের দায়িত্বে ছিলেন শিবব্রত সেন, রেণু প্রকাশনী, ২০ বি, বালীগঞ্জ স্টেশন রোড, কলকাতা-১৯। মূল্য চার আনা। লেখকদের তালিকায় রয়েছেন—বিমলচন্দ্র ঘোষ, সৈয়দ আবু হুদা, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, মুর্তজা বশীর, নিত্য বসু, তানিয়া বেগম ও ছদ্মনামের আড়ালে 'সহকর্মী'। প্রচ্ছদপটের শিল্পীর পরিচয় দেওয়া হয়েছে এভাবে—গণ-আন্দোলনের অংশীদার জনৈক শিল্পী। তবে আঁকার স্টাইল দেখে মনে হয় মুর্তজা বশীরেরই আঁকা। সংকলন-সম্পাদনায় উক্ত সহকর্মী। এই সংকলনের একটি বিজ্ঞাপন আমার দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পাবেনি :

> পূর্ব বাংলার রাজবন্দীদের জন্য
> বই, পত্রিকা ও অর্থ সাহায্য করুন।
> সাহায্য পাঠাবার ঠিকানা :
> সতীশ পাকড়াশী
> ১১৫-এ আমহার্স্ট স্ট্রীট (তেতলা)
> কলিকাতা-৯
> বিকাল ৬টা হইতে ৮ পর্যন্ত অফিস খোলা থাকিবে।

স্বকৃত বঙ্গভঙ্গের নিদারুণ দুঃখ ও জ্বালাবোধ থেকে উৎসারিত এ যেন এক রকম প্রায়শ্চিত্ত। সংকলনের পাতা ওল্টালে এরপর আমরা লক্ষ করি শিশু-পুত্র কোলে শহীদ শফিউর রহমানের ছবি। ঢাকা হাইকোর্টের এই কর্মচারী ২২ শে ফেব্রুয়ারি ছাত্রদের পাশে দাঁড়িয়ে প্রাণ দিয়েছিলেন। শহীদ শফিউর রহমান সম্পর্কে ওঁর স্ত্রী আকিলা খাতুন বছর কয়েক আগে এক সাক্ষাৎকারে যা বলেছিলেন, তা প্রণিধানযোগ্য। তাঁকে যে পেনশন দেওয়া হতো, তা ছিল তাঁর কাছে স্বামীর স্মৃতি। জিয়ার আমলে তা বন্ধ হয়ে যায়। এই রেশ ধরে তিনি বলেন : 'প্রতিমাসে ওই পেনশনের টাকা হাতে পেলে বিশেষ এক অনুভূতি হতো, আমি যেন তার উপস্থিতি অনুভব করতাম। কিন্তু সরকার কী কারণে তা থেকে আমাকে বঞ্চিত করেছে, আমি জানি না।

"বাবা-মা আদর করে ডাকতেন লালবাবু। ভালো নাম শফিউর রহমান। হাইকোর্টের কর্মচারী। একুশে ফেব্রুয়ারি নয়, বাইশে ফেব্রুয়ারি সকালে রঘুদাস লেনের বাসা থেকে বের হন তিনি। কথা ছিল দুপুরের নামাজ পড়ে

ঘরে ফিরবেন। কিন্তু ফেরেননি তিনি আর। সকালের দিকেই পুলিশের গুলিতে মারাত্মক আহত হন। পরে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাবার পর মারা যান। তার বুকে গুলি লেগেছিল। পুলিশ লাশ ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারে—এই সন্দেহে আন্দোলনকারী কয়েকজন ছাত্র তাঁর লাশ লুকিয়ে রাখেন। পরবর্তীকালে ২৪ শে ফেব্রুয়ারি শফিউরের লাশ তাঁর পরিবারের হাতে তুলে দেয়া হয়। আজিমপুর গোরস্থানে দাফন করা হয়। ...

"পেনশন পেতেন তিনি প্রথমে ৬৪ টাকা, পরে তা ৯০ টাকা হয়। ...১০০ টাকার সামান্য কিছু বেশি পেতেন। ...একশ টাকা বড় কথা নয়, কিন্তু আমার কাছে এই পেনশন স্বামীর স্মৃতি। আমি তা ফিরে পেতে চাই।"

আকিলা খাতুন এখন সরকারের কাছ থেকে মাসিক কিছু অনুদান পান। এতে তাঁর সংসার চলে না। কিন্তু অসুবিধে নেই। ছেলে-মেয়েরা বড় হয়েছে। ওরা যখন ছোট ছিল, কষ্ট হতো। কিন্তু তখন কেউ এগিয়ে আসেনি। ভীষণ কষ্টের মধ্যে তিনি সন্তানদের বড় করেছেন।

আকিলা খাতুনের অভিযোগ: "একুশের প্রথম শহীদ মিনার উদ্বোধন করেছিলেন শফিউরের পিতা মাহবুবুর রহমান। ইতিহাসের এই অধ্যায়কে আজ অনেকেই ভুলে গেছেন; কেউ বিকৃত করতে চাচ্ছেন।" তিনি জানান, "এই একটি ঘটনা নয়, ভাষা আন্দোলনের পুরো ইতিহাসকেই নানাভাবে বিকৃত করা হচ্ছে। জাতির জন্যে এটা ক্ষতিকর।" আকিলা খাতুনের আরো দুঃখ: "ফেব্রুয়ারি এলেই কি শুধু আমাদের কথা মনে পড়ে? বছরের আর সময়টাতো আমাদের কেউ খোঁজখবর নেন না।"

এই অভিযোগ সবার, বরকতের মা যত দিন জীবিত ছিলেন; তাঁর, রফিক, সালাম এবং আরও অনেক পরিবারের।
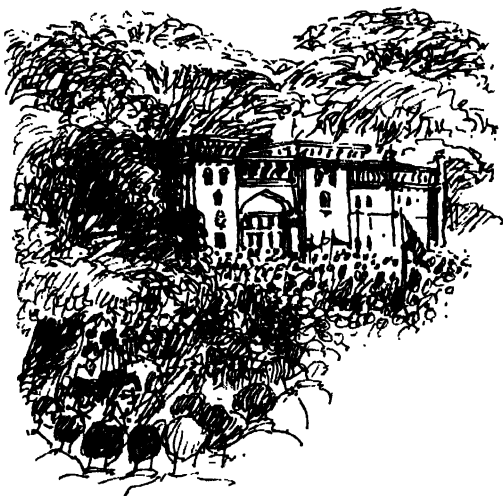
পূর্ণিমা রাতের নির্ঝরিণী-গান

The Italians have voices like
Peacocks; The Spanish
Smell, I fancy go garlick; The
Swedish and Danish
Have something too Rumic, too
rough and unshod, ...
German gives me a cold in the
head, Sets me wheezing
And coughing; and Russian is
nothing but sneezing.

আর বাংলা? কবি মিলটনের লুসিল কাব্যের সঙ্গে যদি জুড়ে বলি :

বাংলা হলো পূর্ণিমা রাতের নির্ঝরিণীর গান—

পক্ষপাতের মতো শোনালেও, খুব একটা বাড়িয়ে বলা হবে কি?

কিন্তু এই নরম মিষ্টি গানের জন্য আটচল্লিশ বছর আগে ১৯৫২-র একুশে ফেব্রুয়ারি যে রক্তের হোলি খেলা হয়েছিল, তা এখনই প্রাচীনকালের কোনো

ঘটনা বলে মনে হয়। এই যেমন কারবালা কি কুরুক্ষেত্র—এই দুটি উপাখ্যানেই তো রাজনৈতিক ও জ্ঞাতিদ্বন্দ্বের পরিণতি, কিন্তু কুহকী খরপোড় সময় তাইতে আধ্যাত্মিক গেলাপ পরিয়ে সুনন্দ বুদ্ধিসম্পন্ন সুধর্মাগণের সেবায় ভারি তৎপর। আবার একুশে যে ভাষা আন্দোলনের সিঁড়ি, এটা ভুলে বাঙালি তার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো ওই সিঁড়িটা ভাঙে টোটেম ফুলের বীজ ছড়িয়ে, পারে তো বলে, ও টোয়েন্টি ফার্স্ট! হ্যাপি বার্থ ডে টু ইউ!

বড় যন্ত্রণা। বাংলা মায়ের এ যন্ত্রণা ১৯৪৮ থেকেই। এখন তো অস্ত্র প্রয়োগেরও বাইরে—বিভিন্ন সময়ে আইন করতে হয়, সার্কুলার দিতে হয় বাংলা প্রচলনের জন্য। সেই আইনের ভাষা যেহেতু বাংলা নয়, ইংরেজি—কাজেই মানার প্রশ্ন ওঠে না। আজও মজা, ওই আইনের যে ধারায় বাংলা ভাষা ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, খোদ সেই ধারাটিই মাঝে মাঝে অদৃশ্য হয়ে যায়!

অথচ বায়ান্ন কত কাছে। স্পর্শ করা যায়। বারুদ ও কাঁদানে গ্যাসের ধোঁয়া আজও চোখে জল নামায়।

—খুব তেতে আছ বুঝতে পারছি। সংগত কারণও রয়েছে। কিন্তু দেখো, তোমাদের চোখ দিয়ে আমাদের দেখাটা বোধ হয় ঠিক হচ্ছে না। তোমাদের চোখ দিয়ে পানি আসাটা বিচিত্র কিছু নয়, কারণ, সবটাই ঘটেছে তোমাদের চোখের সামনে—তাইতে মায়ের মুখের বুলির এই দশা। কিন্তু ওই যে তুমি ইংরেজি নিয়ে বটকেরা করলে, ওরা তো ভক্ত বিটেল—ওদের দিয়ে সবাইকে তুমি বিচার করতে পারো না। নিনি আমার হাতে অসম্পূর্ণ লেখাটা দিতে দিতে বলে।

—এই ভক্ত বিটেদের বিটলেমি যে এখন দেশটাকে রসাতলে নিয়ে যাচ্ছে—এ কথাটা ভাব? যারা সোজা কথা বলে, যাদের ঘ্রাণ চিনিয়ে দেয় তারা কার ভক্তাধীন। কিন্তু তাদের দলটা খুব ছোট্ট। খুবই ছোট্ট।

—তার পরও কথা থেকে যায়। *লিঙ্গুয়াফ্রাঙ্কা* নামে যে মিশ্র ভাষার সৃষ্টি হয়েছিল ইউরোপে বিভিন্ন ভাষাভাষীদের সুবিধের জন্য, আজ ইংরেজি ভাষা একা সেই জায়গাটা দখল করে বিশ্বময় রাজত্ব করছে; কাজেই...

—এটা আমরা সবাই জানি। কিন্তু তাই বলে বিশ্বের তাবৎ ভাষাগুলোকে তো আর ধ্বংস করতে পারি নে—প্রকৃতির অনেক দানের মতো বিশ্বের নানা জায়গায় ছড়িয়ে থাকা পাঁচ হাজারের মতো ভাষাও এক একটা মস্ত সম্পদ। বড় ভাষার দাপটে ছোট ছোট জাতি-গোষ্ঠীর বেশ কিছু ভাষাই ইতিমধ্যে হারিয়ে গেছে। আমরা যখন বাংলার জন্য লড়াই করেছি, তখন উর্দুর কাছে

এই হেরে যাওয়ার ভয়েই করেছি। তাই তো শুধু বুলির জন্য নয়, যখন প্রতিক্রিয়াশীল মৌলবাদী শক্তি আরবি হরফে বাংলা লেখার প্রস্তাব করেছিল, তখন আমরা এই অক্ষরের জন্যও লড়াই করেছি। আমাদের লড়াইয়ের ফসল আমাদের এই বাংলাদেশ। এই লড়াইটার গুরুত্ব যে অপরিসীম, তা বুঝতে পেরেই ইউনিসেফ মাতৃভাষা দিবস হিসেবে একুশে ফেব্রুয়ারিকেই নির্দিষ্ট করে আমাদের ভাষাকে, সেই সঙ্গে পৃথিবীর তাবৎ মাতৃভাষার প্রতি কেবল শ্রদ্ধাই জানায়নি, ভাবী রক্ষাকবচের কাজটিও করেছে।

—ঘাট মানছি বাপু। তুমি লেখো, আমি যাই।

প্রতিমা ওর বাসন্তী রঙের বসনে আলোড়ন তুলে ঘরটাকে আচমকা নীরব করে দিয়ে চলে গেল। আমি কাগজপত্র গুছিয়ে বসলাম। একবার বায়ান্নর একুশের দিনটাতে ফিরতে হয়।

বেশ কয়েক দিন থেকেই ঢাকা চঞ্চল। চারুকলা ইনস্টিটিউটের পাট তখনো চুকিয়ে দিইনি। সেদিন ক্লাস ছিল না। সতীর্থেরা ও কামরুল ভাই তখন বাবুপুরার পুরোনো জাদুঘরে চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজনে ব্যস্ত। ওখানে যাওয়ার আগে ভাবলুম, একবার আমতলাটা ঘুরে আসি। একুশের সকালে আমাদের শরৎগুপ্ত রোডের বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাজপথের ধুলো মেখে সোজা তাই মেডিকেল কলেজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠের মোহনায়। কেমন একটা গা ছমছম সুনসান পরিবেশ। এদিক-ওদিক তাকাই—ইপিআর ও পুলিশ বাহিনীর ভারি দাপট। বুঝলাম, আজ হাফ পাৎলুন ও খাকি রাইফেলধারীদের কাজের ভারি চপট। একে চমচমে রোদে ঘেমে নেয়ে উঠেছি, তাইতে এই সমরসজ্জা—আমার তরুণ বয়েসের রক্ত উছলে উঠল। পা চালালাম বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে (এখন যেটা মেডিকেল কলেজের আউটডোর ভবন), এখান থেকেই তো 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই'-এর দাবিতে শুরু হবে শোভাযাত্রা—১৪৪ ধারা ভেঙে। ফটক পেরিয়ে (কয়েক পা দূরেই রশিদীয়া বিল্ডিং, যেখানে ছিল অধুনালুপ্ত *মর্নিং নিউজ* পত্রিকার একদা কার্যালয়—রাষ্ট্রভাষা উর্দুর পক্ষে যাদের ঘৃণিত ভূমিকা সকলের জানা) কলাভবনের উঠোনে গিয়েছি, ওমা, কোমলমতি ছাত্রছাত্রীদের চেনার আর উপায় নেই—চোখগুলো যেন শানানো কিরিচ আর মুষ্টিবদ্ধ হাতগুলো সব কুঁদো।

আমগাছ তলায় (মরা কাঠ হয়ে আজ যা ভাস্কর্য) জোর সভা চলছে : ১৪৪ ধারা ভাঙা হবে কি হবে না। পক্ষে-বিপক্ষে কথা চালাচালি হচ্ছে। ভিড়ের মাঝে সতীর্থ ইমদাদকেও দেখলাম। ও তো আবার সংগ্রাম কমিটির সদস্য।

ওর হাত দিয়ে কম পোস্টার তো নাবেনি! আমার আবার কোথাও দুঘড়ি অপেক্ষা করার অভ্যেস নেই। ভাবলুম চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত পাকা হোক—পরে মিছিলে যোগ দেওয়া যাবে। এই ফাঁকে মেডিকেল কলেজের পড়ো ভাইজানের (মঈদ-উর-রহমান) তত্ত্বটা নিইনে কেন। শহরের উত্তপ্ত আবহাওয়ায় উদ্বিগ্না মায়ের আদেশও ছিল—তাঁর বড় ছেলেটির ভালোমন্দের একবার খোঁজটা নিই যেন। না, ভাইজান রুমে নেই, আশপাশে কোথাও না। মামাকে (রবীন্দ্রসংগীত গায়ক কাজী শাহজাহান হাফিজ) হঠাৎ পেয়ে গেলাম। না, সতীর্থ ভাগনের খবর তিনিও দিতে পারলেন না। বকশিবাজার রোডের মেডিকেলসংক্রান্ত বইয়ের দোকান পেছনে ফেলে জগন্নাথ হলের যে অভিশপ্ত মিলনায়তনে (এখানেই ১৯৫২-তে ক্ষুব্ধ সাংসদদের হাতে খুন হয়েছিলেন স্পিকার শাহেদ আলী, আবার কয়েক বছর আগে নির্মীয়মাণ ভবন ভেঙে বহু ছাত্রের মৃত্যুও হয়েছিল এই ভবনেই!) পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদের সভা বসত, যাব সেদিকে, হঠাৎ করেই মেডিকেল কলেজ ও ছাত্রাবাসের প্রধান ফটকের দিক থেকে গুলির শব্দ। পর পর কয়েকবার। পা চালিয়ে আইন পরিষদ ভবনের কাছে গিয়ে দেখি পূর্বদিকে ধূম্রজাল, কোলাহল, ইটনো, সর্বোপরি, ধাবাড়ে উদ্‌ভ্রান্ত চরণচারী!

এখন যেখানে শহীদ মিনার, ওখানে ছিল দর্মার সারিবদ্ধ ব্যারাক—বস্তুতপক্ষে বর্তমানে ডেন্টাল কলেজ ও নার্স কোয়ার্টার যে বিরাট এলাকাজুড়ে ছড়িয়ে আছে, এর পুরোটাই ছিল ওই ব্যারাকের দখলে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ইস্টার্ন কমান্ডের প্রয়োজনে এই সেনা ছাউনির উদ্ভব। মার্কিন ও ব্রিটিশ পরিত্যক্ত এই সেনা ছাউনিতেই ১৯৪৬ সালে মেডিকেল হোস্টেল জায়গা করে নেয়।

সে যা-ই হোক, ব্যারাকে ঢুকে গুলির শব্দ লক্ষ করে সরু উন্মুক্ত করিডর দিয়ে এগোচ্ছি, সামনে জটলা। উঁকি মেরে দেখি, ব্যারাকের শান বাঁধানো বারান্দার মেঝেতে রক্তাক্ত এক যুবক, বোধ করি, মারাই গেছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র : আবুল বরকত (২৫)। এই বরকতের দলে একে একে যোগ হয় : মোহাম্মদ সালাহ্‌উদ্দিন (২৬), আবদুল জব্বার (৩০), রফিক উদ্দিন আহমদ (২৭)। ...ভাষার জন্য জীবন উৎসর্গকারী এমনই আরও কয়েকজন অমর শহীদের নাম।

এই শহীদদের উপলক্ষ করেই তখনকার ছাত্র এবং একালের বিখ্যাত কলামিস্ট আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী লেখেন তাঁর অমর একুশের গান : 'আমার

ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি'। এ গানের প্রথম সুরকার যদিও আবদুল লতিফ, কিন্তু যে হৃদয় নিংড়ানো সুরটি আজ আমরা শুনতে পাই, তার সুরকার কিন্তু আলতাফ মাহমুদ, যাঁকে ওয়াহিদুল হক 'দেহমনের অস্তিত্বের প্রতিবিন্দুতে অদম্য অনিরুদ্ধ মহান যোদ্ধা' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। গর্ব করে বলতে পারি, সে চারুকলার পড়ো আমারই সতীর্থ, যাঁর চিত্রকলার জন্য যতটা নয়, সুরকার হিসেবে ততটা নাম। তবে একথা বলতে পারি, ক্লাসে কিন্তু ওর মধ্যে গান নিয়ে বাড়াবাড়ি কিছু দেখিনি, ওর সুন্দরী ভবনের ওই এলাকাটি, বোধ করি, ছিল ওঁর একান্ত নিজের।

না-ফুরোনো কথা

গোয়ালনগরের ভানু বাবুর কথা বলতে গিয়ে কমলাপুরের ঠাকুরপাড়ার সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়ের নাম করেছিলুম, কিন্তু রথখোলার মঞ্চ ও চলচ্চিত্রাভিনেত্রী শোভা সেনের নাম করিনি। করিনি ঢাকায় জন্ম নেওয়া ঘটক পরিবারের ঋত্বিক কুমার ঘটকের কথা। এঁরাও ঢাকার সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে কম জড়িয়ে ছিলেন না। ঋত্বিক তো *তিতাস একটি নদীর নাম* (১৯৭৩) নির্মাণের জন্যে জীবনসায়াহ্নে (মৃত্যু কলকাতায়, ৬.২.১৯৭৬) আবার ঢাকায় ফিরে এসেছিলেন। বলা বাহুল্য, ফিরে পাননি তিনি তাঁর সেই শান্তশিষ্ট ঢাকাকে। প্রসঙ্গক্রমে তাঁর দাদা মনীশ ঘটকের (লেখালেখির জগতে যিনি 'যুবনাশ্ব' নামেই পরিচিত) নামও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি। *'চতুরঙ্গে'* প্রকাশিত যত দূর মনে পড়ে, ঢাকার আঞ্চলিক ভাষায় একটি গল্প লিখে এবং পূর্ববঙ্গীয় উপভাষায় রসোত্তীর্ণ কবিতা লিখে তিনি অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এঁদের পৈতৃক নিবাস পাবনায়।

এবার আবার পথচলা। কাচারি পল্লি ভেঙে, 'মুকুল' সিনেমা হল (আজকের 'আজাদ') ছাড়িয়ে ন্যাশনাল মেডিকেল ইনস্টিটিউট (এর হাসপাতাল ভবনের

তিনটে ঘর নিয়ে চারু ও কারুকলা ইনস্টিটিউট গড়ে উঠেছিল ১৯৪৮-এর ডিসেম্বরে, সে কথা তো আগেই জানিয়েছি) ও ঘড়িঅলা চার্চ লাগোয়া রাস্তা ধরে এগোলেই পড়বে রোকনপুর-কলতাবাজার এলাকা। এই এলাকার প্রধান রাস্তার নাম কাজী আবদুর রউফ রোড। কে ছিলেন এই রউফ? একে তো জনগণ তাঁর পূর্বপুরুষদের পীর-মুরশিদ হিসেবে সম্মান করতেন, উপরন্তু সুদীর্ঘ ২৯ বছর ধরে মহল্লার সরদার ছিলেন, ছিলেন বিয়ের রেজিস্ট্রার ও শহর-কাজি পদে অধিষ্ঠিত—কাজেই তাঁর নামে রাস্তার নাম হতে বাধা কোথায়? ওই যে ওপরে 'মুকুল' সিনেমা হলের উল্লেখ করেছি, এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে তৎকালীন ঢাকার সাময়িকী জগতের ইতিহাস। এই হলটির পেছনে ছিল দুটি ছাপাখানা। একটি তো 'ভিকটোরিয়া স্টিম মেশিন প্রেস', যা পরে মালিক পরিবর্তনের ফলে 'কামাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস' এবং দ্বিতীয়টি 'চাবুক প্রিন্টিং প্রেস'। এই চাবুক থেকে বেরোত আমার ও অগ্রজ মঈদ-উর-রহমানের যুগ্ম সম্পাদনায় ও পরিচালনায় তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম কিশোর মাসিক *ঝংকার* (১৯৪৯-৫০), সে-কথা আগেই বলেছি। রোকনপুর এলাকাটি মস্ত বড়—পাঁচভাই ঘাট লেন, কুঞ্জবাবু লেন (জগন্নাথ কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ কুঞ্জলাল বাবুর নামানুসারে)সহ কাজী আবদুর রউফ রোডের পুরো অঞ্চলটাই রোকনপুর নামে খ্যাত। সুলতানি আমলে এই অঞ্চলে রোকন উদ্দিন চিশতি নামে একজন পরহেজগার বাস করতেন। তাঁর নামেই এ রাস্তার নামকরণ। স্থানীয় বাসিন্দা মুনসি সুরত ১৮৮৬ সালে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে এন্ট্রান্স (বর্তমান এসএসসি) পরীক্ষায় পাস করেন। উল্লেখ্য, সে বছর বাংলায় মাত্র পাঁচজন এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন এবং তিনিই একমাত্র মুসলমান ছিলেন। এরপর ১৮৮৮ সালে ঢাকা কলেজ থেকে এফএ (বর্তমান আইএ) পাস করে পগোজ স্কুলের ফারসি শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। পরবর্তীকালে এই পগোজ স্কুলেরই ছাত্র ছিলেন আমাদের প্রিয় ও প্রধান কবি শামসুর রাহমান। তিন বছর পরে ১৮৮৯ সালে ইসলামপুরের আওলাদ হোসেন লেনের কাজী বাড়ির কাজী জহুরুল হক এন্ট্রান্স পাস করেন। ১৮৯৩ সালে তিনি ঢাকা মুসলিম হাইস্কুলের প্রথম হেডমাস্টার পদে আসীন হন। সে সময়ে এ দুজনকে ঢাকার মুসলিম সমাজে ইংরেজি শিক্ষার অগ্রদূত বলা হতো। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, কাজী জহুরুল হক ছিলেন শামসুর রাহমানের দাদাশ্বশুর।

আর নয়, রোকনপুরের পাট তুলে আমরা এখন ভিক্টোরিয়া পার্কের (যা এখন বাহাদুর শাহ্ পার্ক) দিকে এগোচ্ছি। ডান দিকে বিশাল কাচারি এলাকা। বাঁ দিকে ফেলে এসেছি ঢাকা জেলা বোর্ডের ভবন। আরেকটু এগোলেই পড়বে

ক্যাথলিকদের গির্জা, যার কথা একটু আগেই উল্লেখ করেছি, যার শীর্ষে শোভা পাচ্ছে ঢাকার একমাত্র 'বিগ বেন' ঘড়ি। যদিও আমি যখনকার কথা বলছি, সেই '৪৭ কি '৪৮ সালের দিকে ঢাকা তেমন ব্যস্তসমস্ত শহর ছিল না। তবু অলস পথচারীকে এবং দেশ ভাগের কারণে কলকাতা-হিল্লি-দিল্লি ঝেঁটিয়ে আসা আগন্তুকদের সময় সম্পর্কে সজাগ করে দেওয়ার এমন চমৎকার ব্যবস্থা আর কোথাও ছিল না। মাঝেমধ্যে অবহেলার কারণে সময় থমকে যায়—ঘড়ির কাঁটা দুটো নড়ে না—যেন আমরা সময়হীন মহাশূন্যের কোথাও আছি।

পাঠক, ক্ষমা করবেন, কলমের কোনো দোষ নেই, ও তো আমার আজ্ঞাবহ ক্রীতদাস। ভিক্টোরিয়া পার্কের কাছে এসে মনে হলো, আমি তো মুকুল সিনেমা হলের পাশে যে ওকে রেস্টুরেন্ট—তার কথা বললাম না তো এক ছত্র। নিনি হলে নির্ঘাত ভুলটা ধরিয়ে দিত। বলত, লোকে বলে তুমি নাকি ইয়াং ওল্ডম্যান—আমার চোখে ওল্ডি, ওল্ডবার্ড-ও বলতে পারো। এসব কথা শোনার চেয়ে আসুন, আমরা ওকে-র তত্ত্বতল্লাশটা নিই।

সদ্য রাজধানীর গরবে গরবিনী একদা রাজধানী ঢাকায় সেকালে কোনো ভালো হোটেল কিংবা পানশালা ছিল না। জেলা শহর ঢাকার একমাত্র বনেদি যে রেস্টুরেন্টটি ছিল, তা এই ওকে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় যেমন মার্কিন-ব্রিটিশ সেনাদের জন্য গড়ে উঠেছিল 'ব্রিটানিয়া টকিজ' সিনেমা হল, ঠিক একই লক্ষ্যে জন্ম নিয়েছিল ওকে। এর মালিক ছিলেন রোকনপুরের অ্যাংলো পল্লির এক অ্যাংলো মহিলা। দোতলা ওকে-র ওপর ছিল আবাসিক ব্যবস্থা, নিচে সর্বসাধারণের রেস্তোরাঁ। ঢাকাতে তখন যে তিন জায়গায় বারের ব্যবস্থা ছিল, তার মধ্যে ওকে একটি। বাকি দুটির একটি হলো ফুলবাড়িয়া রেলস্টেশন-সংলগ্ন পানশালা এবং অপরটি ব্রিটানিয়া টকিজসংলগ্ন রিজ (Ritz), পরে যা রেক্সে (Rex) দাঁড়ায়। এখানে অর্থাৎ ওকে-তে ভদ্র আসবপায়ীদের আড্ডা জমত মন্দ না। তবে চোহেলের রইরই বলতে যা বোঝায় কিংবা বওয়াটে পিলইয়ার ছোকরাদের মত্ততা, কখনো হতে দেখিনি এখানে। এই রেস্তোরাঁর কাছে এলেই মনে হতো আমি বুঝি এসে গেছি কোনো ওয়েস্টার্ন সেলুনের সামনে। পেটা লোহার অলংকারবহুল ব্র্যাকেটে শোভিত ধ্রুপদী ঢঙে উৎকীর্ণ OK বর্ণমালা এবং ফুটপাতের দিকে কুঞ্চিত পর্দাশোভিত মসৃণ স্বচ্ছ কাচের জানালা যেন তা-ই বলে। মনে হতো এখনই কোনো ক্লান্ত ঘোড়সওয়ার ঘোড়া থেকে নেমে শিস দিতে দিতে সুইং-ডোর ঠেলে পানশালায় ঢুকবে।

ভিক্টোরিয়া পার্ক বনাম আন্টাঘরের ময়দান

ওকে পান্থশালাকে ওকে জানিয়ে এবার আমবা ভিক্টোরিয়া পার্কের খোলামেলা বৃক্ষরাজির অমল সবুজে। নানা ফুলের সমাহার, নানা গাছ—ঠিক মাঝখানে বৃত্তাকারে দশ-বারোটা পামগাছ। পার্কের পুব দিকে রেলিং ঘেরা শ্বেতপাথরে তৈরি উঁচু বেদিকার ওপর মহারানি ভিক্টোরিয়ার সম্মানে ঢাকার নবাববাড়ির সৌজন্যে প্রতিষ্ঠিত একটি দশ-বারো ফুট উঁচু প্রস্তরস্তম্ভ—ওয়াশিংটন মেমোরিয়াল ধাঁচে মাথা উঁচু করে আছে। প্রাচীনদের মুখে কিন্তু ভিক্টোরিয়া পার্ক নয়—কানে আসে আন্টাঘরের ময়দান। এই অদ্ভুত নামকরণ কেন, তার তত্ত্বতল্লাশ নিতে গিয়ে দেখা গেল, এই পার্কে, অষ্টাদশ শতাব্দীর দিকে ঢাকার আর্মেনীয়বাসীদের একটা ক্লাবঘর ছিল। এ ক্লাবের সদস্যরা বিলিয়ার্ড খেলতেন। ডিমের মতো দেখতে-শুনতে বিলিয়ার্ড বলকে ক্লাবের নিম্নশ্রেণীর স্থানীয় কর্মচারীরা আন্ডা বলত। এই আন্ডাই কালে আন্টা রূপ ধারণ করে। যে ক্লাবঘরে এমন আন্ডাসদৃশ বল নিয়ে খেলা হতো, তাকে ওই কর্মচারীরা আন্টাঘর বলত। এভাবে লোকমুখে সুদীর্ঘকাল ধরে এই পার্কটি আন্টাঘরের ময়দান হিসেবে পরিচিত হয়ে আসছিল, যত দিন পর্যন্ত না ভিক্টোরিয়া পার্কের আবির্ভাব ঘটে।

এই আন্টাঘর তথা ভিক্টোরিয়া পার্কের সঙ্গে জড়িয়ে আছে এক করুণ কলঙ্কজনক কাহিনি। ১৮৫৭ সালের ২৩ জুন যখন সিপাহি বিপ্লবের আগুন উত্তর ভারতের প্রতিটি ভারতীয় সেনাশিবিরে জ্বলে উঠেছিল এবং পরে একে একে চতুর্দিকে, ঢাকা তখনো শান্ত—বিপ্লবের আঁচ একটু যদি এসে পৌঁছায়। তখন লালবাগ দুর্গে পাঠান ও শিখ সমন্বয়ে গঠিত ২৬০ জনের ছোটখাটো এক ভারতীয় রেজিমেন্ট ছিল। বিপ্লবের বাণী অবশেষে ঢাকাবাসীকেও উদ্বেল করে তুলল। পলাশী প্রান্তরে পরাজয়ের শতবার্ষিকী এবং সিপাহি বিপ্লব—এই দুয়ে মিলে তপ্ত হাওয়া বইতে লাগল ঢাকার ওপর দিয়ে। হয়তো ঢাকাও শরিক হতো এই বিপ্লবে; কিন্তু বাদ সাধলেন ঢাকার তৎকালীন নবাব খাজা আবদুল গনি। ইংরেজ অনুগত এই কাপুরুষ নবাব ছিলেন ঢাকা শহরের অবিসংবাদী নেতা। তাঁর পক্ষে বেশি বেগ হতে হয়নি এই বিপ্লব থেকে ঢাকাবাসীকে দূরে সরিয়ে রাখতে। ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিপ্লব তাই প্রায় নীরবে নিভৃতে ঢাকার বুক থেকে প্রস্থান করে। তবে একেবারে বিনা যুদ্ধে বলা যাবে না। অবশ্য এতে ঢাকাবাসীর ভূমিকা নগণ্যই ছিল। এ প্রসঙ্গে ঢাকাবিদ নাজির হোসেন বলেন, 'লালবাগে যে সংক্ষিপ্ত যুদ্ধের নাটকটি অভিনীত হয়, তাতে লালবাগের অধিবাসী ছাড়া ঢাকার অধিকাংশ অধিবাসী নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছিলেন মাত্র। অপরদিকে তৎকালীন নব্য প্রতিষ্ঠিত হিন্দু সরকারি কর্মচারীরা গোঁড়া সেনাদের উৎসাহ দিত আর তাদের সঙ্গে থেকে তামাশা উপভোগ করত।

"কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত নাটকটির জন্য কিছুদিন পরই এ এলাকাবাসী মুসলমানদের বিপুল খেসারত দিতে হয়েছিল। সিপাহিদের উৎসাহ, সাহায্য-সহযোগিতা ও আশ্রয়দানের অভিযোগে শত শত নিরীহ মহল্লাবাসীকে পলায়নপর ধৃত সেনাদের সঙ্গে আন্টাঘর ময়দানের বৃক্ষ সারিতে ঝুলিয়ে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল। আবার অনেককে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ডও দেওয়া হয়েছিল। সিপাহিদের এই সংঘর্ষটিকে ঢাকাবাসী লাল পল্টন ও কালা পল্টনের, তথা সোজা কথায় কালা-ধলার লড়াই বলে জেনে আসছে। অথচ এটাই ভারত উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম প্রকাশ।" (*কিংবদন্তীর ঢাকা*, পৃ. ১২১-২২)। ইংরেজের খয়ের খাঁ নবাব আদুল গনির চেষ্টা সফল হলেও তৎকালীন কিছু সরকারি কর্মচারীর ইন্ধনের ফলে লালবাগের ওই ক্ষুদ্র ২৬০ জনের ভারতীয় সেনাদলটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ইংরেজরা। ২২ নভেম্বর আশুরার দিন ইংরেজ নৌ-সেনা ও স্থানীয় বেসামরিক ইংরেজ স্বেচ্ছাসেবকদের একটি ক্রুদ্ধ দল ভোররাতে আন্টাঘরের ময়দানে এসে জড়ো হয়। এবার

দ্রুতগতিতে বর্তমান কেন্দ্রীয় জেলখানায় তৎকালীন ট্রেজারি আপিসে নিয়োজিত দেশি সিপাহিদের নিরস্ত্র করে লালবাগ দুর্গে পৌছে ঘুমন্ত ও নিরস্ত্র সিপাহিদের অনায়াসে পরাভূত করে। এই সম্পর্কে *কিংবদন্তীর ঢাকা* থেকে পুনরায় প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি : "কোনো কোনো ঐতিহাসিক বলে থাকেন সিপাহী বিপ্লবকালে খাজা আবদুল গনি এ দেশের বিশেষ করে ঢাকার মুসলমানদের নেতা ছিলেন বিধায় বিপ্লবীরা তাঁকে বিশ্বাস করে তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করতেন। তাই বিপ্লবের দিনটি খাজা সাহেবের জানা ছিল এবং তিনিই ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছিলেন। কেননা, ঢাকার বিপ্লব দমনের পরে ইংরেজ অফিসারদের গৃহে আনন্দোল্লাসের যে জোয়ার এসেছিল—খাজা আবদুল গণি সাহেবের বাসভবনেও [আহসান মঞ্জিল] সেই উপলক্ষে বলনাচের আয়োজন হয়েছিল।"

অথচ মজা কী, এই ঘৃণ্য নবাবের নামেই ঢাকার একটি সেরা রাস্তার নাম হয়েছে নবাব আবদুল গনি রোড, যা জিরো পয়েন্ট তথা নূর হোসেন চত্বর থেকে শুরু হয়ে শেষ হয়েছে কার্জন হলের মোড়ে কলেজ রোডে এসে। পাশাপাশি ভিক্টোরিয়া পার্ক তথা আন্টাঘরের ময়দানের নাম পরিবর্তিত করে সিপাহি বিপ্লবের নেতা তথাকথিত দিল্লিশ্বরের নামে 'বাহাদুর শাহ পার্ক' নামকরণ সঠিক হলেও, পার্কে রানি ভিক্টোরিয়ার নামে উৎসর্গকৃত স্মৃতিস্তম্ভটি যেন সতীনকাঁটার মতো বিঁধছে—এ যেন বিপ্লবীদের স্মরণে মাথা নত করে সম্মান জানিয়ে বিপ্লবীদের মহাশত্রুকেও অমর করে রাখার এক মহা ষড়যন্ত্র। আরও ষড়যন্ত্র রয়েছে এর পামগাছগুলো কেটে ফেলার পেছনে। এই গাছগুলোতেই ঝুলিয়ে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল সিপাহিদের। এগুলোকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলা ইতিহাসকে মুছে ফেলারই নামান্তর।

আমার একটি প্রস্তাব রইল বর্তমান আন্টাঘরের ময়দানে, প্রকৃত ঘটনা বিবৃত করে নিহত সিপাহি ও নিরীহ নাগরিকদের নামসংবলিত একটি সুউচ্চ স্তম্ভ নির্মিত হোক ওই রানি ভিক্টোরিয়ার স্মৃতিস্তম্ভের জায়গায়। আর ভিক্টোরিয়ার স্মৃতিস্তম্ভটির জায়গা হোক জাতীয় জাদুঘরে। এতে শহীদদের প্রতি সশ্রদ্ধ সম্মাননা জানানোর পাশাপাশি যথাযথ নাগরিক দায়িত্ব পালিত হবে বলে আমি মনে করি।
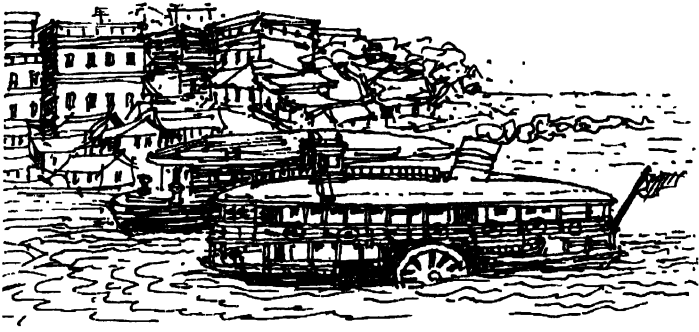
সংযোজন

ঢাকা সহর নিগম্যস্থান
অতি যে গোপন।
সে স্থানেও বিরাজ করে
মানুষ রতন ॥
—সুধারাম বাউল

এতকাল জানতুম আমার বাড়ি কলকাতা। হতে পারে জন্ম আমার ইছামতীর স্নেহসঙ্গে বেড়ে ওঠা দিশপাশ উজল করা হিজল-বৌনা-মাদার আর আম-জাম-কাঁঠালে ঘেরা বিক্রমপুরের টুলো পণ্ডিতদের বামুন পল্লি টোল বাসাইল গাঁয়ে। চোখ মেলে জগৎটাকে দেখলুম; কিন্তু গোবিন্দপুর, সুতানুটি ও কলকাতার থানে।

ছাতে না গেলে পরে যে শহরে আকাশের দাপুনি দেখা ভার; একটু সবুজ ঘাসের রস পানের জন্য যাকে ছুটতে হয় গড়ের মাঠ কি ঢাকুরিয়া; কয়লার উনুনের ধোঁয়ায় সকালটা যার টুপভুজঙ্গের মতো গোঙায়; প্রথম ট্রামের শি-শি শব্দের তিখনি আঘাতে পুরোনো বাড়ির কোটর থেকে কি রাস্তার খাপছাড়া কোনো জারুলগাছের নরম শাখা থেকে পাখিরা কাতরাতে কাতরাতে কোথায় মিলিয়ে যায় যে-শহরে; যার আঁধারে গ্যাস বাতি অলৌকিক আলো ছড়ায়, তার পরও এই শহর মায়াবিনী মনে হয়। মনে হয়, ভাগীরথী নয়, এ যেন কোনো মায়াবী নদীর তীরের কোনো এক আশ্চর্য জনপদ।

এই জনপদেই নেমে এল ১৯৪৭-এর আগস্টে কোতোয়াল র‍্যাডক্লিফের খাঁড়া, হুকুম হলো নগর ত্যাগের। আমাদের এতকালের ঘরদোর, তা যেন ছিল টাপোর! দুদিনের বাসড়িয়া—খেলা সাঙ্গ, এবাব গা তোলো!

কত সহজেই বলতে পারল ব্রিটিশরাজ। দেশটাকে বাঁটন করে আমাদের যা ধরিয়ে দিলে, তাতে কলকাতা নেই! বুকটা ধড়াশ করে উঠেছিল—ওই গোলদিঘির জলে ঘাই মারা রুই-কাতল-কালবোশের মতো!

সেদিন ফজলুল হক সাহেবের 'বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র কলকাতা'র আস্ফালন বৃথাই গিয়েছিল। কিংবা কলকাতাকে ভাগ করার, নিদেন 'আন্তর্জাতিক শহর' করার যুগল প্রস্তাবও ভেস্তে গিয়েছিল। এসব দেখেশুনে কাকু তাঁর কাচরাপাড়ার নিবাস এবং বাবা আমাদের দমদম গোরাবাজারের সোনার টুকরো জায়গাটুকু যখন বিক্রিবাট্টা করে দিলেন, আমার প্রাণটা ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল। আর কারও মনের খবর রাখিনে, আমার এক মন বলছে—যাই, অন্য মন বলছে—থাকি। কিন্তু থাকি বললেই আর থাকা যায় না—কবি বয়েস বলে কথা। মা-বাবার হাত ধরে এক ক্ষুরে মাথা মুড়িয়ে শেয়ালদার নর্থে ঢাকা মেইল ধরতেই হলো আমাকে। ফি বছর স্কুল ফাইনালের পর শেয়ালদায় ট্রেনে চেপে যাওয়া হতো দেশের বাড়িতে—কলকাতায় ফিরব এই আশ্বাস বুকে ধরে। কিন্তু এবার—! সমস্ত শরীর-মন হু হু করে কেঁদে উঠল।

নারকেল ডাঙার ওভারব্রিজ, উল্টোডাঙার রেল কলোনি এবং সবশেষে মার্শালিং ইয়ার্ড পেরোতেই জীবনানন্দ যেন ভর করল :

আবার আসিব ফিরে ভাগীরথীটির তীরে—এই কলকাতায়

১৫ই অগাস্ট অন্যান্য যাত্রীর সঙ্গে আমাদের পুরো পরিবারটিকে নিয়ে পদ্মা উজিয়ে যখন *অস্ট্রিচ* তার প্যাডেল জোড়াকে বিরাম দিয়ে নারায়ণগঞ্জের ঘাটে এসে ভিড়ল, তখন পড়ন্ত বিকেল। বাড়ির ছাদগুলোতে আকাশপ্রদীপের মতো বাঁশের ডগায় বাঁধা পাকিস্তানের বাসি পতাকা—গতকাল ১৪ আগস্ট ভারতের আগেভাগেই পালিত হয়ে গেছে স্বাধীনতা দিবস। আজ আমাদের জীবনে *টাকু* কি *লামা*-র প্রয়োজন ফুরিয়েছে—রিভার স্টিম নেভিগেশন (আরএসএন) কোম্পানির ওই যে দুটো লঞ্চ ফি বছর আমাদের গাঁয়ে পৌঁছে দিত, অদূরে নোঙর করা *টাকু*র দিকে তাকিয়ে মনে হলো ঢাকের বাঁয়া বৈ ওদের আর কী মূল্য আজ আমাদের জীবনে!

কথা ছিল আমাদের ঠাঁইনাড়া জীবনের গতি হবে ঢাকাতেই। কিন্তু ঠাঁই নেই ঠাঁই নেই ছোটো এই তরী—হঠাৎ নবাব ঢাকার তখন সেই দশা। পূর্বে বঙ্গ তথা পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী হয়ে একদা সুবে বাংলার রাজধানী ঢাকার নড়বড়ে খিলানগুলো একসুরে কোঁকাবে—এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। কাজেই সহোদরা নারায়ণগঞ্জে অস্থায়ী ডেরা বাঁধলুম আমরা। বাবার আপিসের অগ্রগামী দলটি আমাদের নিয়ে তুলল পাটের বিখ্যাত ব্রিটিশ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ডেভিড কোম্পানির (এখন যা কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট) আশ্রয়ে, যার চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে জুট-বেলিং-প্রেসের বড় বড় সব হ্যাঙার, প্রশাসনিক অট্টালিকাসহ বিভিন্ন ভবন। পাটের গাঁট হটিয়ে একটি হ্যাঙারে জায়গা হয়েছে বাবার আপিস—কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরের অধীন ঔষধাগারের! ভাগে-পাওয়া কিছু চেয়ার-টেবিল, নথিপত্র, টাইপরাইটার ইতস্তত ছড়িয়ে। তাঁবুতে, তাঁবুর অভাবে হ্যাঙারের মেঝেতেই বিছানা পেতে কর্মচারীদের ঘর-বসতি! ওঠার কথা সদ্য রাজধানীর মর্যাদা পাওয়া ঢাকা শহরে। কিন্তু ওইটুকুন জেলা শহরে কলকাতা থেকে ঝেঁটিয়ে আসা সরকারি বিভিন্ন আপিসের জায়গা হবে কী করে!

এ দেশে আমাদের শেকড় রয়েছে ঠিক, কিন্তু বহুকাল পাটনা, কটক, রাঁচি, শিলং এবং সবশেষে কলকাতার সহবাসে একটা সর্ব ভারতীয় রং যেন সারা গায়ে মাখা ছিল। আর আমার গায়ে ছিল রাঢ়ী আঙিয়া, যে-কারণে আমরা এ দেশের হয়েও শরণার্থী মনে হলো নিজেদের! তবে আমাদের কিন্তু ব্যবস্থা হলো ফুটফুটে মেসের মতো দেখতে এক বাংলোয়। প্রশাসনিক কর্মকর্তার সুবাদে বাবার জন্য বরাদ্দ হয়েছিল ডেভিড কোম্পানির চিকিৎসক ডা. পেট্‌সম্যান সাহেবের পরিত্যক্ত বাংলো। ব্রিটিশ রাজের অবসানে ভদ্রলোক আগেই পাড়ি জমিয়েছিলেন স্বদেশে। সম্পূর্ণ কাঠের তৈরি মাটি থেকে দুই ফুট উঁচুতে পাটাতনের ওপর তৈরি বিলিতি ধাঁচের দৃষ্টিনন্দন বাংলোতে স্থান পাওয়ায় স্বভাবতই আমরা সবাই খুশি। চারদিকে গাছের সারি আর সুন্দর করে ছাঁটা মেহেদির বেড়া ঘেরা বাংলোটিকে না ভালোবেসে উপায় কী! তারপর অঙ্গনজুড়ে কমলালেবুর পাতার মতো সবুজ ঘাস আর ফাঁকে ফাঁকে কেয়ারি করা নানা বাহারি ফুলের সাজ তো রয়েছেই। কাঠের সদর দরজা বরাবর সুরকির রাস্তাটা সোজা বাংলোর সিঁড়িতে গিয়ে শেষ হয়েছে। সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠলে পরে খোলামেলা রেলিং ঘেরা মস্ত বারান্দা। সুমুখেই পারলার। বাঁ পাশে

গেস্টরুম, ডানে বেড, লাগোয়া টয়লেট, তারপরে প্যান্ট্রি, কিচেন, স্টোরেজ। বাংলোর পেছনে রয়েছে অবহেলিত কিচেন-গার্ডেন আর অদূরে আউট-হাউস। জাল-ছেঁড়া পলো-ভাঙা মালী ব্যাটার টিকিটির দেখা মেলা ভার।

আমাদের মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবারটি রাতারাতি 'সাহেব' হয়ে গেল! একা ভোগে সায় দিল না বাবার মন। গেস্টরুমটা ছেড়ে দিলেন আপিসের কতিপয় সহযোগীকে।

দু-তিন মাসের মাথায় বাবার আপিসের একটা হিল্লে হলো সেক্রেটারিয়েট তথা ইডেন বিল্ডিংসে—ব্রিটিশরাজের কীর্তি। উচ্চতর নারী শিক্ষার লক্ষ্যে কয়েক একরজুড়ে নির্মিত হয়েছিল সরদেয়াল ঘেরা ইডেন গার্লস কলেজ এবং ছাত্রীদের জন্য ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা নয়নলোভন হোস্টেল—যূথবদ্ধভাবে তাই নাম দাঁড়িয়ে গিয়েছিল ইডেন বিল্ডিংস। নতুন রাজধানীর কোপে পড়ে জায়গা করে দিতে হয়েছিল সরকারের সচিবালয়কে। তবে মজা কী, আজও সচিবালয় বোঝাতে ইডেন বিল্ডিংস নামটাই উচ্চারিত হয় লোকমুখে। ইডেন হটিয়ে দিয়েছিল বকশিবাজারের নবকুমার ইনস্টিটিউশনকে (পরে জেনেছি, এই স্কুল থেকেই বাবা এন্ট্র্যান্স পরীক্ষায় পাস করেছিলেন)। নবকুমার সরে গিয়েছিল একটু দূরেই এক পরিত্যক্ত দোতলা ভবনে। এমনি করেই ঢাকা কলেজকে (ব্রিটিশ আমলের পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের পরিত্যক্ত গবর্নর ভবন) ছেড়ে দিতে হয়েছিল হাইকোর্টকে এবং ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলকে (পরিত্যক্ত ঢাকা কলেজ ভবন) ছেড়ে দিতে হয়েছিল তৎকালীন স্টেট ব্যাংককে। পর্যায়ক্রমে হাতবদলের সেসব কথা যথাসময়ে আসবে।

ঢাকাতে আপিস থিতু হলেও, যত দিন বাড়ির সন্ধান মেলেনি, তত দিন বাবাকে নারায়ণগঞ্জ থেকেই ট্রেনে কিংবা বাসে চেপে আপিসে হাজিরা দিতে হতো। আমরা বাসগুলোর গতিপ্রকৃতি বুঝে নাম দিয়েছিলুম *মুড়ির টিন*। ফোর্ড কোম্পানির এসব লজঝড় বাসগুলো যখন ন্যালাখ্যাপার মতো বিচিত্র শব্দ করে ছুটত, মনে হতো, এই বুঝি লাট খেয়ে ঘাড়ে পড়বে আরকি! '৩৯-৪০ সালের মডেল। যে সড়ক ধরে ছুটত, তার একটা ইতিহাস আছে। সেকালে টায়ারকুলে ব্রিজস্টোনের পাশে ডানলপ ছিল সেরা। ডানলপ কারখানাও খুলে বসেছিল কলকাতার অদূরে। টায়ার বিক্রির নতুন এলাকা খুঁজতে গিয়ে ঢাকার ওপর নজর পড়ল তাদের। এখানে তখন 'মমিন মোটর কোম্পানি'র একচেটে বোলবোলাও সময়

যাচ্ছে—টোপটা এদের ওপরই পড়ল। তখনো ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ সংযোগ সড়ক বলে কিছু ছিল না। নৌকোই একমাত্র ভরসা। ডানলপের টোপটা এমন—দুটি শহরের সঙ্গে সংযোগ-সড়ক করে দেবে এই কড়ারে যে, এই সড়কে যেসব গাড়ি চলাচল করবে, তারা কেবল ডানলপ টায়ারই ব্যবহার করবে। মেনে নিয়েছিল মোমিন মোটর। ফলে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের নগরবাসী পেল এক ঝকঝকে মহাসড়ক।

কলকাতার সিটি কলেজ থেকে সদ্য আইএসসি পাস করা অগ্রজ মঈদ-উর-রহমান তত দিনে ঢাকা মেডিকেল কলেজের দ্বিতীয় ব্যাচের ছাত্র, ট্রেন তো ট্রেন, নতুবা মোমিন মোটরের রথো বাসের ডেলি প্যাসেঞ্জার।

আমার স্থান হলো না একরত্তি বন্দর-নগরী 'ভারতের ম্যানচেস্টার' নারায়ণগঞ্জে। স্কুলগুলো টাপেটোপে উপচে পড়ছিল। আমার হাঁটুভাঙা 'দ'য়ের জীবনে তখন নারায়ণগঞ্জের স্টিমার ঘাট, ঘাটে ভেড়া জাহাজের ভোঁ নিরন্তর বেজেই চলে। স্কুলে যাওয়ার তাড়া নেই। ঘুরিফিরি। ডেভিডে যাই—স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের কেন্দ্রীয় ওষুধ সংরক্ষণাগারের বড়কর্তা বাবাকে দেখি গুদামঘরে কর্মরত। একরত্তি 'বোস কেবিন'-এ দুদণ্ড বসি। সিঙ্গল কাপ চা চলে। মাঝে মাঝে ঢাকায় যাই। পল্টনের বিরান সবুজ প্রান্তরে গড়ে ওঠা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় মার্কিন ও ব্রিটিশ সেনাদের বিনোদনের জন্য গড়ে ওঠা ব্রিটানিয়া সিনেমা হলে হলিউডের ছবি দেখে, পাটুয়াটুলির আশুতোষ, স্কুল বুক সোসাইটির লাইব্রেরি নতুবা জনসন রোডের বৃন্দাবন ধরে কলকাতার শিশুতোষ সাময়িকী কিংবা দেবসাহিত্য কুটিরের নতুন বই কিনি। পাতা শুঁকি। এমনি করে গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াচ্ছিলুম। পাশাপাশি কলকাতা থেকে হাতে লেখা পত্রিকাটার শরীরে নতুন লেখা ও রেখায় ফুর্তি আর ধরে না।

কিন্তু সবটাই আনন্দ মেশানো ছিল না। নারায়ণগঞ্জে যে সাড়ে চার মাস ছিলুম, বিষাদই তাড়া করে ফিরত অনুক্ষণ। মাঝেমধ্যে হংস ও ডায়মন্ড হলে ছবি দেখে সময় কাটাতুম আর যখনই শীতলক্ষ্যার শীতল জলের সাঁতারু কোনো স্টিমার ঘাট থেকে ভোঁ দিত কোনো স্টিমার কিংবা টাগবোট থেকে, মনটা হু হু করে উঠত। ছুটে যেতাম 'বোস কেবিন' ছাড়িয়ে স্টিমার ঘাটে। লাগোয়া ফ্ল্যাটবোটে হয়তো নোঙর করা রয়েছে গোয়ালন্দগামী 'গাজী' কিংবা 'কিউঈ' কিংবা 'অস্ট্রিচ'—তার মানে গোয়ালন্দ, আর গোয়ালন্দ মানেই কলকাতা! কলকাতা!

আহা রে, রোজ এভাবে একবার করে মরতাম আমি!

একদিন এই স্বপ্নের ঘাট থেকে বিদায় নিতে হলো কলকাতার খোকাবাবুকে। উঠল সে বাবা-মা ভাইবোনদের সঙ্গে ঢাকার বুকে। এ সেই ঢাকা, যার দোহারা গড়নে। কথাটা হেঁয়ালি শোনাচ্ছে আপনাদের কানে—এ বেশ বুঝতে পারছি। মোদ্দা কথা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ছিল আমাদের লেখাপড়া। ঢাকাতে এসে সেটা চলবে কেন! কারণ, ঢাকার স্কুলের ছাত্ররা ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে। তাদের সিলেবাসও আলাদা। কাজেই আমাকে আর সব ছিন্নমূল ছাত্রের মতোই প্রাইভেটে কলকাতার সিলেবাস অনুযায়ী পরীক্ষা দিতে হবে। তৎকালীন সরকার তেমনি ব্যবস্থা করেছিলেন আমাদের জন্য। কিন্তু তার আগে আমাকে নবম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণীতে ওঠার ছাড়পত্র জোগাড় করতে হবে। পরীক্ষা না দিয়েই ঢাকা আসায় এই বিপত্তিই ঘটেছিল। বাবা মিত্র ইনস্টিটিউশনের হেডস্যার শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল মশাইকে বলে-কয়ে একটা ব্যবস্থা করলেন। পঞ্চানন বাবু স্যার নবম শ্রেণীর খাতাসহ প্রশ্নপত্র সব পার্সেলে পাঠিয়ে দিলেন আরমানিটোলা সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের হেড স্যার শামসুদ্দিন আহমদ সাহেবের কাছে। তাঁর তদারকিতেই পরীক্ষাটা হবে এবং তা হবে তাঁরই কক্ষে, তাঁরই চোখের সামনে। ঘটনাক্রমে শামসুদ্দিন সাহেব ছিলেন আমার দাদু, বাবার মামা। হলে কী হয়, তিনি তাঁর দায়িত্ব পালন করেছিলেন ষোলোআনা—একটা প্রশ্ন বুঝতে না পেরে তাঁর কাছে যেতে তিনি হেঁড়ে গলায় ধমকে উঠেছিলেন—তাঁর ওপর পঞ্চানন বাবু বিশ্বাস করে যে দায়িত্ব দিয়েছেন, তা তিনি ভাঙবেন কোন যুক্তিতে? এ তো নাতি বলে কথা!

এভাবে ঢাকার আরমানিটোলা স্কুল থেকে পরীক্ষা দিয়েছিল কলকাতার মিত্র স্কুলের ছাত্র এই অধম দশম শ্রেণীতে নাম লেখাবে বলে!

যেদিন প্রথম পরীক্ষা দিলুম, সেদিন রাতে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলাম :

গড়পার থেকে সকাল সাড়ে নয়টার দিকে ১১ নম্বর বাসে চেপে স্কুলে যাচ্ছি। দেরি না করে ফেলি এই চিন্তা মাথায়—নতুবা আশুবাবুর গাট্টা মিনি মাগনা আটটা যদি বা না মেলে ঠাট্টা জুটবে--এ বলা যায় অনায়াসে। শিখ কনডাক্টর ব্যাটা হাতের রুলিতে টুন টুন বাজিয়ে ভাড়া নিচ্ছে। হঠাৎ আবিষ্কার করলাম, না তো, আমি বাসে ঝুলে নেই, ট্রামের গদি মোড়া সিটে হাওয়া খেতে খেতে ছুটছি গড়ের মাঠ ভেঙে! এবার বাঁক নিলে টাপুর ঠায়ে রামধনিদের ছাপড়াকে পাশ কেটে বার-পুকুরের টলমল কালো জলে ছায়া ফেলে ফেলে কচি ধানের সবুজ পান করতে করতে ইছামতীর পাড় ঘেঁষে, ওমা! বেহালা! এক পা বাড়ালেই ফণী কাকাবাবুর বাড়ি!

স্বপ্নটা ভাঙতে বুকটা ধড়াস করে উঠল।

তো কলকাতা থেকে পরীক্ষা পাসের খবরটা যেদিন, তখন আমি দশম শ্রেণীর লায়েক ছেলে। কিন্তু ঢাকার স্কুলগুলো ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে—সিলেবাস সম্পূর্ণ ভিন্ন। কাজেই আমাকে ও আমারই মতো শরণার্থী ছাত্রদের বিশেষ ব্যবস্থাধীনে প্রাইভেট পরীক্ষা দিতে হয়েছিল। আমাদের কেন্দ্র ছিল আরমানিটোলা ময়দানের পুব পাশের হাম্মাদিয়া স্কুলে।

আমি ৩ামাশবিনের চোখে সব দেখি। এমনি করে তরতরিয়ে গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়ানো আলস্যবিলাসে মত্ত দিনগুলো কেটে যাচ্ছিল। হঠাৎ করে একদিন জানতে পেলুম নতুন বছরের প্রথম দিনে, অর্থাৎ, ১লা জানুয়ারি ১৯৪৮, আমাদের ঢাকা যাওয়া একরকম স্থির।